নবীরা ঠিক কি কথা বলে গিয়েছেন?
আপনি কি তা জানেন?
সেসব কথা কি আমাদের জানা দরকার?

নবীদের বলা কথাগুলো

ইয়াহিয়া সা' আ

নবীদের বলা কথাগুলো

ইয়াহিয়া সা' আ

❖ প্রকাশক ❖
সাহিত্য বিভাগ, পোষ্ট বক্স নং ৭৮, চট্টগ্রাম-৪০০০

সহজ ইংরেজীতে রূপান্তর ঃ ডাঃ ফ্রাংক ওয়েরম্যান
প্রধান অনুবাদক ও সম্পাদক ঃ এন. এন. স্বপন
অনুবাদ সম্পাদনায় ঃ ড. লীন সিলভারনেল
মুদ্রণের পূর্বে যাঁরা বইটি ঃ ড. ল্যারী জে, এলেন, মিসেস শন এবেরসল
পড়ে কৃতার্থ করেছেন ডাঃ ডেভিড ওয়াল্টার, মিঃ ফয়েজ খাঁন
মিঃ হামিদ চৌধুরী ও মুন্নি হক
কম্পিউটার বর্ণ-বিন্যাস ঃ মিসেস বর্ণা ঘোষ

Published by:

GoodSeed International
P.O. Box 3704, Olds, AB, T4H 1P5, Canada.
Email: info@goodseed.com

ISBN: 978-1-77304-048-6

Bangla Edition of: **All that the Prophets have Spoken**

Copyright © 2001, 2014 GoodSeed International.

মূল কপিরাইটঃ ©2007, 2017 by GoodSeed International

এই বইতে ব্যবহৃত পাক-কিতাবের আয়াত সমূহ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে অনুমতিক্রমে উদ্ধৃত হয়েছে।

Printed in the USA
201711-575-0000

... মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে তাঁর (হযরত ঈসার) নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের (উম্মতদের) বুঝিয়ে বললেন। ...

সূচীপত্র

ভূমিকা ৭

প্রথম অধ্যায়

১ পূর্ব কথা ১১
২ বিভিন্ন বিষয়কে সঠিক ভাবে বোঝা ১২
৩ অনন্য কিতাব ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ ২৩
২ ফেরেশতা ২৮

তৃতীয় অধ্যায়

১ আসমান ও জমীন ৩৩
২ তা চমৎকার হয়েছে ৩৮
৩ পুরুষ ও স্ত্রীলোক ৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

১ শয়তান ৫৫
২ আল্লাহ্ কি একথা বলেছেন? ৫৯
৩ তুমি কোথায়? ৬৬
৪ মৃত্যু ৭০

পঞ্চম অধ্যায়

১ আপাতঃবিরোধী কিন্তু সত্য ৭৯
২ গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া ৮৫
৩ ইদ্রিস নবী ৯৫
৪ নূহ নবী ৯৬
৫ ব্যাবিল ১০৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ আইয়ুব নব ১১১
২ ইব্রাহিম নবী ১১২
৩ খাঁটি ঈমান ১১৬
৪ বিবি হাজেরা ও ইসমাইল ১১৮
৫ ইসমাইল ও ইসহাক ১২০
৬ যোগানদাতা ১২৩

সপ্তম অধ্যায়

১ হযরত ইয়াকুব ও এহুদা ১৩১
২ মূসা নবী ১৩৩
৩ ফেরাউন ও উদ্ধার-ঈদ ১৩৬

অষ্টম অধ্যায়

১ রুটি, বারুই পাখি ও পানি ১৪৫
২ দশটি বিশেষ হুকুম ১৪৮
৩ আদালত-ঘর ১৫৭

নবম অধ্যায়

১ আবাস-তাম্বু ১৬৫
২ অবিশ্বাস ১৭৫
৩ কাজীগণ, বাদশাহ্গণ ও নবীগণ ১৭৮

দশম অধ্যায়

১ জিবরাইল ফেরেশতা ১৮৯
২ মসীহ্ ১৯৮
৩ আলেমদের মধ্যে ২০৭
৪ নবী ইয়াহিয়া ২০৯

একাদশ অধ্যায়

১ প্রলোভন ২১৭
২ ক্ষমতা ও খ্যাতি ২২০
৩ নীকদীম ২২৩
৪ প্রত্যাখ্যান ২২৬
৫ জীবন-রুটি ২৩১

দ্বাদশ অধ্যায়

১ নোংরা কাপড় ২৩৫
২ সেই পথ ২৩৮
৩ সেই পরিকল্পনা ২৪০
৪ লাসার ২৪২
৫ দোজখ ২৪৬
৬ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান ২৪৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১ বাগান ২৫৫
২ মাথার খুলির স্থান ২৫৯
৩ শূন্য কবর ২৭৩

চতুর্দশ অধ্যায়

১ অচেনা লোকটি ২৮৩
২ শরীয়ত ও নবীগণ ২৮৬
-হযরত আদম থেকে নূহ নবী পর্যন্ত-
৩ শরীয়ত ও নবীগণ ২৯৩
-হযরত ইব্রাহিম থেকে শরীয়ত দেওয়া পর্যন্ত-
৪ শরীয়ত ও নবীগণ ৩০৩
-আবাস-তাম্বু থেকে ব্রোঞ্জের সাপ পর্যন্ত-
৫ শরীয়ত ও নবীগণ ৩০৯
-হযরত ইয়াহিয়া থেকে হযরত ঈসার পুনরুত্থান পর্যন্ত-

পঞ্চদশ অধ্যায়

১ নবীদের বলা কথাগুলো ৩১৯
২ হযরত ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া ৩২০
৩ আপনি কি নবীদের কথায় বিশ্বাস করেন? ৩২২

পরিশিষ্ট

টীকা ৩২৭
কিতাবুল মোকাদ্দস নির্বাচন ৩২৯
একটি সাধারণ প্রশ্ন ৩৩০
গ্রন্থ-তালিকা ৩৩১
অতিরিক্ত তথ্য ৩৩২

পাঠকদের জন্য লক্ষ্যণীয়ঃ

১। বইটি পড়তে পড়তে হয়ত অনেক শব্দ বুঝতে আপনার অসুবিধা হতে পারে, সেজন্য আরও বুঝবার সুবিধার্থে ৩২৯ পৃষ্ঠায় কিছু কিছু শব্দের টীকা দেওয়া হয়েছে।

২। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে আপনি কোন কোন শব্দের বা বাক্যের উপরে সংখ্যা দেখতে পাবেন। যেমন- প্রথম অধ্যায়ের ১১ পৃষ্ঠায় "পার্থক্য নেই।৩।" এর অর্থ এই বিষয়ে আরও অতিরিক্ত তথ্যের জন্য আপনাকে ৩৩৫-৩৩৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া 'অতিরিক্ত তথ্য' অধ্যায় অনুসারে দেখতে হবে।

৩। এছাড়াও দেখতে পাবেন কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে নেওয়া আয়াতগুলো বাঁকা অক্ষরে লেখা হয়েছে।

ভূমিকা

পৃথিবীর লোকেরা অনেক কিছু বিশ্বাস করে। আমরা এসব বিশ্বাসকে ধর্ম, ভ্রান্ত শিক্ষা বা ব্যক্তি মতামত যা-ই বলি না কেন, সেগুলোকে আমরা এড়াতে পারি না। ইতিহাসের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত লোকেরা ধর্ম নিয়ে অনেক যুদ্ধ করেছে। অতীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে এরকম যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকেরা পৃথিবীর চারদিকে সহজেই ভ্রমণ এবং কাছের ও দূরের জাতিদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাজ-কর্ম করতে পারে। এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের কাছাকাছি বাস করে। যেহেতু আমরা একে অন্যের আরও কাছাকাছি বসবাস করছি, তাই বড় বড় সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

আমাদের প্রতিবেশী লোক বা জাতিরা কি বিশ্বাস করে, কেন বিশ্বাস করে আমাদের তা অবশ্যই জানা দরকার। যদিও আমরা কখনও তাদের সাথে হয়তো একমত হতে পারি না, কিন্তু আমরা জ্ঞানপূর্বক ও দয়া সহকারে কথাবার্তা বলতে পারি। যেহেতু আমরা তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে বুঝি, তাই আমরা তাদের সাথে খোলামেলা ভাবে কথাবার্তা বলতে পারি এবং এতে আমাদের প্রতিবেশীদেরও আলোচনা করতে সুবিধা হবে।

নবীদের বলা কথাগুলো নামক এই বইটি অন্য একটি কিতাব সম্বন্ধে বলে। ইতিহাসের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সেই কিতাবটি সবচেয়ে বেশী বিতরণ হয়েছে এবং এটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আর সেই কিতাবটির নাম কিতাবুল মোকাদ্দস। যদি আপনি কিতাবুল মোকাদ্দসের তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ ও নবীদের কিতাব সমূহ এবং ইঞ্জিল শরীফে লেখা কথাগুলো বুঝতে চান, তাহলে নবীদের বলা কথাগুলো নামক এই বইটি আপনারই জন্য।

এই বইটি আমি সুন্দর ও নিরপেক্ষ ভাবে লিখতে চেষ্টা করেছি, যদিও তা সহজ বিষয় ছিল না। নবীরা যেসব কিতাব লিখে গিয়েছেন, সেই কিতাবগুলোর প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে একটি সাড়া দাবী করে। তারপরেও পাক-কালামকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি কাজ করে গিয়েছি যাতে পাক-কিতাবের কথা পরিষ্কার বুঝা যায় এবং পাঠক হিসাবে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই বইটি সম্বন্ধে আপনি কি বিশ্বাস করবেন, তা শুধুমাত্র আপনারই বিষয়।

পাক-কালামকে সত্য হিসাবে তুলে ধরায় কেউ কেউ হয়ত আমাকে ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দোষে দোষী করবে। আমার বিশ্বাস আল্লাহ্‌র কালাম সেইভাবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছে। যদি আমি পাক-কালামকে অন্য ভাবে তুলে ধরতাম, তাহলে আমি পাক-কিতাবের প্রতি সত্যবাদী হতাম না। আমি আমার লেখনীতে নবীদের বাণীকে দুর্বল করতে চাই নি। পাক-কিতাব এর বক্তব্যে সম্পূর্ণ সরাসরি ভাবে কথা বলেছে। তাই চেষ্টা করেছি কোন রকম অস্পষ্টতা প্রদর্শন না করে পাক-কিতাবকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে।

সুতরাং নবীদের বাণী ঠিক যেভাবে লেখা হয়েছে, সেভাবেই যদি আপনি তা বুঝতে চান, তাহলে আসুন আমরা নবীদের বলা কথাগুলো নামক এই বইটি পড়ি। নবীদের বাণী আপনাকে অবাক করে দিতে পারে।

আল্লাহ্‌র পাক-কালাম বলে

"...এস।" যার পিপাসা পেয়েছে সে আসুক এবং যে পানি খেতে চায় সে বিনামূল্যে জীবন-পানি খেয়ে যাক।

যে লোক এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম শোনে আমি তার কাছে এই সাক্ষি দিচ্ছি যে, কেউ যদি এর সঙ্গে কিছু যোগ করে তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা সমস্ত গজব তার জীবনে যোগ করবেন।

আর এই কিতাবের সমস্ত কথা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম থেকে যদি কেউ কিছু বাদ দেয় তবে আল্লাহ্‌ও এই কিতাবে লেখা জীবন-গাছ ও পবিত্র শহরের অধিকার তার জীবন থেকে বাদ দেবেন।

ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২২:১৭-১৯ আয়াত

প্রথম অধ্যায়

১ পূর্ব কথা

২ বিভিন্ন বিষয়কে সঠিক ভাবে বোঝা

৩ অনন্য কিতাব

১ পূর্ব কথা

সময়টা আনুমানিক ৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যাহ্নের সূর্যটা ছিল খুব গরম। সবকিছু ছিল নীরব। সেই গরমের মধ্যে এমনকি পাখীরা পর্যন্ত গান গাচ্ছিল না। ধুলোময় রাস্তা দিয়ে ক্লিয়পা নামে একজন লোক তাঁর বন্ধুর সাথে হাঁটছিলেন। তিনি একটি শুকনা কাঁদার ঢেলাকে সামনের দিকে লাথি মারলেন। গভীর শ্বাস নিয়ে ক্লান্তভাবে আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আর কয়েক কিলোমিটার দূরে তাঁর গ্রামের বাড়ী ইম্মায়ূ। তারা ইম্মায়ূতে পৌঁছার আগেই সূর্য ডুবে যাবে। সাধারণতঃ খুব সকাল সকাল তাঁরা জেরুজালেম থেকে যাত্রা শুরু করত, কারণ জেরুজালেম থেকে ইম্মায়ূ পর্যন্ত যেতে প্রায় ১১ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তা হাঁটতে হত। কিন্তু সেই দিন জেরুজালেমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তাঁদেরকে জেরুজালেম শহরে দুপুর পর্যন্ত থেকে যেতে বাধ্য করেছিল। জেরুজালেম শহর ত্যাগের পূর্বে তাঁরা সেই ঘটনাগুলোর বিষয়ে আরও বিস্তারিত ভাবে শোনার আশা করেছিলেন।

সেই দিনের ঘটনাগুলোর বিষয়ে ক্লিয়পা গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর পাশে পাশে হাঁটা বন্ধুটির কণ্ঠ শুনে সজাগ হলেন। তাঁর বিরক্ত-হওয়া সঙ্গীটি দ্বিতীয় বারের মত একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সেই দু'জন সেই দিনের কথা এবং গত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনার বিষয় এত সবিস্তারে পর্যালোচনা করেছিলেন যে, তাঁদের আলোচনা ফুরিয়ে গিয়েছিল। ক্লিয়পা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি তার চাইতেও বেশী বিভ্রান্ত ছিলেন। গত কিছুদিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর জীবনে উত্তরের চেয়ে যেন প্রশ্নের সংখ্যা আরও বেশী।

পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে যেতে যেতে তাঁরা রাস্তার একটি বাঁকা মোড়ে এসে গেলেন। তারপরেই একজন **অচেনা লোকের** সাথে তাঁদের দেখা হল।

সেই অচেনা লোকটির কথায় তাঁরা খুবই শিহরিত হয়েছিলেন। সেইজন্যই কয়েক ঘন্টা পরে সেই দিন রাতেই ক্লিয়পা ও তাঁর বন্ধুটি আবার ইম্মায়ূ থেকে জেরুজালেমে তাঁদের বন্ধুদের কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁদের শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল। তাঁদের জেরুজালেমের বন্ধুরা জানতে চেয়েছিলেন কিভাবে সেই অচেনা লোকটি এসে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছে। ক্লিয়পা ও তাঁর বন্ধুটি সেই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দিতে পারেন নি। প্রথমে ক্লিয়পা চিন্তা করেছিলেন সেই অচেনা লোকটি হয়ত একটি বড় পাথরের ছায়া থেকে বের হয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গীটির ব্যাখ্যার সাথে তার চিন্তা মিলল না। আসলে সেই অচেনা লোকটি কোথা থেকে এসেছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না। শেষে ক্লিয়পা বলেছিলেন, "আসলে তিনি হঠাৎ করেই এসেছেন।" জেরুজালেমের বন্ধুরা রসিকতা করে বলেছিলেন, মনে হয় গরমের কারণে ক্লিয়পা ও তাঁর বন্ধুটির মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু একটি বিষয়ে ক্লিয়পা ও তাঁর বন্ধুটি নিশ্চিত ছিলেন। সেই অচেনা লোকটি সেই প্রাচীন কিতাবগুলোর সংগ্রহ, অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দসের...

> *...মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:২৭ আয়াত)*

সেই অচেনা লোকটি পাক-কিতাবের কথাগুলো খুবই পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে তিরস্কার করে বলেছিলেন-

> *"আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে,* ***নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না।"***
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:২৫ আয়াত)*

ক্লিয়পা ও তাঁর বন্ধুটি হয়ত নবীদের কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করছিলেন না। কিন্তু সেই অচেনা লোকটি যখন নবীদের বাণী ব্যাখ্যা করলেন তখন তাঁদের মনের দুঃখ ও সন্দেহ চলে গিয়েছিল। সেই অচেনা লোকের কথা থেকে পাওয়া তাঁদের নতুন জ্ঞান নিয়ে তাঁরা খুবই শিহরিত হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যেকোন ভাবে তাঁদের জেরুজালেমের বন্ধুদেরও এসব কথা শোনা দরকার।

তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহ, অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দস সম্বন্ধে সেই *অচেনা লোকটি* এমন কি বলেছিলেন, যা তাঁদেরকে পাক-কিতাবের বিভিন্ন ঘটনা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল? সেই **অচেনা লোকটির** বলা কথাগুলো সম্বন্ধেই এই বইটি লেখা হয়েছে। আর কিতাবুল মোকাদ্দস স্পষ্ট ভাবে বোঝার জন্য সেই অচেনা লোকটির মত আমরাও সেই একই কাজ করব। অর্থাৎ **নবীদের বলা কথাগুলো** সতর্ক ভাবে দেখার জন্য আমরা পাক-কিতাবের শুরুতে ফিরে যাব।

২ বিভিন্ন বিষয়কে সঠিক ভাবে বোঝা

যখন আপনি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন আল্লাহ্‌র কালাম বুঝার জন্য আপনার জীবনের কয়েকটা ঘন্টা ব্যবহার করা অযৌক্তিক কিছু নয়।

পাক-কিতাবে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বলার আছে।

শত শত বছর ধরে লোকেরা আগ্রহ ভরে প্রাচীন কিতাবগুলোর সংগ্রহ, অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দস সবচেয়ে বেশী কিনেছে। দুনিয়ার ইতিহাসে এই কিতাবটিই সবচেয়ে বেশী বার পড়া, অনুবাদ ও মুদ্রণ করা হয়েছে। যেসব লোক দাবী করে তারা কিছুটা জানে, তাদেরকে বুঝতে হবে মূলতঃ কিতাবুল মোকাদ্দসে কি কি বিষয় লেখা আছে।

একটি ছবি মেলানো

পাক-কিতাবের কথাগুলো বুঝতে পারাটা অনেকটা একটা ঘর তৈরীর মত কিংবা পাশে দেওয়া বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুরো একটা ছবির খণ্ড খণ্ড অংশগুলো একসাথে মেলানোর মত। আল্লাহ্‌র কালামকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য কিতাবের বিভিন্ন অংশকে অবশ্যই সঠিক ভাবে একটার সাথে আরেকটা জোড়া লাগাতে হবে। আর তা করার জন্য আমরা শিক্ষণের নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি/তত্ত্ব প্রয়োগ করব। এসব তত্ত্ব প্রতিদিন স্কুল-কলেজের ক্লাশ রুমেও ব্যবহৃত হয়।

১। প্রাধান্য দেওয়ার তত্ত্ব

এই প্রথম তত্ত্বটি বর্ণনা করে যে, একটি নতুন বিষয় অধ্যয়ন করার সময় *আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রথমে শিখবেন*। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন নির্মাতা একজন লোককে শিক্ষা দিতে চায় কিভাবে একটি ঘর নির্মাণ করতে হবে, তাহলে তিনি একটি সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, শক্ত দেয়াল উঠানো এবং মজবুত ছাদ নির্মাণের মত বড় বিষয়ের উপরে জোর দান করবেন। পরবর্তীতে তিনি জোর দেবেন ছোট ছোট বিষয়, যেমন- ফার্ণিচার বা ঘরের রং নির্বাচন, ইত্যাদির উপর।

ঠিক একই ভাবে পাক-কিতাব অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু সব বিষয়ের গুরুত্ব সমান নয়। এই বইয়ে আমরা আল্লাহ্‌র কালামের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব। যখনই আপনি সেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন তখনই পাক-কিতাবের কথাগুলো আপনাকে গভীর অথচ সহজ অর্থ দান করবে।

২। গল্প বলার তত্ত্ব

এই দ্বিতীয় তত্ত্বটি যৌক্তিক। যখন একজন লোক একটি গল্প পড়েন তখন তিনি দশম অধ্যায় দিয়ে শুরু করেন না, এরপর লাফ দিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে চলে যান না বা দ্বিতীয় অধ্যায় পড়ে নবম অধ্যায়ে গিয়ে শেষ করেন না। কখনও তিনি তা করেন না! আমরা সবাই জানি একটি গল্প সম্বন্ধে বুঝার জন্য একজন পাঠককে *অবশ্যই প্রথম থেকে শুরু করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত ধাপে ধাপে পড়ে যেতে হবে*। হয়ত আপনি ভাবছেন এই তত্ত্বটি সবাই জানে। তাই বলার কোন দরকার নাই। কিন্তু পাক-কিতাব পড়ার সময় অনেক লোক ছোট ছোট অংশ এলোমেলো ভাবে পড়ে এবং তার পরে তারা বিভ্রান্ত হয়।

যেহেতু পাক-কিতাবের বেশীর ভাগ কথা ধারাবাহিক গল্প বা ঘটনা বর্ণনা করে, তাই আমরা পাক-কিতাবকে এর স্বাভাবিক ধারাবাহিক অগ্রগতিতে পড়ব। একই সময়ে আমরা *প্রাধান্য দেওয়ার* তত্ত্ব প্রয়োগ করব। সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলো প্রথমে আলোচনা করব এবং যেভাবে ধোয়ার পরে কাপড়গুলোকে

দড়িতে ঝুলিয়ে দিই সেভাবে গল্পগুলোকে একটি সারিতে একই সাথে নেড়ে দেব। এভাবে আমরা একটার পর একটা করে মূল ঘটনা বুঝতে পারব। যেহেতু এই সামগ্রিক ধারণার মধ্যে সব ঘটনা নেই তাই ধারাবাহিকতায় কিছু ফাঁক থাকবেই।

পরবর্তীতে সামগ্রিক বা পুরো ছবিটি দেখার পরে সেসব ফাঁক পূরণ করা যাবে। যদিও এই বইয়ের মধ্যে কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রত্যেকটি ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, তবুও যেসব ঘটনা আমরা আলোচনা করব সেসব ঘটনা একটি ধারাবাহিক গল্প হিসাবে থাকবে।

৩। গাণিতিক তত্ত্ব

এই তত্ত্বটি অনুসারে শেখার বেলায় প্রথমে সহজ বিষয় দিয়ে শুরু করুন, তারপর কঠিন বিষয়ের দিকে অগ্রসর হোন। উদাহরণ স্বরূপ, 'ক্লাশ ওয়ানের' ছেলেমেয়েদেরকে বীজগণিত শিক্ষা দেওয়া হয় না। তার চেয়ে বরং মৌলিক যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ শিক্ষা দেওয়া হয়, যেমন- *একটি আম + একটি আম = দু'টি আম*। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে উঠতে এবং শিখতে শিখতে বিভিন্ন জটিল অংক, যেমন- বীজগণিত, জ্যামিতি বুঝতে শুরু করে। কিন্তু যদি শিক্ষক/শিক্ষিকারা ক্লাশ ওয়ানে বীজগণিত শিক্ষা দেন তাহলে তারা ছেলেমেয়েদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলবেন।

পাক-কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারেও আমরা এই একই তত্ত্ব ব্যবহার করতে পারি। যদি আমরা মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা অনেক অস্বাভাবিক ধারণা লাভ করব। এতে একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয় মিশিয়ে ফেলব। এই সমস্যা পরিহার করার জন্য আগে অর্জন করা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে সেই গল্পটির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

৪। পরিষ্কার করার তত্ত্ব

এই চতুর্থ তত্ত্বটি দু'টি দিক নির্দেশ করে। প্রথমতঃ কিছু কিছু শব্দের অর্থ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু পাক-

কিতাবের এমন একটি পদ্ধতি আছে, যা একটি শব্দের অর্থকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। তাই একটি শব্দের সংজ্ঞা দেওয়ার জন্য পাক-কিতাব একটি গল্প বলে। সেই গল্পের মধ্য দিয়ে আমরা শিখি সেই শব্দটির আসল অর্থ কি। এই অর্থ পরিবর্তন হতে পারে না। এমতাবস্থায় পরিষ্কার করার তত্ত্বটি আমাদের পরামর্শ দেয় *আল্লাহ্‌র কালামই* যেন এর নিজস্ব শব্দগুলোর সংজ্ঞা দান করে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা বিষয় অনুসারে বিভিন্ন বিজ্ঞান, যেমন- জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা বা জীববিদ্যা অধ্যয়ন করি। আমরা এসব বিজ্ঞানকে একটির সাথে অন্যটিকে মিশিয়ে ফেলি না। একজন শিক্ষকের উচিত নয় এক ঘন্টার একটি ক্লাশে কোন নতুন ছাত্রকে সৌরজগৎ এবং কোষের গঠন সম্বন্ধে একই সাথে শিক্ষা দেওয়া। সেটা খুবই বিভ্রান্তিকর হবে! যখন বিষয়বস্তু অপরিচিত থাকে তখন পরিষ্কার করার তত্ত্ব একজন শিক্ষককে *একটি সময়ে একটি বিষয়েই* শিক্ষাদান করতে পরামর্শ দান করে। এই বইয়ে আমরা এই তত্ত্বটিও অনুসরণ করব।

উপরের এই চারটি তত্ত্ব প্রয়োগ করতে করতে আমরা আল্লাহ্‌র কালাম পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারব। এতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছবির খণ্ড খণ্ড অংশগুলো সঠিক ভাবে জোড়া লেগে একটি ছবিই হয়ে যাবে। যেমন- ৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া ছবিটির ছড়ানো ছটানো ৪টি টুকরাকে জোড়া লাগালে সূর্যমুখী ফুলগুলোর এই পূর্ণাঙ্গ ছবিটি পাওয়া যায়।

৩ অনন্য কিতাব

অবশ্য কিতাবুল মোকাদ্দস একটি অনন্য কিতাব। এটি ৬৬টি কিতাবের সমাহার। কিতাবুল মোকাদ্দসের অনন্যতা সম্বন্ধে একজন লেখক লিখেছেনঃ *এই কিতাবটি-*

১। প্রায় ১৫০০ বছর ধরে লেখা হয়েছিল।
২। ৪০ প্রজন্ম ধরে লেখা হয়েছিল।
৩। ৪০ জনের বেশী ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। এই লেখকেরা ছিলেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের, যেমন-

- *হযরত মূসা- মিসরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন রাজনৈতিক নেতা।*
- *সাহাবী পিতর- একজন জেলে*
- *হযরত আমোস- একজন রাখাল*
- *ইউসা- একজন সামরিক নেতা*
- *নহিমিয়া- একজন বাদশাহ্‌র আঙ্গুর-রসের পাত্র বহনকারী*
- *হযরত দানিয়াল- একজন প্রধান মন্ত্রী*

- *হযরত সোলায়মান- একজন বাদশাহ্*
- *লূক- একজন ডাক্তার*
- *সাহাবী মথি- একজন খাজনা-আদায়কারী*
- *সাহাবী পৌল- একজন ধর্মীয় শিক্ষক*

৪। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় লেখা হয়েছিল। যেমন-

- *হযরত মূসা- মরু-এলাকায়*
- *হযরত ইয়ারমিয়া- জেলখানায়*
- *হযরত দাউদ- পাহাড়ী এলাকায় এবং রাজবাড়ীতে*
- *সাহাবী পৌল- জেলখানায়*
- *লূক- ভ্রমণ করার সময়*
- *সাহাবী ইউহোন্না- পাটম দ্বীপে নির্বাসনে থাকার সময়*
- *অন্যান্য লেখকেরাঃ বিভিন্ন যুদ্ধের সময় লিখেছিলেন*

৫। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা হয়েছিল। যেমন-

- *হযরত দাউদ- যুদ্ধের সময়*
- *হযরত সোলায়মান- শান্তির সময়*

৬। মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সময় লেখা হয়েছিল। যেমন- কেউ কেউ মহা আনন্দ এবং অন্যেরা গভীর দুঃখ ও হতাশা থেকে লিখেছেন।

৭। তিনটি মহাদেশে লেখা হয়েছিল। যেমন-

- *এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ।*

৮। তিনটি ভাষায় লেখা হয়েছিল। যেমন-

- *ইবরানী, অরামীয় এবং গ্রীক ভাষায়।*

৯। চূড়ান্ত বিষয় হল- এই কিতাবের বিষয়সূচীর মধ্যে এমন কিছু কিছু বিষয় আছে যেসব বিষয়ে অনেক বির্তক চলে। তারপরও কিতাবুল মোকাদ্দসের লেখকেরা প্রথম কিতাব পয়দায়েশ থেকে শেষ কিতাব প্রকাশিত কালাম পর্যন্ত একই ঐক্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে সব কথা বলেছেন। এই ভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস একটি গল্পই বর্ণনা করেছে।...[১]

সাধারণ ও সহজভাবে আমরা পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসের এই *একটি মাত্র গল্পই* দেখতে চাই। নিশ্চিতভাবে পাক-কিতাবের বিষয়ে সবচেয়ে অদ্বিতীয় ও অনন্য সত্য হল পাক-কিতাব নিজেই দাবী করে এটা আল্লাহ্‌র নিজের মুখের কথা বা কালাম।

পাক-কিতাবের কথাগুলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে

পাক-কিতাবের পৃষ্ঠাগুলোতে আমাদের বলা হয়েছে--

> *পাক-কিতাবের প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে...।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ তীমথিয় ৩:১৬ আয়াত)*

"আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে" কথাটি অধ্যয়ন করার মত একটি বিষয়। ঠিক যেভাবে একজন লোক তার দেহের মধ্যে থেকে আসা শ্বাস একই ভাবে পাক-কিতাবের সব কথাও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে। আল্লাহ্ এবং তাঁর কালামকে আলাদা করা সম্ভব নয়। সেই কারণে পাক-কিতাবকে *আল্লাহ্‌র কালাম* হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবীগণ

আল্লাহ্‌র তাঁর নিজের সম্বন্ধে মানুষকে দিয়ে যা লিখাতে চেয়েছিলেন, সে কথা তিনি তাদের বলে দিয়েছিলেন। এসব মানুষ আল্লাহ্‌র বলা কথাগুলোই লিখেছিলেন। আর এঁদের বেশীর ভাগকেই বলা হত নবী।

> *অনেক দিন আগে নবীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে... কথা বলেছিলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১:১ আয়াত)*

প্রাচীনকালে একজন নবী ছিলেন একজন বার্তাবাহক বা দূত, যিনি লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র কথাগুলো বলতেন। তাঁদের বলা সেই বাণীটি জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দিত। কিন্তু প্রায় সময়েই তাঁরা ভবিষ্যতের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধেও কথা বলতেন। ভবিষ্যতের ঘটনাগুলো শিক্ষার একটি বাস্তব দিকও ছিল। সেই নবীরা কি সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌র কালাম বলেছেন কিনা এটা ছিল তা নির্ধারণ করার একটি শক্তিশালী পরীক্ষা।

> *কোন নবী যদি মাবুদের নাম করে কোন কথা বলে আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সেই কথা মাবুদ বলেন নি।*
> *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২২ আয়াত)*

একজন নবীর বাণী তখনই সত্য হত যখন তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো নির্ভুলভাবে পূর্ণ হত। তাঁর বাণীকে ১০০% নিখুঁত হতে হত। তাঁর বাণীর মধ্যে কোন ভুল থাকতে পারত না।

> *কিন্তু আমি হুকুম দিই নি এমন কোন কথা যদি কোন নবী আমার নাম করে বলতে সাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে।* *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২০ আয়াত)*

আল্লাহ্ নবীদেরকে এমন ভাবে পরিচালিত করেছিলেন যে, তিনি তাঁদেরকে যা যা লিখতে বলেছিলেন, তাঁরা ঠিক তা-ই লিখেছিলেন। তাঁদের লেখার মধ্যে কোন ভুলই ছিল না। একই সময়ে আল্লাহ্ এই মানুষ লেখকদেরকে তাঁদের নিজস্ব লেখনী পদ্ধতি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে নিজেদের ব্যক্তিগত চিন্তাগুলো যোগ করার ব্যাপারে তাঁরা স্বাধীন ছিলেন না।

> *তবে সব কিছুর উপরে এই কথা মনে রেখো যে, কিতাবের মধ্যেকার কোন কথা নবীদের মনগড়া নয়, কারণ নবীরা তাঁদের ইচ্ছামত কোন*

> *কথা বলেন নি; পাক-রূহের দ্বারা পরিচালিত হয়েই তাঁরা আল্লাহ্‌র দেওয়া কথা বলেছেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ পিতর ১:২০,২১ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ যে একজন লোকের লেখাকে অনুমোদন দান করেছেন তা নয়, আবার নবীরাও যে তাঁদের নিজেদের শক্তি দ্বারা কিতাবুল মোকাদ্দসের কিতাবগুলো লিখেছেন তাও নয়। আল্লাহ্‌ই তাঁদের প্রত্যেককে *পরিচালনা দান* করেছিলেন।

সম্পূর্ণ নির্ভুলতা

নবীরা আল্লাহ্‌র কথাগুলো গুটানো কাগজের (স্ক্রোল) উপর লিখেছিলেন। সাধারণতঃ পশুর চামড়া বা গাছের আঁশের তৈরী কাগজ দিয়ে এই স্ক্রোল তৈরী করা হত। নবীদের লেখা এই আসল লেখাগুলোকে বলা হত *মূল লেখা* বা নিজের *হাতের লেখা*।

যেহেতু এই মূল লেখাগুলো বেশী দিন টেকসই ছিল না, তাই আবারও গুটানো কাগজের উপরে তা হুবহু লেখার দরকার পড়ত। কী আশ্চর্যজনক ছিল সেই লেখকদের কাজ, যাঁরা আল্লাহ্‌র কালামগুলো মূল লেখা থেকে হাতে আবার গুটানো কাগজের উপরে হুবহু লিখতেন। এই লেখকেরা জানতেন তাঁরা স্বয়ং আল্লাহ্‌র কালামই মূল লেখা থেকে তুলছেন। আর একারণেই তাঁদের সেই কাজ ছিল এ যাবৎ কালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। ইবরানী ভাষায় লেখা সেই মূল অংশ তুলতে গিয়ে...

> *যত কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের কাজই হোক না কেন, যা কল্পনা করা সম্ভব এমন প্রত্যেকটি নিরাপত্তামূলক উপায়ই তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন যাতে মূল অংশের সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার কাজ নিশ্চিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে একটি কিতাবের মধ্যেকার বর্ণগুলোর সংখ্যা গোণা হত এবং কিতাবটির মাঝখানের বর্ণটি চিহ্নিত করা হত। একই ভাবে শব্দগুলোও গোণার পরে আবার মাঝখানের শব্দটি চিহ্নিত করা হত।*[২]

মূল লেখা এবং সেসব মূল লেখা থেকে লেখকেরা আবার যেসব লেখা হুবহু তুলতেন, উভয় ক্ষেত্রেই এটা করা হত যাতে নিশ্চিত করা যায় যে, উভয়ই একেবারে একই রকমের।

১৯৪৭ সালে এরকম কিছু প্রাচীন স্ক্রোল (গুটানো বই) পাওয়া গিয়েছিল ১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের লেখা। এই স্ক্রোলগুলো "মরুসাগর স্ক্রোল" নামে পরিচিত। ১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে লেখা এই স্ক্রোলের সাথে পরবর্তী ১০০০ বছরে (অর্থাৎ ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) লেখকেরা যেসব লেখা হুবহু তুলেছে এবং পুনরায় তুলেছে, সেসব লেখার মধ্যে একটা তুলনা করা হয়েছে। এতে দেখা গিয়েছে মরুসাগর স্ক্রোলের সাথে সেগুলোর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই।[৩]

যোষেফাস নামে প্রথম শতাব্দীর একজন ইহুদী ইতিহাসবিদ্ পাক-কিতাবের বিষয়ে তাঁর জাতির লোকদের কাছে বলেছিলেন এই ভাবে-

> *আমাদের করা কাজ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে কত দৃঢ় ভাবে আমরা আমাদের নিজেদের জাতির ঐ কিতাবগুলোকে সম্মান দান করেছি। আমরা অনেক যুগ পার হয়ে এসেছি। আর এই অনেক যুগ ধরে কেউই পাক-কিতাবে কোন কিছু যোগ করার ক্ষেত্রে, এর থেকে কিছু বাদ দিতে কিংবা এর মধ্যেকার কোন কিছু পরিবর্তন করতেও সাহস করে নি, ...কিন্তু আমরা ইহুদীরা সবাই স্বাভাবিক ভাবেই সেসব কিতাবকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা কিতাব হিসাবে সম্মান দান করেছি।* [৪]

মূল লেখা থেকে আবার যাঁরা হুবহু তুলেছেন, সেই লেখকেরা সম্পূর্ণরূপে একথা জানতেন যে, কিতাবের কোন অংশ পরিবর্তন করলে তাঁদের উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে। তাই নিশ্চিত হবার মত আমাদের এমন যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, নবীরা যা প্রথমে নিজেদের হাতে লিখেছিলেন তা আর আমাদের বর্তমান কিতাবুল মোকাদ্দস মূলতঃ একই।

বিভিন্ন অনুবাদ

কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল লেখাগুলো সর্বপ্রথমে ইবরানী, অরামীয় এবং গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। আর সেসব মূল লেখাগুলোর একই ভাষা ব্যবহার করে লেখকেরা আবার তা হুবহু তুলে নিয়েছিলেন। যেহেতু আমরা অনেকেই উপরের এই ভাষাগুলো জানি না বা বুঝি না, তাই পাক-কিতাব পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছে। আর এই অনুবাদ সমূহের উৎস ছিল মূল লেখা থেকে লেখকেরা মূল ভাষায় যেসব লেখা হুবহু তুলেছিলেন, সেসব প্রাচীন লেখা বা পাণ্ডুলিপি।

উদাহরণ স্বরূপ, তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহের বিভিন্ন অনুবাদ এমন সব প্রাচীন লেখা ব্যবহার করেছে, যা আজও আমরা পড়তে পারি। এসব প্রাচীন লেখার কাজ ঈসা মসীহের জন্মের ১০০ বছর আগে সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত ঈসা তাঁর জীবনকালে ইবরানী ভাষায় লেখা পাক-কিতাবের গ্রীক অনুবাদ ব্যবহার করেছিলেন। আর সেই অনুবাদ কাজ হযরত ঈসার দুনিয়ায় আগমনের ১৫০ বছর আগে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই অনুবাদটি আজও আছে এবং তা আমরা পড়তে পারি। অন্য দিকে ইঞ্জিল শরীফ (যে কিতাব ঈসা মসীহের জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়) ২৭০০টিরও বেশী গ্রীক পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করেছে। আর এই পাণ্ডুলিপি সমূহ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে লেখা হয়েছিল। তাই এসব প্রাচীন উৎসের যেকোন একটিকে বর্তমানে আমরা যে কিতাব পড়ছি তার নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে আরেকবার আমরা

দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমানে আমাদের ব্যবহৃত পাক-কিতাব আর প্রাচীন নবীদের হাতে লেখা কিতাব আসলেই একই কিতাব।

নবীরা নিজেরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁর লিখিত কালাম যাতে পরিবর্তন না হয় সেজন্য আল্লাহ্ নিজেই তা সংরক্ষণ করবেন।

> *ঘাস শুকিয়ে যায় আর ফুলও ঝরে যায়, কিন্তু আমাদের আল্লাহ্র কালাম চিরকাল থাকে।* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪০:৮ আয়াত)*

এছাড়া হযরত ঈসা মসীহ্ বলেছেন-

> *"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আসমান ও জমীন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতদিন না তৌরাত কিতাবের সমস্ত কথা সফল হয় ততদিন সেই তৌরাতের এক বিন্দু কি এক মাত্রা মুছে যাবে না।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:১৮ আয়াত)*

আল্লাহ্ মহান ও অপরিবর্তনশীল বলেই বিশ্বস্ত ভাবে তাঁর কালামকে রক্ষা করেছেন।

আল্লাহ্র কালাম

বিভিন্ন অনুবাদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনার বিস্তারিতভাবে মনে রাখার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা মনে রাখতে হবে, তা হল পাক-কিতাব নিজেই দাবী করে এটা আল্লাহ্র লিখিত কালাম, মানব জাতির জন্য তাঁর বাণী। এই কিতাব পাঠ করার দ্বারা আমরা আল্লাহ্কে জানতে পারি। এই দাবী এমনকি সবচেয়ে বেশী আগ্রহহীন লোককেও কিতাবের কথা চিন্তা করাবে। জবুর শরীফের ১১৯:৮৯ আয়াত বলে-

> *"হে মাবুদ, তোমার কালাম বেহেশতে চিরকাল স্থির আছে।"*

কিতাবুল মোকাদ্দস পড়ার জন্য সাহায্যকারী বিষয়

কিতাবুল মোকাদ্দস পড়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা-না-থাকা লোকদের জানতে হবে যে, এতে ৬৬টি কিতাব আছে। প্রত্যেকটি কিতাবকে আবার *রুকু ও আয়াতে* ভাগ করা হয়েছে।

কিতাবুল মোকাদ্দসকে চারটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১। তৌরাত শরীফ। এই কিতাবটি হযরত মূসার দ্বারা লেখা হয়েছে এবং প্রায়ই এই কিতাবকে মূসার শরীয়ত বলা হয়। এই ভাগটিকে ভিন্ন ভিন্ন লোকেরা *তৌরা, হযরত মূসার কিতাব, শরীয়ত, তৌরাত শরীফ বা শরীয়তের কিতাব* বলে।

২। জবুর শরীফ। মাঝে মাঝে *কাওয়ালী বা গজলের কিতাব, কবিতা আকারে লেখা কিতাব, দাউদ নবীর লেখা কাওয়ালীর কিতাবও* বলা হয়।

৩। নবীদের লেখা কিতাব সমূহ।

৪। ইঞ্জিল শরীফ

উপরের প্রথম তিনটি ভাগ এই দুনিয়াতে ঈসা মসীহের প্রথম আগমনের পূর্বে লেখা হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছে এই তিনটি ভাগ। এই তিনটি ভাগকে নির্দেশ করার জন্য মাঝে মাঝে *"তৌরাত শরীফ ও নবীদের কিতাব সমূহ"* নাম ব্যবহার করা হয়।

আর ঈসা মসীহের আগমনের পরে ইঞ্জিল শরীফ লেখা হয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসের বাণীর এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে আছে এই কিতাবটি। *ইঞ্জিল শরীফের* মধ্যে হযরত ঈসার জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় এবং সাধারণতঃ এই কিতাবকে *সুখবর* বা *ইঞ্জিল কিতাব* বলা হয়।

দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় সম্পূর্ণ কিতাবুল মোকাদ্দসকে *বাইবেলও* বলা হয়। "বাইবেল" ল্যাটিন ভাষার একটি শব্দ, যার অর্থ "বই।" *বাইবেল* শব্দটি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা ধর্মের শব্দ নয়। কিন্তু **"নবীদের বলা কথাগুলো"** নামক এই বইটিতে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের জন্য পাক-কিতাবের মধ্যেই পাওয়া যায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করব, যেমন- *আল্লাহ্‌র কালাম, পাক-কালাম, পাক-কিতাব* ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্

২ ফেরেশতা

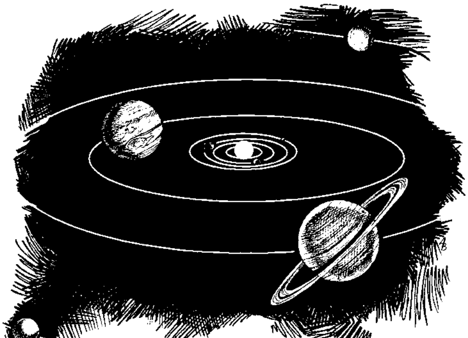

১ সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্

আল্লাহ্ মহান! পাক-কিতাব বারবার আমাদের এই কথাটি বলে। কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম বাক্যেই আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা করা হয়েছে। সেই তিনটি শব্দ খুবই গভীর অর্থ বহন করে। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে-

সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্... *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:১ আয়াত)*

আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রারম্ভিক তর্ক বা আলোচনা চলে না। এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা জানতে পারি তিনি অস্তিত্ববান। তিনি আছেন।

অনন্ত

আল্লাহ্ অনন্তকাল ধরে আছেন। গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষ সৃষ্টির আগে থেকেই আল্লাহ্ ছিলেন। এমনকি এই দুনিয়া এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আগে থেকেও তিনি ছিলেন। তাঁর কোন আরম্ভ ছিল না এবং কোন শেষও থাকবে না। আল্লাহ্ সব সময় আছেন এবং থাকবেন। পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্ অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যত পর্যন্ত আছেন। আল্লাহ্ অনন্ত। আল্লাহ্র অন্যতম নবী মূসা এই কথাগুলো লিখেছিলেন-

যখন পাহাড়-পর্বতের সৃষ্টি হয় নি, জগৎ ও দুনিয়ার সৃষ্টি হয় নি, তার আগে থেকেই আখেরাত পর্যন্ত তুমিই আল্লাহ্। *(জবুর শরীফ ৯০:২ আয়াত)*

একজন অনন্ত আল্লাহ্র ধারণা উপলব্ধি করাটা কঠিন বিষয়। এটা আমাদের বিচারশক্তির জন্য এতটাই সমস্যার যে, আমরা প্রায়ই চিন্তা করি এই বিষয়টি বোঝা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের বুঝবার সাহায্যার্থে এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন- আমরা মহাবিশ্বের সাথে অসীমতার তুলনা করতে পারি।

আমরা বেশীর ভাগ লোকই সৌরজগত সম্পর্কে বুঝতে পারি। সূর্যের চারদিকে বিভিন্ন গ্রহ আছে, যেগুলো সূর্যের কক্ষপথে ঘোরে। আমরা জানি সৌরজগত খুবই বড়। রকেটের সাহায্যে আমরা যেন সবচেয়ে দূরের দূরত্বেও পৌঁছাতে পারব বলে মনে হয়। কিন্তু আরও একধাপ এগিয়ে যান এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিমাপ করতে শুরু করুন। যদি আমরা একটি রকেটে চড়ে বসি এবং আলোর গতিতে (সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩,০০,০০০ কিলোমিটার) চলতে থাকি, তাহলে এক সেকেণ্ডে ৭ বার পৃথিবী ঘুরতে পারব! তখন সেই ভ্রমণটা আপনার কেমন লাগবে? সেই ভ্রমণটি কি সম্ভবতঃ একটু বেশি দ্রুত হবে? একই গতিতে যদি আমরা মহাশূন্যের দিকে চলতে থাকি তবে ২ সেকেণ্ডে আমরা চাঁদকে, ৪ মিনিটে মঙ্গল গ্রহ, ৫ ঘন্টায় প্লুটো গ্রহ অতিক্রম করতে পারব। সেখান থেকে আপনি আমাদের গ্যালাক্সীতে, অর্থাৎ ছায়াপথে চলে যাবেন।

আলোর গতিতে আপনি এক সেকেণ্ডে ৭বার পৃথিবী ঘুরতে পারবেন।

... দুই সেকেণ্ডে চাঁদ অতিক্রম করবেন ...

৪ মিনিটে মঙ্গল গ্রহ অতিক্রম করবেন ...

আর পাঁচ ঘন্টায় প্লুটো গ্রহ অতিক্রম করবেন ...

আলোর গতিতে আপনি ৪.৩ বছরে সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রটিতে পৌঁছাবেন, যার অর্থ ঐসব বছরের প্রতি সেকেণ্ডে আপনি ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার ভ্রমণ করবেন- সর্বমোট দূরত্ব ২ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ৪০ কোটি মাইল বা ৪০ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শত ৩০ কোটি কিলোমিটার সমান।

আমাদের নক্ষত্র সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীর কিনারার কাছাকাছি অবস্থিত। আমাদের সমগ্র সৌর জগৎ ও এর আবর্তনকারী গ্রহগুলো এই বাক্সের মধ্যে মানানসই হতে পারে।

মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সী[১]

রাতের আকাশে আপনি যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখতে পান তা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সী নামে নক্ষত্রপুঞ্জের একটি বিশাল পরিবারের বংশ। আলোর গতিতে ভ্রমণ করলে এর একপাশ থেকে অন্য পাশ অতিক্রম করার জন্য ১০ লক্ষ বছর লাগবে। মহাবিশ্বে আনুমানিক ১০ হাজার কোটি গ্যালাক্সী আছে, যার অনেকগুলো কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত। গ্যালাক্সীগুলো গুচ্ছাকারে এবং বড় বড় গুচ্ছাকারে আসে। আমাদের গুচ্ছে প্রায় ২৪টি গ্যালাক্সী আছে এবং আমাদের বড় গুচ্ছের মধ্যে হাজার হাজার গ্যালাক্সী রয়েছে।

আপনার নামে কি একটি নক্ষত্রের নামকরণ চান?[২]

পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে আপনার নামে ১৬টি গ্যালাক্সীর নামকরণ হতে পারে। এর অর্থ কোটি কোটি নক্ষত্র আপনার নাম বহন করতে পারে!

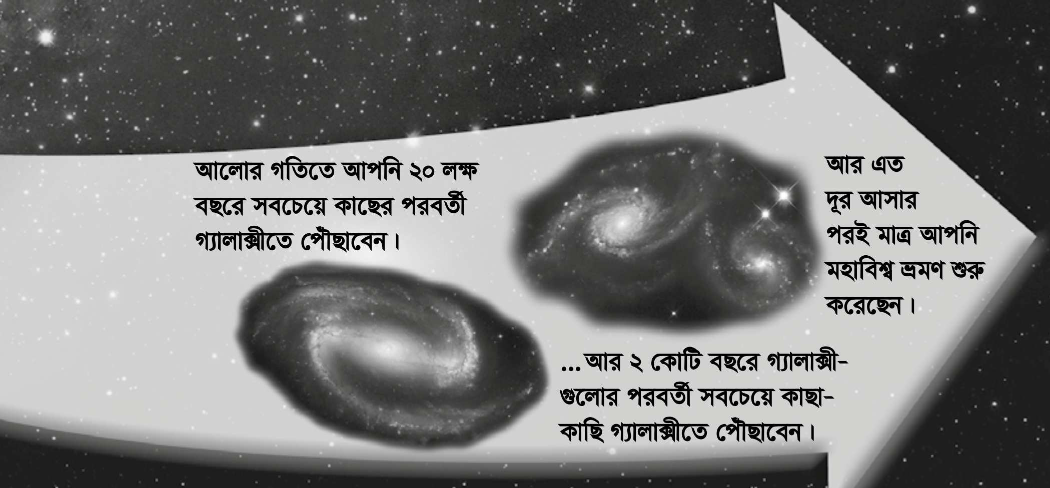

হ্যাঁ, আমাদের জন্য একজন অনন্ত আল্লাহ্‌র ধারণা বোঝাটা কঠিন। তেমনি বোঝা কঠিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাকে। উভয় ধারণাই বোঝা কষ্টকর কিন্তু দু'টোই বাস্তব। পাক-কিতাব এই বিষয়টি সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কথা বলে। আল্লাহ্‌র "অনন্ত" অস্তিত্ব তাঁর মহত্ত্বের সাথে এমন ভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, আল্লাহ্‌র কালাম এটাকে তাঁর নাম হিসাবে নির্দেশ করে।

> *...মাবুদের, অর্থাৎ যাঁর শুরু এবং শেষ নেই সেই আল্লাহ্‌র...*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:৩৩ আয়াত)*

অনেক নাম

আল্লাহ্‌র অনেকগুলো নাম বা পদবী আছে, যার প্রত্যেকটি তাঁর চরিত্র, অর্থাৎ তাঁর মহত্ত্ব সম্পর্কে কিছু একটা ঘোষণা করে। আমরা এরকম তিনটি নাম দেখব।

১। আমি আছি

> *আল্লাহ্ মূসাকে বললেন, "যিনি, 'আমি আছি' আমিই তিনি।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩:১৪ আয়াত)*

আমরা এই ভাবে উপরের কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে পারিঃ *যিনি 'আমি আছি' আমিই তিনি* অথবা *আমিই নিজে নিজেই অস্তিত্ববান*। আল্লাহ্ তাঁর নিজের শক্তি দ্বারাই অস্তিত্ববান। আমাদের বাঁচার জন্য দরকার খাদ্য, পানি, বাতাস, ঘুম, আলো এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিষ দরকার। কিন্তু আল্লাহ্‌র সেগুলোর দরকার নেই। তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। *তিনিই সেই নিজে নিজে অস্তিত্ববান*, অর্থাৎ তিনিই সেই *'আমি আছি'*।

২। মাবুদ (ইয়াহ্‌ওয়েহ্)

পাক-কিতাবে ***'আমি আছি'*** নামটি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় নি, কারণ ***'মাবুদ'*** (হিব্রু ভাষায় বলা হয় *ইয়াহ্‌ওয়েহ্*) কথাটির মধ্যে এর অর্থ নিহিত আছে। ইয়াহ্‌ওয়েহ্ আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম, যেমনটি লোকদেরকে কামাল, রহিম, সুমি, ফাতেমা প্রভৃতি নামে ডাকা হয়। কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন অনুবাদ এই মহান নামকে "মাবুদ" হিসাবে অনুবাদ করার দ্বারা সম্মান দান করেছে।

> *হে মাবুদ (ইয়াহ্‌ওয়েহ্) তোমার মত আর কেউ নেই; তুমি মহান, তুমি ক্ষমতায় শক্তিশালী।* *(নবীদের কিতাব, ইয়ারমিয়া ১০:৬ আয়াত)*

মাবুদ নামটি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনন্ত স্বঅস্তিত্বের উপর জোর দেয় না, কিন্তু এটা তাঁর পদের উপরও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর সেই পদ অন্য সবার থেকে উপরে। তিনি *প্রভুদের প্রভু*।

৩। আল্লাহ্‌তা'লা

একজন সার্বভৌম শাসনকর্তা হিসাবে আল্লাহ্‌র ভূমিকার উপর জোর দেওয়ার দ্বারা 'আল্লাহ্‌তা'লা' নামটি 'মাবুদ' নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

তারা যেন জানতে পারে যে, তোমার নাম মাবুদ, হ্যাঁ, কেবল তুমিই সারা দুনিয়ার আল্লাহ্‌তা'লা। *(জবুর শরীফ ৮৩:১৮ আয়াত)*

প্রাচীন কালে নিজেদের রাজ্যগুলোর উপর সম্রাটদের অসীম ক্ষমতা থাকত। একই ভাবে আল্লাহ্‌ হলেন এই দুনিয়াদারীর বাদশাহ্‌, মহান আল্লাহ্‌তা'লা। এমনকি 'আল্লাহ্‌' শব্দটি নিজেই সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসাবে তাঁর পদের উপর জোর দান করে। 'আল্লাহ্‌' শব্দটির অর্থ *শক্তিশালী লোক, শক্তিশালী নেতা, সর্বোচ্চজন*।

কিন্তু মাবুদ বেহেশতে তাঁর পবিত্র বাসস্থানে আছেন; তাঁর সিংহাসন সেখানেই রয়েছে। তিনি মানুষকে লক্ষ্য করেন; তাঁর চোখ তাদের যাচাই করে। *(জবুর শরীফ ১১:৪ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে দুনিয়াদারী শাসন করেন। আমরা বেহেশত সম্পর্কে বেশী কিছু জানি না, কিন্তু যতখানি জানি এটা হল অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর একটি জায়গা। আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিতভাবে এটা আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ্‌ই হলেন সর্বোচ্চ শাসনকর্তা।

আল্লাহ্‌ মাত্র একজন

'আল্লাহ্‌তা'লা' শব্দটির অর্থ হল আল্লাহ্‌ সম্পূর্ণভাবে অদ্বিতীয়। এটা তাঁর মহত্ত্বের আরেকটি দিক। তাঁর মত আর কেউই নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, অর্থাৎ তিনিই ***সার্বভৌম মাবুদ***।

আমিই আল্লাহ্‌, অন্য আর কেউ নেই; আমি ছাড়া অন্য মাবুদ নেই।
(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫:৫ আয়াত পড়ুন)

আমার আগে কোন মাবুদ তৈরী হয় নি আর আমার পরেও অন্য কোন মাবুদ থাকবেন না। *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৩:১০ আয়াত)*

কিতাবুল মোকাদ্দসে এমন কোন উঁচু-নীচু দেবতা বা মাবুদদের কথা পাওয়া যায় না, যাদের সকলের উপরে একজন সর্বোচ্চ দেবতা বা মাবুদ শাসন করছেন। নিজে নিজে অস্তিত্ববান বা সৃষ্ট এমন আর কোন দেবতা নেই।

মাবুদ... এই কথা বলছেন, "আমিই প্রথম ও আমিই শেষ; আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই।" *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৪:৬ আয়াত)*

পাক-কিতাব জোর দিয়ে বলে একজন মাত্র আল্লাহ্‌ আছেন।

মাত্র একজনই আছেন যিনি শরীয়ত দেন ও বিচার করেন। তিনিই রক্ষা করতে পারেন এবং ধ্বংস করতে পারেন... *(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ৪:১২ আয়াত)*

একজন রূহ্‌

এই বিষয়টি আলোচনা শেষ করার আগে আমাদের অন্য আরেকটি বিষয় বোঝা দরকার। পাক-কিতাব আমাদের বলে আল্লাহ্‌ অদৃশ্য, কারণ-

আল্লাহ্‌ রূহ্‌...। *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৪:২৪ আয়াত)*

একজন মৃত ব্যক্তির দাফনের কথা চিন্তা করুন। তার দেহটি কবরে আছে, কিন্তু ব্যক্তিটি কোথায়? তার রূহ্ কিন্তু কবরে থাকে না। যখন আমরা কোন একজনের দিকে তাকাই, তখন আমরা শুধুমাত্র তার "ঘর", অর্থাৎ দেহ দেখতে পাই। কিন্তু আমরা আসলে প্রকৃত মানুষটিকে দেখতে পাই না, কারণ প্রকৃত মানুষ হল তার ভিতরে থাকা রূহ্।

পাক-কিতাব বিভিন্ন উপায়ে নির্দেশ করে বলে যে, একটি পর্যায়ে মানুষের রূহ্ শুরু হয় এবং তারপরে এটা চিরদিন বেঁচে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ একেবারে ভিন্ন। তাঁর শুরুও ছিল না এবং কখনও কোন শেষও থাকবে না। তিনিই একমাত্র অনন্ত রূহ্, যিনি অনন্ত অতীত থেকে অনন্ত ভবিষ্যত পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন।

আল্লাহ্: তিনি ***রূহ্***
তিনি ***অনন্ত***
তিনিই সেই ***'আমি আছি'***, অর্থাৎ সেই নিজে নিজে অস্তিত্ববান
তিনিই সেই ***আল্লাহ্তা'লা***, সর্বময় শাসনকর্তা
তিনিই ***একমাত্র*** আল্লাহ্।

২ ফেরেশতা

কিতাবুল মোকাদ্দসের কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমরা আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি কাজের বিষয়ে দেখতে পাই। সেখানে মানুষ সৃষ্টির পূর্বে অন্যান্য রূহ্‌যুক্ত প্রাণীর উৎপত্তি দেখা যায়।

নাম সমূহ

পাক-কিতাব অনেক ভিন্ন ভিন্ন নামের দ্বারা রূহ্‌দের কথা নির্দেশ করে। এসব নামের কিছু কিছু একবচন এবং কিছু কিছু বহুবচন। আমরা প্রায়ই এসব রূহ্‌যুক্ত সত্তাদের ফেরেশতা বলি। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম তাঁদের বর্ণনা করার জন্য অনেক শব্দ ব্যবহার করে, যেমন- কারুবী, সরাফ, ফেরেশতা, প্রধান ফেরেশতা, ভোরের তারা* এবং বেহেশতের সকলে প্রভৃতি।

*পাক-কিতাবে এই 'ভোরের তারা' বলতে রাতের আকাশের তারাকে বোঝানো হয় নি।

বেহেশতের সকলেই তোমার এবাদত করে।

(নবীদের কিতাব, নহিমিয়া ৯:৬ আয়াত)

সমস্ত ফেরেশতাদের হয়ত ব্যক্তিগত নাম আছে। কিন্তু পাক-কিতাবে কেবল কয়েকজন ফেরেশতার নামের উল্লেখ আছে, যেমন- জিবরাইল এবং মিকাইল ফেরেশতা।

অদৃশ্য, অসংখ্য

আল্লাহ্ যেমন অদৃশ্য, ফেরেশতারাও তেমনি অদৃশ্য। আপনার এবং আমার মত তাদের রক্ত-মাংসের দেহ নেই। যদিও আমরা তাঁদের

> *দেখতে পাই না তবুও তাঁরা সব জায়গায় আছেন। পাক-কিতাব বলে তাঁরা সংখ্যায় হাজার হাজার।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১২:২২ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র সিংহাসনের চারদিকে থাকা ফেরেশতাদের সংখ্যা গণনার জন্য ব্যবহৃত বাগধারাটি প্রকাশ করে যে, এসব ফেরেশতাদের সংখ্যায় গণনা করা অসম্ভব।

> *পরে আমি চেয়ে দেখলাম; আর আমি সেই সিংহাসন, প্রাণী ও নেতাদের চারদিকে অনেক ফেরেশতার কণ্ঠস্বর শুনলাম। সেই ফেরেশতারা ছিলেন সংখ্যায় হাজার হাজার, কোটি কোটি।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ৫:১১ আয়াত)*

সেবাকারীগণ

আল্লাহ্‌র সেবা এবং তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁদের সেবাকারী রূহ্‌ বলে ডাকা হয়।

> *হে মাবুদের শক্তিশালী ফেরেশতারা, যারা তাঁর কথার বাধ্য থেকে তাঁর হুকুম পালন করছ, তোমরা তাঁর প্রশংসা কর। হে মাবুদের খেদমতকারী শক্তিদলগুলো যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করছ, তোমরা তাঁর প্রশংসা কর।*
> *(জবুর শরীফ ১০৩:২০,২১ আয়াত)*

> *ফেরেশতারা কি সকলেই সেবাকারী রূহ্‌ নন?।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১:১৪ আয়াত)*

ফেরেশতা শব্দটি যে গ্রীক শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে তার অর্থ *সংবাদবাহক* বা *সেবাকারী*। যেহেতু আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনিই তাঁদের মালিক এবং তিনি তাঁদেরকে যা করতে দেবেন, তা-ই তাঁদেরকে করতে হবে।

নির্মাতা-মালিক

আমাদের বর্তমান আধুনিক সমাজে 'যিনি নির্মাতা তিনি মালিকও বটে' ধারণাটির অর্থ হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে এই ধারণাটি কম বুঝা যায়। আমার মনে পড়ছে পাপুয়া নিউগিনির একটি আদিবাসী গ্রাম দেখতে যাওয়ার কথা। সেখানে আমি এই প্রশ্নটি করতামঃ *"এটা কার দাঁড়? ঐ নৌকাটা কার?"* তখন তাদের উত্তরের মধ্যে আমি মালিকের নামটা শুনতে পেতাম। মালিকটি কে এটা তারা কিভাবে জানেন, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করার পরে তারা আমার দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাত এবং তাকিয়ে উত্তরে বলত, *"যে এটা তৈরী করেছে সে-ই তো এটার মালিক।"* নির্মাতা-মালিক সম্পর্কের বিষয়টা তারা খুব ভাল বোঝে। যখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করতাম আমি কি দাঁড়টি ভেঙ্গে ফেলতে পারি, তখন তারা জোর দিয়ে বলত এটা ভাল কাজ হবে না, কেননা এতে সেই দাঁড়ের নির্মাতা-মালিকের সাথে আমার সমস্যা হবে। আমি তাদেরকে আরও একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতামঃ "আচ্ছা দাঁড়টি ভাঙ্গার অধিকার কি মালিকের আছে?" তারা মাথা নেড়ে বলত, *"তার পক্ষে তা করা সম্ভব, কারণ সে-ই তো এটা বানিয়েছে।"*

আল্লাহ্ ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন, তাই তাঁরা আল্লাহ্‌র সম্পদ। আর যেহেতু তাঁদের মালিক আল্লাহ্, তাই সেবাকারী ও সংবাদবাহক হিসাবে তাঁদের উচিত আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলা। এটা জোরপূর্বক সেবাকাজ করানো নয়। ফেরেশতাদের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌ই হলেন সবচেয়ে ভাল সৃষ্টিকর্তা মালিক।

অসাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও ক্ষমতা

আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের জন্য তিনি ফেরেশতাদের বেশী বিচার-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়েছিলেন। কিছু ফেরেশতাদের অন্য ফেরেশতাদের তুলনায় আরও বেশী সামর্থ ও ক্ষমতা ছিল। সবাইকে নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে খারাপ কোন কিছু ছিল না। আবার তাঁরা রোবটও ছিলেন না। প্রত্যেক ফেরেশতার এমন নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি ছিল, যা তাঁদেরকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান করেছিল।[৩]

একই কিন্তু ভিন্ন

> *যদিও মানুষের সাথে ফেরেশতাদের কিছু কিছু বিষয়ে মিল আছে, তবুও তাঁরা বুদ্ধি ও ক্ষমতার দিক দিয়ে মানুষের চেয়ে বড়। পাক-কিতাব বলে, "তুমি [আল্লাহ্] মানুষকে ফেরেশতার চেয়ে সামান্য নীচু করেছ"*
> *(জবুর শরীফ ৮:৫ আয়াত)*

যদিও কোন কোন দিক থেকে একই তবুও ফেরেশতারা মানুষ থেকে আলাদা। তাঁরা কখনও মরেন না।[৪] তাঁরা বিয়েও করেন না, সন্তান জন্মদানও করেন না।[৫] যদিও স্বাভাবিকভাবে তাঁরা অদৃশ্য, তবুও কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজের জন্য তাঁরা দৃশ্যমান হতে পারেন। মানুষের সাথে কথা বলার সময় তাঁরা মানুষের ভাষা ব্যবহার করেন।

অভিষিক্ত কারুবী

সবচেয়ে শক্তিশালী, বুদ্ধিমান ও সুন্দর ফেরেশতা ছিল একজন কারুবী। ল্যাটিন ভাষায় এই কারুবীকে লুসিফার[৬] নামে ডাকা হয়। এই লুসিফার নামটির অর্থ উজ্জ্বল তারা বা ভোরের সন্তান। বাংলা কিতাবুল মোকাদ্দসে ল্যাটিন ভাষার এই লুসিফার নামটি পাওয়া যায় না। নবীদের কিতাবে এই কারুবীটির বিষয়ে লেখা আছে এভাবে-

> *হে শুকতারা, ভোরের সন্তান!।* *(ইশাইয়া ১৪:১২ আয়াত)*

এই লুসিফার ছিল একজন অভিষিক্ত কারুবী। ইহুদীদের মধ্যে "*অভিষিক্তকরণ*" নামে এই প্রাচীন ও ধর্মীয় রীতি প্রচলিত ছিল। এর দ্বারা একটি বিশেষ কাজের জন্য কোন ব্যক্তি/বস্তুকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আলাদা করার জন্য তার উপর তেল ঢালা হত। এই কাজটি পবিত্র বলে গণ্য ছিল এবং এ ধরনের কাজকে হাল্কা ভাবে নেওয়া হত না।

> *রক্ষাকারী কারুবী হিসাবে তোমাকে অভিষেক করা হয়েছিল, কারণ সেইভাবেই আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছিলাম। তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র পাহাড়ে ছিলে; ...তোমার সৃষ্টির দিন থেকে তোমার চালচলনে তুমি নির্দোষ ছিলে...* *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১৪,১৫ আয়াত)*

মনে হয় লুসিফারের দায়িত্বই তাঁকে সব সময় আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত রেখেছিল। সম্ভবতঃ কোন একভাবে সে অন্য সব ফেরেশতাদের প্রতিনিধিত্ব করত। সে হয়ত তাদের স্রষ্টা-মালিকের এবাদত ও প্রশংসায় নেতৃত্ব দিত। আমরা পরবর্তীতে এই অভিষিক্ত কারুবী সম্পর্কে আরও জানব।

এবাদত

এবাদত শব্দটির অর্থ *একজন ব্যক্তির মূল্য ঘোষণা করা*। পাক-কিতাব বলে সব ফেরেশতারা আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন।

> *তুমিই সকলের প্রাণ দিয়েছ এবং বেহেশতের সকলেই তোমার এবাদত করে।* *(নবীদের কিতাব, নহিমিয়া ৯:৬ আয়াত)*

যেহেতু আল্লাহ্‌ই হলেন সার্বভৌম বাদশাহ্‌ সেহেতু সব মানুষের উচিত তাঁর মূল্য ঘোষণা করা। যেমন তুলনা করুন, যদি আমি একজন বন্ধুর কাজ নিয়ে গর্ব করি, তাহলে কেউ একজন তার যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু পাক-কিতাব বলে এই মহান আল্লাহ্‌তা'লাই সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তিনি এতটাই প্রশংসাযোগ্য যে, আমরা তাঁর প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না।

> *আমাদের মাবুদ ও আল্লাহ্‌, তুমি প্রশংসা, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ৪:১১ আয়াত)*
>
> *...তুমি মহান আর অলৌকিক চিহ্ন দেখিয়ে থাক; একমাত্র তুমিই আল্লাহ্‌।* *(জবুর শরীফ ৮৬:১০ আয়াত)*

সব ফেরেশতারা সৃষ্টি দেখছে

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সমস্ত ফেরেশতারা যখন তা দেখলেন এবং উল্লাস করলেন তখন আল্লাহ্‌ তাঁর পরবর্তী সৃষ্টি কাজে হাত দিলেন।

আইয়ুব নবীর কাছে দেওয়া আল্লাহ্‌র কথাগুলো সৃষ্টিকর্তার অতুলনীয় মহত্ত্বের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

> *"আমি দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপন করবার সময় তুমি কোথায় ছিলে? যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তবে বল। তুমি কি জান কে তার পরিমাণ ঠিক করেছে? কে তার উপর মাপের দড়ি ধরেছে? কিসের উপর দুনিয়ার থামগুলো স্থাপন করা হয়েছিল? আর তার কোণের পাথরটাই বা কে স্থাপন করেছিল? তখন তো ভোরের তারাগুলো একসাথে গান গেয়েছিল আর ফেরেশতারা সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিল।"* *(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৩৮:৪-৭ আয়াত)*

তৃতীয় অধ্যায়

১ আসমান ও জমীন

২ তা চমৎকার হয়েছে

৩ পুরুষ ও স্ত্রীলোক

১ আসমান ও জমীন

কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম কিতাবের নাম পয়দায়েশ। পয়দায়েশ অর্থ *আরম্ভ*।

> *সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ আসমান ও জমীন সৃষ্টি করলেন। দুনিয়ার উপরটা তখনও কোন বিশেষ আকার পায় নি, আর তার মধ্যে জীবন্ত কিছুই ছিল না; তার উপরে ছিল অন্ধকারে ঢাকা গভীর পানি। আল্লাহ্র রূহ্ সেই পানির উপরে চলাফেরা করছিলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'আলো হোক' আর তাতে আলো হল। তিনি দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। তিনি অন্ধকার থেকে আলোকে আলাদা করে আলোর নাম দিলেন "দিন" আর অন্ধকারের নাম দিলেন "রাত।" এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল প্রথম দিন ।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:১-৫ আয়াত)*

শূন্য থেকে

"সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্... সৃষ্টি করলেন।" সৃষ্টি করা মানে অপরিসীম ক্ষমতা দেখানো। এটা কতই না আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্ শূন্য থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন! আমরা মানুষেরা বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করি, কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন সব উপকরণ ব্যবহার করতে হয়, যেগুলোর অস্তিত্ব আগে থেকেই আছে। আমরা রং করার তেল এবং কাগজ ব্যবহার করে বিভিন্ন ছবি রং করি। ইট, বালি, সিমেন্ট, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি ব্যবহার করে আমরা ঘর তৈরী করি। কিন্তু আল্লাহ্ যখন সৃষ্টির কাজ করেছেন তখন তিনি কোন কিছুই ব্যবহার করেন নি।

১। সর্বশক্তিমান

আল্লাহ্ মহান। তিনি কোন রকম নক্‌শা, উপকরণ, কারখানা কিংবা যন্ত্রপাতি ছাড়াই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সেই ক্ষমতা আমাদের বুঝবার জ্ঞানের বাইরে। পাক-কিতাব আমাদের বলে আল্লাহ্ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, কারণ তিনি সক্ষম। তিনি মহান ও তাঁর শক্তির কোন সীমা নেই। জবুর শরীফ ১৪৭:৫ আয়াতে লেখা আছে--

> *আমাদের মালিক মহান, তাঁর কুদরত প্রচুর...।*

তিনি আসলেই *সর্বশক্তিমান*।

২। সর্বজ্ঞ

আল্লাহ্র যে শুধু ক্ষমতাই আছে তা নয়, তাঁর জ্ঞানও আছে। তিনি সবকিছুই জানেন।

আমাদের মালিক মহান... তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা নেই।
(জবুর শরীফ ১৪৭:৫ আয়াত)

আল্লাহ্ সবকিছু জানেন। আরও বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য কোন স্থপতি বা প্রকৌশলীর সাথে তাঁর পরামর্শ করার দরকার নেই। তাঁর জ্ঞান অসীম। আল্লাহ্ মহান। সৃষ্টির সময়ে তিনি অন্য কারো নীল-নক্শার অধীন ছিলেন না।

৩। একই সময়ে সব জায়গায় থাকেন

যখন মানুষ একটি জিনিষ নির্মাণ করে বা সেটিকে আকার দেয় তখন তার একটি কাজের জায়গা, যেমন- একটি ঘর বা একটি কারখানা প্রয়োজন হয়। কিন্তু সৃষ্টির কাজ করার জন্য আল্লাহ্‌র কোন কাজের জায়গা দরকার হয় নি, কারণ পাক-কিতাব আমাদের বলে মাবুদ আল্লাহ্ *একই সময়ে সব জায়গায় থাকেন।*

মাবুদ বলছেন, "আমি কি কেবল কাছেরই আল্লাহ্," "দূরের আল্লাহ্ নই? কেউ কি এমন গোপন জায়গায় লুকাতে পারে যেখানে আমি তাকে দেখতে পাব না? আমি কি আসমান ও জমীনের সব জায়গায় থাকি না?।" *(নবীদের কিতাব, ইয়ারমিয়া ২৩:২৩,২৪ আয়াত)*

উপরে বর্ণিত এই তিনটি গুণ, অর্থাৎ সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞতা এবং একই সময়ে সব জায়গায় থাকা, আলাদা আলাদা ভাবে এবং একসাথে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ্ মহান। এই তিনটি গুণের নিখুঁত সমন্বয় আছে বলেই তিনি আমাদের এই জটিল দুনিয়া সৃষ্টি করতে পেরেছেন। নবীদের কিতাবের ইয়ারমিয়া ৫১:১৫ আয়াতে লেখা আছে-

মাবুদ নিজের শক্তিতে দুনিয়া তৈরী করেছেন, তাঁর জ্ঞান দ্বারা জমীন স্থাপন করেছেন ও বুদ্ধি দ্বারা আসমান বিছিয়ে দিয়েছেন।

ফেরেশতাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের কোনটিই নেই, যদিও তাঁরা শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান। আর আমাদেরও কি এসব বৈশিষ্ট্য আছে? আমরা এই ধরনের ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে পারব না। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সহজ জিনিষ তৈরী করার জন্যও অনেক লোকের দরকার হয়।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি বিল্ডিং ঘর তৈরীর কথা কল্পনা করুন। যদি আমাদেরকে একটি ঘর তৈরী করতে হয় তাহলে এর জন্য প্রথমে একটি জমি ক্রয় করতে হবে। তারপরে উক্ত জমিতে ঘর তৈরী করা যাবে কিনা সেই জন্য মাটি পরীক্ষা কেন্দ্রে যেতে হয়। যদি সেই মাটি ঘর তৈরীর উপযুক্ত হয় তাহলে বিল্ডিংয়ের নক্শা তৈরীর জন্য একজন প্রকৌশলীর কাছে যেতে হবে। প্রকৌশলী টাকার বিনিময়ে সেই নক্শা তৈরী করে দেন। এরপর সেই নক্শা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করাতে হয়। এরপরে দরকার ঘর তৈরীর বিভিন্ন উপকরণ, যেমন- ইট, বালি, সিমেন্ট, লোহা প্রভৃতি কেনা এবং সেগুলো জমিতে নিয়ে আসা। তারপরে একজন ঠিকাদার ঠিক করতে হয়, যার অধীনে অনেক শ্রমিক দিনের

পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। এছাড়াও দরকার হয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রথমে ভিত্তি, তারপরে থাম, তারপরে দেয়াল, তারপরে ছাদ এভাবে করে উপরের দিকে উঠতে হয়। আবার মালপত্র পাহারা দেওয়া, চা-নাস্তা প্রভৃতি কাজে লোক ও অর্থ নিয়োগ করতে হয়। বিল্ডিংয়ের সব কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে উক্ত ঘরে গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন প্রভৃতি সংযোগ স্থাপন করতে হয়। ঘরে ঝালাই, রং, পাইপ ফিটিং প্রভৃতি কাজ করারও দরকার পড়ে। আবার ঘর তৈরী করতে গিয়ে যদি অর্থের অভাব পড়ে তখন আবার ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিংবা কোন ব্যাংক থেকে ঋণ করতে হয়। পরিশেষে বিল্ডিংয়ের কাজ সমাপ্ত হয়। এখন যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখা যাবে এই একটি মাত্র বিল্ডিং তৈরীর কাজে অনেক মানুষ, সময়, শ্রম, অর্থ, চিন্তা, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অনেক কিছুর দরকার হয়েছে। এর প্রত্যেকটি কাজের জন্যই প্রায় আলাদা আলাদা লোকের দরকার হয়েছে। কিন্তু সব কিছু একটি উদ্দেশ্যেই দরকার ছিল, আর সেই উদ্দেশ্য ছিল বিল্ডিং তৈরী শেষ করা। ***কেবল একজন লোক সব কাজ জানে না।***

যিনি সব কিছু জানেন সেই মহান আল্লাহ্‌র সাথে মানুষ বা ফেরেশতা, আমাদের কারোরই কোন ভাবে তুলনা করা চলে না। এই মহান আল্লাহ্‌র শূন্য থেকে সৃষ্টি করার শক্তি আছে। তিনি সব জায়গায় আছেন বিধায় তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর সৃষ্ট জিনিষ যেখানে খুশী সেখানে রাখতে পারেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই এটা করতে পারেন।

হে আল্লাহ্‌ মালিক, তুমি তোমার মহাকুদরতী ও ক্ষমতাপূর্ণ হাত দিয়ে আসমান ও জমীন তৈরী করেছ। তোমার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
(নবীদের কিতাব, ইয়ারমিয়া ৩২:১৭ আয়াত)

আল্লাহ্‌ বললেন

এই বিশাল সৃষ্টি কাজের বিবরণটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা হয়েছে। খুব অল্প কথায় আল্লাহ্‌ খুবই আশ্চর্যের খবর বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, পাক-কিতাব শুধুমাত্র কয়েকটি কথায় বর্ণনা করেছে *কিভাবে* আল্লাহ্‌ সৃষ্টির কাজ করেছেন। তিনি হাত অথবা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন নি। মাবুদ শুধু *বলেছেন,* আর এই দুনিয়াদারী এবং এর মধ্যেকার সব কিছু অস্তিত্ব লাভ করেছে।

আল্লাহ্‌ বললেন, "আলো হোক।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:৩ আয়াত)*

...আল্লাহ্‌র মুখের কথাতেই এই দুনিয়া সৃষ্ট হয়েছিল...।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১১:৩)

সত্যি কথা হল এই ধরনের সামর্থ আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করে দেয়। শুধুমাত্র একজন লোকের মুখের কথাতেই একটা বিল্ডিং তৈরী হয়ে যাবে এটা অকল্পনীয়। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ্‌ পুরো দুনিয়াদারীকেই তাঁর মুখের কথাতে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে এরকম একজন সত্যিকারের মহান আল্লাহ্‌র

কাছ থেকে একজন লোক কি আশা করতে পারে? যখন আপনি এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন আপনি নিশ্চিত ভাবে চাইবেন তিনি (আল্লাহ্) যাতে ঠিক সেরকম শক্তিশালী হন। কিতাবুল মোকাদ্দস এই সত্যটি নিশ্চিত করেছে।

> *মাবুদের কালামে আসমান তৈরী হয়েছে; তার মধ্যেকার সব কিছু তৈরী হয়েছে তাঁর মুখের শ্বাসে। ...দুনিয়ার সব লোক মাবুদকে ভয় করুক, বিশ্বের সবাই তাঁর ভয়ে কাঁপুক... কারণ তিনি বললেন আর সব কিছুর সৃষ্টি হল; তিনি হুকুম দিলেন আর সব কিছু প্রতিষ্ঠিত হল।*
>
> *(জবুর শরীফ ৩৩:৬,৮,৯ আয়াত)*

এই ভাবেই সবকিছু শুরু হয়েছিল। আল্লাহ্ বললেন আলো হোক আর আলো হল। তিনি আলোর নাম দিলেন দিন এবং অন্ধকারের নাম দিলেন রাত। পাক-কিতাব অনুসারে সৃষ্টির প্রথম দিন শেষ হল।

প্রাচীন কিন্তু নির্ভুল

শত শত বছর আগের সাধারণ বিশ্বাস মতে এই দুনিয়াটা চ্যাপ্টা। এই বিশ্বাস কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে আসে নি। পাক-কিতাব বলে এই দুনিয়া একটি গোলাকার বস্তু।

> *দুনিয়ার গোল আসমানের উপরে তিনিই সিংহাসনে বসে আছেন...।*
>
> *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪০:২২ আয়াত)*

অনেক আগে কিছু লেখক ও চিন্তাবিদ্ শিক্ষা দিয়েছেন যে, দুনিয়া একটা শক্ত ভিত্তির উপর বসে আছে বা একজন পৌরাণিক দেবতা এটাকে ধরে আছে। কিন্তু আইয়ুব নবী লিখেছেন, আল্লাহ্ *শূন্যের মধ্যে দুনিয়াকে ঝুলিয়ে রেখেছেন (নবীদের কিতাব, আইয়ুব ২৬:৭ আয়াত)*।

২০০ খ্রীষ্টাব্দে টলেমি ১০২২টি তারার তালিকা করেছিলেন। শত শত বছর ধরে লোকেরা মনে করত টলেমির সে গণনা ছিল নির্ভুল। তারপরে ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও তাঁর আবিষ্কৃত টেলিস্কোপ দিয়ে আরও অনেক বেশী তারা আবিষ্কার করেছেন। আসলে টেলিস্কোপ ছাড়া খালি চোখেই আমরা প্রায় পাঁচ হাজার তারা দেখতে পারি। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দসের পয়দায়েশ ২২:১৭ *আয়াতে বলা হয়েছে তারাদের সংখ্যা অসংখ্য।*

যদিও বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার ও ইতিহাস, ভূগোল প্রকৃতি জগতের বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনা নিশ্চিত করেছে, তবুও বিজ্ঞান কখনও যেকোন বই বা কিতাবকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রমাণ করতে পারে না। কারণ বিজ্ঞান রূহানী সত্য প্রমাণ করতে পারে না। পরবর্তীতে আমরা দেখব কিভাবে পাক-কিতাব নিজেই প্রমাণ করেছে এটা আল্লাহ্র মুখের কথা।

একই সময়ে সব জায়গায় আছেন

আমরা আল্লাহর গুণ সমূহের বিষয়ে সমভাবে বুঝতে পারি না। তিনি একই সময়ে সব জায়গায় আছেন এটা বোঝার চেয়ে তিনি *সর্বশক্তিমান* ও *সর্বজ্ঞ* কথাগুলো বোঝা আমাদের জন্য আরও সহজ। কিন্তু পাক-কালাম আমাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহ্ *সব জায়গায় আছেন*।

যখন আপনি এই ধারণাটি নিয়ে চিন্তা করবেন তখন এটা আপনাকে সত্যিই সান্ত্বনা দান করবে। উদাহরণ স্বরূপ যদি আমি আমার পরিবার থেকে দূরে কোথাও ভ্রমণে যাই, তখন আমি জানতে চাই আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন। কিন্তু একই সময়ে আমি চাই আল্লাহ্ আমার সাথেও থাকবেন। কেননা সমস্যায় পড়লে আমার সাহায্যের দরকার হয়। আর সেই সাহায্য আমার তৎক্ষণাৎ দরকার হবে। আমি চাই না *আল্লাহ্কে খোঁজ* করতে গিয়ে আমার সময় ব্যয় হোক। আবার সেই একই নিশ্চয়তা আমি আমার পরিবারের জন্যও চাই।

কিন্তু এই সত্য কথাটি ভয়ের বিষয়ও হতে পারে। কেননা যদি আমি কোন অন্যায় করি তাহলে আমার জন্য লুকানোর আর কোন জায়গা থাকবে না। খ্রীষ্ট পূর্ব ১০ম শতাব্দীতে দাউদ নবী আল্লাহ্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই কথাগুলো লিখেছিলেন।

> *তোমার পাক-রূহের কাছ থেকে আমি কোথায় যেতে পারি? তোমার সামনে থেকে আমি কোথায় পালাতে পারি? যদি আসমানে গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি; যদি কবরে আমার বিছানা পাতি, সেখানেও তুমি; যদি ভোরের পাখায় ভর করে উঠে আসি, যদি ভূমধ্যসাগরের ওপারে গিয়ে বাস করি, সেখানেও তোমার হাত আমাকে পরিচালনা করবে, তোমার ডান হাত আমাকে শক্ত করে ধরে রাখবে। যদি আমি বলি, অন্ধকার আমাকে ঢেকে ফেলবে, আর আমার চারপাশে যে আলো আছে তা অন্ধকার হয়ে যাবে, তবুও তাতে কোন লাভ হবে না; কারণ সেই অন্ধকার তো তোমার কাছে অন্ধকার নয়। রাত দিনের মতই আলোময়; তোমার কাছে অন্ধকার আর আলো দুই-ই সমান।*
> *(জবুর শরীফ ১৩৯:৭-১২ আয়াত)*

আল্লাহ্ যে *একই সময়ে সব জায়গায়* আছেন এই সত্যটির মানে এই নয় যে, *বহু আল্লাহ্* আছেন। *বহু আল্লাহ্/ঈশ্বরে* বিশ্বাস শিক্ষা দেয় সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ্ আছেন এবং সব কিছুই হল আল্লাহ্। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয় মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি থেকে আলাদা। তিনি সৃষ্টির অংশ নন। পাক-কিতাব আল্লাহ্কে একজন *সত্তা* হিসাবে বর্ণনা করে, তিনি *শুধুমাত্র একটি শক্তি* বা *অনুপ্রেরণা* দানকারী ধারণা নন।

> *তোমরা কি জান না? তোমরা কি শোন নি? মাবুদ, যিনি চিরকাল স্থায়ী আল্লাহ, যিনি দুনিয়ার শেষ সীমার সৃষ্টিকর্তা, তিনি দুর্বল হন না, ক্লান্তও হন না; তাঁর বুদ্ধির গভীরতা কেউ মাপতে পারে না। (নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪০:২৮ আয়াত)*

২ তা চমৎকার হয়েছে

আল্লাহ্‌ তাঁর সৃষ্টি কাজ শুরু করে দিলেন। সব ফেরেশতা দেখতে পেলেন আল্লাহ্‌ শুধু মুখে বললেন আর আসমান ও জমীন সৃষ্টি হল। প্রথম দিন শেষ হল। সৃষ্টির পরবর্তী পাঁচ দিনে আল্লাহ্‌ সৃষ্টি নাটকের আরও পাঁচটি দৃশ্য বা পর্ব মঞ্চায়িত করবেন।

তোমরা কি জান না? তোমরা কি শোন নি? প্রথম থেকেই কি তোমাদের সে কথা বলা হয় নি? দুনিয়া স্থাপনের সময় থেকে কি তোমরা বোঝ নি? দুনিয়ার গোল আসমানের উপরে তিনিই সিংহাসনে বসে আছেন, দুনিয়ার লোকেরা ফড়িংয়ের মত। চাঁদোয়ার মত করে তিনি আসমানকে বিছিয়ে দিয়েছেন, বাস করবার তাম্বুর মত করে তা খাটিয়ে দিয়েছেন।

(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪০:২১,২২ আয়াত)

পাক-কিতাব দুনিয়াকে একটি তাঁবুর সাথে তুলনা করেছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এটাই আমাদের বসবাসের সবচেয়ে আদর্শ স্থান। কিন্তু পৃথিবী গ্রহটি যাতে একটা উপযুক্ত বসবাসের স্থানে পরিণত হতে পারে সেজন্য অনেক বড় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার দরকার হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই ফেরেশতারা নীরবে তাকিয়ে আছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে *ফাঁকা* জায়গা সৃষ্টির সাথে সাথে মঞ্চের পর্দা উপরের দিকে উঠে গেল। ফাঁকা জায়গা? এটা আবার কি?

দ্বিতীয় দিন

আল্লাহ্‌ বললেন, "পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হোক, আর তাতে পানি দু'ভাগ হয়ে যাক।" এইভাবে আল্লাহ্‌ পানির মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করলেন এবং নীচের পানি ও উপরের পানি আলাদা করলেন। তাতে উপরের পানি ও নীচের পানি আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করেছিলেন তার নাম তিনি দিলেন "আসমান।" এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল দ্বিতীয় দিন। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:৬-৮)*

যখন আল্লাহ্‌ দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন তখন সমস্ত জায়গা পানিতে ঢাকা ছিল। দ্বিতীয় দিনে আমরা প্রথম প্রমাণ দেখতে পাই যে, সেই নতুন ভাবে সৃষ্ট দুনিয়াটি আমাদের এই বর্তমান দুনিয়ার চেয়ে ভিন্ন ছিল। পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্‌ কিছু পানি আসমানের উঁচুতে রাখলেন। যদিও কিছু কিছু ব্যাখ্যাকারী বলেন এর দ্বারা মেঘকে নির্দেশ করা হচ্ছে, কিন্তু অন্যদের চিন্তা সেই পানির বাষ্প ভূমণ্ডলকে ঢেকে ফেলেছে। সেই উপরের পানিগুলো ঢাকনাকে ইঙ্গিত করুক বা না করুক, প্রমাণ আছে সেই জলবায়ু আমাদের জানা বর্তমান জলবায়ুর অবস্থা থেকে ভিন্ন ছিল। জলবায়ু সব জায়গায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ছিল। জীবন্ত সব জিনিষ বাষ্প বা

পানিপূর্ণ বায়ুমণ্ডলে সতেজ ভাবে বেড়ে উঠে। পরবর্তীতে আমরা দেখব কোন্ সম্ভাব্য কারণে জলবায়ুর সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, পাক-কিতাব অনুসারে আল্লাহ্ একটি ফাঁকা জায়গা* সৃষ্টি করেছেন, যেটিকে আমরা বর্তমানে বায়ুমণ্ডল হিসাবে জানি।

*ফাঁকা জায়গা শব্দটির অর্থ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কিংবা গভীর মহাশূন্য।

তৃতীয় দিন

তৃতীয় দিনের শুরুতে ফাঁকা জায়গার নীচের পানি তখনও পর্যন্ত একটি বিশাল মহাসাগর ছিল, যে মহাসাগরে কোন শুকনা জমি দেখা যাচ্ছিল না। আল্লাহ্ আরেকবার বললেন--

> *"আসমানের নীচের সব পানি এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিক।" আর তা-ই হল। আল্লাহ্ সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া পানির নাম দিলেন "সমুদ্র।" আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।*
>
> *তারপর আল্লাহ্ বললেন, "ভূমির উপরে ঘাস গজিয়ে উঠুক; আর এমন সব শস্য ও শাক-সবজীর গাছ হোক যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে। ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে; আর সেই সব ফলের মধ্যে থাকবে তাদের নিজের নিজের বীজ।" আর তা-ই হল। ...আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল তৃতীয় দিন।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:৯-১৩ আয়াত)*

তৃতীয় দিনকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই শুক্না ভূমি দেখা গেল। স্পষ্ট বোঝা যায় যেন মহাসাগরের তলদেশ ডুবে গিয়েছিল, তাই সাগরের জন্য বিশাল জলাধার তৈরী হয়েছিল এবং পানির তলা থেকে ভূমি জেগে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ আমরা গাছপালার সৃষ্টি দেখতে পাই।

সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই আল্লাহ্ বাসযোগ্য হওয়ার জন্য দুনিয়াকে প্রস্তুত করছিলেন। আর আমাদের দৈহিক প্রয়োজন, যেমন- খাবার, শ্বাস নেওয়ার অক্সিজেন এবং ঘর তৈরীর কাঠ ইত্যাদি মেটানোর জন্য গাছপালা সৃষ্টি করা হল।

> *আল্লাহ্, যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, তিনিই মাবুদ; যিনি দুনিয়ার আকার দিয়েছেন ও তৈরী করেছেন, তিনিই তা স্থাপন করেছেন। তিনি বাস করবার অযোগ্য করে দুনিয়া সৃষ্টি করেন নি, বরং লোকেরা যাতে বাস করতে পারে সেইভাবেই তা সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলছেন, "আমিই আল্লাহ্, আর কেউ নয়।"* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫:১৮ আয়াত)*

চতুর্থ দিন

সৃষ্টির প্রথম দিনে আল্লাহ্ যখন বললেন ‘আলো হোক’ তখন তিনি অন্ধকারের পর্দা তুলে নিয়েছিলেন। চতুর্থ দিনে তিনি বিভিন্ন আলো দানকারী জিনিষ সৃষ্টি করলেন।

আল্লাহ্ বললেন, “আসমানের মধ্যে আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক, আর তা রাত থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক। আসমান থেকে সেগুলো দুনিয়ার উপর আলো দিক।” আর তা-ই হল।

আল্লাহ্ দু'টা বড় আলো তৈরী করলেন। তাদের মধ্যে বড়টিকে দিনের উপর রাজত্ব করবার জন্য, আর ছোটটিকে রাতের উপর রাজত্ব করবার জন্য তৈরী করলেন। তাছাড়া তিনি তারাও তৈরী করলেন। আল্লাহ্ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল চতুর্থ দিন। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:১৪-১৬,১৮খ-১৯ আয়াত)

আমাদের কাছে আশ্চর্যের মনে হয় যে, আল্লাহ্ সূর্য সৃষ্টির পূর্বেই আলো সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই একটি কথা মনে রাখতে হবে। আল্লাহ্র পক্ষে আলো দানকারী জিনিষ সৃষ্টি করা যেমন সহজ, তেমনি আলো সৃষ্টি করাও সহজ।

আমি মাবুদ; আমিই সব কিছু তৈরী করেছি। আমি একাই আসমানকে বিছিয়েছি। (নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৪:২৪ আয়াত)

ঋতু ভাগ করার জন্য তুমি চাঁদ তৈরী করেছ; তোমার সময়মত সূর্য অস্ত যায়। (জবুর শরীফ, ১০৪:১৯ আয়াত)

শৃঙ্খলা

সূর্য, চাঁদ এবং তারা এই সত্য প্রকাশ করে যে, আমাদের জ্ঞানবান নক্‌শাকারী আল্লাহ্ একজন শৃঙ্খলার আল্লাহ্। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই হল শৃঙ্খলা। একটি আণবিক ঘড়ি যেমন নির্ভুল ভাবে চলে সেভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও নির্ভুল ভাবে চলছে। বস্তুতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সময়মাফিক চলছে। আমরা অনেক বছর ধরেই আগে থেকে জোয়ার-ভাটার তালিকা লিখছি। আমরা এই প্রত্যয় নিয়ে এটা করছি যে, এসব তালিকা হবে সঠিক। যখন আমরা বিভিন্ন ভূ-উপগ্রহ প্রেরণ করি, তখন আমরা নিশ্চিত হই সেগুলোকে যেভাবে প্রোগ্রাম/ঠিক করা* হয়েছে ঠিক সেভাবে সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ে দূরবর্তী গ্রহগুলোতে গিয়ে পৌঁছাবে। পুরো পৃথিবী গ্রহটি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের নিয়মনীতির উপর নির্ভর করে। এই স্থির করে রাখা নিয়ম ছাড়া কোন কিছুই বেঁচে থাকতে পারে না।

* যেভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে ঠিক সেভাবে ৬ বছর ধরে যাত্রা করে গ্যালিলিও নামে রকেটটি আমেরিকা থেকে অবশেষে বৃহস্পতি গ্রহে গিয়ে পৌঁছেছিল।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখা যাওয়া শৃঙ্খলাই হল প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের ফল, যা সব কিছুকে পরিচালনা দান করে। আমরা বিভিন্ন বিজ্ঞানের, যেমন- জ্যোর্তিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান এবং রসায়নের, মধ্য দিয়ে ঐসব নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে পারি। আল্লাহ্ এসব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন স্থাপন করেছেন যাতে বিস্ময়কর নির্ভুলতার মধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে টিকে থাকতে পারে।

তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে। *(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ১:১৭ আয়াত)*

আমরা প্রকৃতির নিয়মের সাথে এতটাই পরিচিত যে, আমরা কখনও নিয়মবিহীন একটি পৃথিবীর চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু শুধু কল্পনা করুনঃ মাঝে মাঝে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যদি মধ্যাকর্ষণের নিয়মটি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কত বিশৃংখলা এবং মৃত্যুই না ঘটবে। একই ভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যেসব জায়গার উপর দিয়ে একই সাথে রেল গাড়ী ও বাস-ট্রাক, টেক্সী প্রভৃতি চলাচল করে সেসব জায়গার কথাও চিন্তা করুন। সেসব জায়গায় রেল গেইট ও গেইটম্যান থাকার নিয়ম আছে। যদি রেলগাড়ী আসার সময়ে গেইটম্যান উপস্থিত না থাকে এবং গেইট বন্ধ করে বাস, ট্রাক, টেক্সী প্রভৃতি যানবাহনকে আটকে না রাখে, তবে অবস্থাটা কী হবে? এই উদাহরণ থেকে আরেকটি বার আমরা দেখতে পাই কোন্‌টি কিভাবে চলবে তা বলার জন্য আমাদের দরকার বিভিন্ন নিয়ম।

দিন তোমার, রাতও তোমার; চাঁদ-তারা ও সূর্য তুমিই স্থাপন করেছ।
দুনিয়ার সব কিছুর সীমা তুমিই ঠিক করে দিয়েছ।
(জবুর শরীফ ৭৪:১৬,১৭ আয়াত)

আমরা অনেকটা নিজেদের থেকেই সম্মানের সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা একটি পাহাড়ের কিনারা ধরে খুব সাবধানে হাঁটি, কারণ আমরা জানি যদি আমরা মধ্যাকর্ষণের নিয়ম অমান্য করি তাহলে মারাত্মক পরিণতি ঘটবে। *কোন নিয়ম থাকলে তার একটি পরিণতিও থাকে।* যদি একজন লোক বোকার মত ঝুঁকি নেয় তাহলে তার পক্ষে সেই ঝুঁকির বিপদ ও পরিণতি এড়ানো সম্ভব নয়।

এসব নিয়ম, অর্থাৎ এই কাঠামো ও শৃঙ্খলা আল্লাহ্‌র স্বভাবের একটি প্রকাশ।

পঞ্চম দিন

পঞ্চম দিনে আল্লাহ্ সব রকম সামুদ্রিক প্রাণী এবং পাখী সৃষ্টি করেছেন।

তারপর আল্লাহ্ বললেন, "পানি বিভিন্ন প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর দুনিয়ার উপরে আসমানের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।" এইভাবে আল্লাহ্ সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং পানির মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি

বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জাতি অনুসারে বংশ বৃদ্ধি করবার ক্ষমতা রইল।" আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।

এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই ছিল পঞ্চম দিন।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২০-২১,২৩ আয়াত)

ষষ্ঠ দিন

ষষ্ঠ দিন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি কাজের সেরা দিন। ভূমির বিভিন্ন জীব-জন্তু সৃষ্টি করার দ্বারা আল্লাহ্‌ সেই দিনটি শুরু করেছেন।

তারপর আল্লাহ্‌ বললেন, "মাটি থেকে এমন সব প্রাণীর জন্ম হোক যাদের নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।" আর তা-ই হল।

আল্লাহ্‌ দুনিয়ার সব রকমের বন্য, গৃহপালিত এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এদের সকলেরই নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা রইল। আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৪,২৫ আয়াত)

বিভিন্ন জাত

আমরা দেখতে পেয়েছি আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল তৃতীয়, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে গাছপালা, সামুদ্রিক প্রাণী, পাখি ও জীবজন্তু নিজেদের জাত অনুযায়ী উৎপন্ন করবে। "*তাদের নিজ নিজ জাত অনুযায়ী*" কথাটির অর্থ কি? সাধারণভাবে বলা যায়, এর অর্থ হল বিড়াল থেকে বিড়ালের, কুকুর থেকে কুকুরের এবং হাতি থেকে হাতির জন্ম হবে।

আবার প্রাণীরা বিভিন্ন প্রজাতি উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু তারপরও তারা একই জাতের। উদাহরণস্বরূপ আপনি বিভিন্ন ধরনের ঘোড়ার প্রজনন করতে পারেন, কিন্তু তা করলেও প্রত্যেকটি প্রজাতিই একটি ঘোড়ার জাতই থেকে যায়। প্রজননের সাথে নতুন কিছুই যোগ করা হয় না। একই জাতের দুটির পশুর মধ্যে সংকরায়ন করে দু'টি প্রজাতি করা সম্ভবপর, কিন্তু একই জাতের একটি পশুর (যেমন- গরু) সাথে অন্য একটি জাতের (যেমন- বিড়াল) মধ্যে প্রজনন সম্ভব নয়। তাই এ থেকে আরেকটি বার আমরা দেখতে পাই শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ্‌ বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করেছেন।

নিখুঁত, ত্রুটিহীন, পবিত্র

পাক-কিতাব বারবার বলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময়...

আল্লাহ্‌ দেখলেন তা চমৎকার হয়েছে। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৫ আয়াত)

এই সংক্ষিপ্ত কথাটির অর্থ গভীর। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সব জিনিষ সত্যিই ভাল ছিল।

আল্লাহ্‌র পথে কোন খুঁত নেই; মাবুদের কালাম খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়েছে। *(জবুর শরীফ ১৮:৩০ আয়াত)*

আমরা মানুষেরা ত্রুটিহীন করে কোন কিছুই তৈরী করতে পারি না। আমরা গ্রহণযোগ্য বিভিন্ন জিনিষ তৈরী করি, কিন্তু তারপরও সেগুলোর বিভিন্ন খুঁত থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি খুঁত ছাড়াই সব কিছু সৃষ্টি করলেন।

পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্‌ নিজেই নিখুঁত, অর্থাৎ খুঁতহীন। আমরা সেই নিখুঁততাকে বর্ণনা করার জন্য *খাঁটি, পবিত্র* ও সৎ শব্দগুলো ব্যবহার করি।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।
(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৬:৩ আয়াত)

...আল্লাহ্‌ পাক্‌ তাঁর সততার জন্য পবিত্র বলে প্রকাশিত হবেন।
(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫:১৬ আয়াত)

আল্লাহ্‌র কালামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে আমরা এসব শব্দের বিষয়ে আরও গভীর ভাবে দৃষ্টি দেব। কিন্তু আমাদের জানা দরকার *খাঁটি, পবিত্র* এবং সৎ শব্দ তিনটি আল্লাহ্‌র নিখুঁত স্বভাবের বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করে।

আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ পবিত্রতাকে মাত্রার অতিরিক্ত জোর দেওয়া যেতে পারে না। আল্লাহ্‌ সৎ এই সত্যটি মানুষের কাছে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র কথাগুলো বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এটা ছবি মেলানোর ধাঁধার এমন একটা টুকরা যা আমরা বাদ দিতে পারি না। এই বইটি পড়ার সময় এই বিষয়টি মনে রাখুন।

নিখুঁততা আল্লাহ্‌র স্বভাবের মৌলিক দিক- এটা তাঁর মহত্ত্বের অন্য একটি দিক। তিনি নিখুঁত বলেই কেবল নিখুঁত সৃষ্টি বানাতে পারেন। আমরা দেখতে পাব সৃষ্টি পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে এই সৃষ্টি ছিল একেবারেই নির্দোষ! আল্লাহ্‌ বলেছিলেন, *"তা চমৎকার হয়েছে।"* এটা ছিল নিখুঁত।

আল্লাহ্‌ মানুষের বিষয় চিন্তা করেন

আল্লাহ্‌ সব গাছপালা এবং পশু-পাখি সাদা ও কালো রং দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে অনেক ভিন্ন ভিন্ন রং দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিছু কিছু রং ছিল গাঢ় এবং কিছু কিছু হাল্কা। তিনি শুধু রংই সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু এমন ভাবে চোখও সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সেসব রং দেখতে পারি।

আল্লাহ্‌ বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরী করেছেন। তিনি কেবল ভিন্ন ভিন্ন স্বাদই সৃষ্টি করেন নি, কিন্তু তিনি আমাদের জিহ্বায় স্বাদ নেয়ার জন্য স্বাদ গ্রন্থি দান করেছেন যাতে আমরা নোনতা, ঝাল, টক, তেতো এবং মিষ্টি খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারি।

আবার তিনি বিভিন্ন গন্ধ দিয়ে ফুল সৃষ্টি করেছেন। আর সেজন্য আমাদের নাকও এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের গন্ধ নিতে পারি।

আল্লাহ্ আমাদের জন্য খুব কম সংখ্যক জাতের গাছপালা সৃষ্টি করতে পারতেন। আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য শুধুমাত্র কয়েক জাতের গাছপালা দরকার ছিল। কিন্তু আমরা যাতে উপভোগ করতে পারি সেজন্য তিনি আশ্চর্য রকমের ভিন্ন ভিন্ন গাছপালা আমাদের দিয়েছেন। আল্লাহ্‌পাক আসলেই আমাদের জন্য চিন্তা করেন। পাক-কিতাব বলে-

...তিনিই ভোগের জন্য সব জিনিষ খোলা হাতে আমাদের দান করেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, ১ তীমথিয় ৬:১৭ আয়াত)

আল্লাহ্‌র যে অসংখ্য জাতের গাছপালা ও পশু-পাখি সৃষ্টির সামর্থ ও ক্ষমতা ছিল তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর প্রেমময় চিন্তা দিয়ে সেই শক্তির সমন্বয়ও করেছেন। আল্লাহ্ মহান। আমাদের চারপাশে তাঁর বিভিন্ন দয়ার কাজ দ্বারা তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

আল্লাহ্ এখনও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষকে তাঁর মহিমা দেখাতে চান। শত শত বছর ধরে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট অনেক জিনিষ দেখার ও বুঝার সামর্থ মানুষের ছিল না। কিন্তু এখন মানুষ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, পরমাণু বিভাজন, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে। আগে অজানা ছিল এমন বিভিন্ন জিনিষ আমরা দেখতে এবং সেগুলো সম্বন্ধে বুঝতে পারি। এসব নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে উঠে নি। বরং বিজ্ঞানীরা যত বেশী আবিষ্কার করছে আমরা তত বেশী মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়ছি। আমরা যত বেশী শিখি তত বেশী বুঝতে পারি আমাদের এখনও আরও অনেক কিছু শেখার আছে।

মাবুদ মহান আর সবচেয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য; কেউ তাঁর মহত্ব বুঝে উঠতে পারে না। *(জবুর শরীফ ১৪৫:৩ আয়াত)*

সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে সূর্য ডোবার আগে আল্লাহ্ আবার সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুরুষ ও স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন। তারপরেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ হল।

৩ পুরুষ ও স্ত্রীলোক

ষষ্ঠ দিন (চলমান)

জীবজন্তু সৃষ্টির সাথে সাথে ষষ্ঠ দিন আরম্ভ হল। এই সময়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের কাহিনীর দৃষ্টি অন্য দিকে মোড় নিল। এই সময় না আসা পর্যন্ত আল্লাহ্ এই পৃথিবীকে প্রস্তুত করছিলেন যাতে এটা বাসযোগ্য হতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর শেষ সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে কি করবেন তা দেখার জন্য ফেরেশতারা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা হয়ত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যের বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। কাদের জন্য আল্লাহ্ এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন? আল্লাহ্ যে খুবই আশ্চর্যজনকভাবে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তা এখন আমরা দেখব।

তারপর আল্লাহ্ বললেন, "আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে* এখন মানুষ তৈরী করি।* তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।" পরে আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।*
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৬,২৭ আয়াত)

*আপনিও হয়ত নিজেকে এই প্রশ্ন করতে পারেনঃ "*আমরা* আমাদের মত করে মানুষ তৈরী করি"- কার সঙ্গে আল্লাহ্ এই কথাটি বলছিলেন। আমরা পরবর্তীতে এই বিষয়টি অধ্যয়ন করব।

আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি

পাক-কিতাব বলে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর অর্থ এই নয় যে, আমরা মানুষেরা অবিকল *আল্লাহ্‌র মত*। আমাদের মধ্যে আমরা কেউই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ নই বা কেউই একই সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকতে পারি না। আবার কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয় না মানুষ *ছোট ছোট মাবুদ*। কিন্তু আল্লাহ্‌র বলা *আমাদের মত* কথাটির অর্থ হল মানুষ একটি আয়নার মত। আমরা আয়নায় আমাদের যে ছবি দেখি সেটা আসল বস্তু নয়। কিন্তু যে বস্তুটি আমরা দেখি তা ঠিক আসল বস্তুটির মত সাদৃশ্যপূর্ণ। যখন আমরা মানুষের দিকে তাকাই তখন আমরা আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্য সমূহের কিছু কিছু দেখতে পাই।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ মানুষকে একটা ***মন*** দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মন আছে বলেই আমরা অনুসন্ধান করতে, বুঝতে এবং সৃষ্টি করতে পারি। এগুলো হল এমন সব সামর্থ যা আল্লাহ্‌র আছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি থাকলেও আমরা সব কিছু জানি না। আসলে আমরা খুব কম জ্ঞান নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি। তাই আমাদেরকে অবশ্যই *শিখতে* হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ ***অনুভূতি*** দিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অনুভব করার ক্ষমতা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যদি একজন মানুষের *আবেগ* বা *অনুভূতি* না থাকত তাহলে সে যন্ত্রে পরিণত হত। সে সুখ, দুঃখ, রাগ বা কোমলতা অনুভব করতে পারত না। কিন্তু পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্ করুণাময়। তিনি কোমল। যখন তিনি অবিচার দেখেন তখন তিনি রেগে যান। যে দেবতার মধ্যে অনুভূতি, করুণা বা ভালবাসা নেই সে দেবতা হবে একজন ভয়ানক দেবতা। আল্লাহ্ আমাদেরকে বিভিন্ন *অনুভূতি* দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, কারণ *তাঁর* অনুভূতি আছে।

এছাড়া আল্লাহ্ মানুষকে একটা ***ইচ্ছা*** দিয়েও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের যে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে, সে বিষয়টাকে আমরা অনেক সময় মূল্য দিই না। বিভিন্ন ধরনের খাবার বা অন্যান্য জিনিষ থেকে পছন্দ করে নেয়ার ক্ষমতা মানুষের আছে। কোন কোন লোক ভাত পছন্দ করে। আবার কেউ

পছন্দ করে আলু। কেউ কেউ কমলার রস পছন্দ করে, আবার কেউবা পছন্দ করে আংগুর বা আমের রস। আমরা অনেক ধরনের খাবারের মধ্যে থেকে পছন্দ করে নিতে পারি।

মানুষ সব যন্ত্র থেকে আলাদা। মানুষ স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে পারে। আল্লাহ্ সব মানুষকে একটা ***ইচ্ছাশক্তি*** দান করেছেন যাতে মানুষ আল্লাহ্‌র পথে চলা বেছে নিতে পারে। তিনি চান মানুষ যেন বুঝতে পারে তিনি তাদের বিষয়ে চিন্তা করেন। এভাবেই মানুষ জানতে পারবে তাদের জন্য যা সবচেয়ে ভাল তা তিনি করবেন।

মানুষকে আল্লাহ্‌র মত করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সেইজন্য মানুষের বুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি আছে। পাক-কিতাব বলে-

> *...মাবুদ আল্লাহ্ মাটি দিয়ে একটি পুরুষ মানুষ তৈরী করলেন এবং তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন-বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই মানুষ একটি জীবন্ত প্রাণী হল।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:৭ আয়াত)*

'জীবন বায়ু' শব্দটির সাথে মানুষের রূহ্ সম্পর্কযুক্ত। এই *"রূহ্"* আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি প্রকাশ করে, কারণ আল্লাহ্ রূহ্। রূহ্‌দের চোখে দেখা যায় না, কারণ তাদের কোন শরীর নেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ঠিক করলেন তিনি মানুষকে হাড়-মাংসের তৈরী একটি শরীর দান করবেন যাতে এর মধ্যে মানুষের রূহ্ বাস করতে পারে। মানুষের এই *ঘর মাটির ধুলা থেকে তৈরী*। সেই শরীরের মধ্যে যদি রূহ্ না থাকত, তাহলে সেটি হত মৃত। আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে তাঁর রূহ্ ফুঁকে দিলে পর তখন মানুষ জীবন্ত হল। একমাত্র আল্লাহ্‌ই জীবন দিতে পারেন। জীবন দেয়ার ক্ষমতা কোন মানুষ বা ফেরেশতার নেই। সেইজন্য আরেকটিবার আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত সৃষ্ট জীব থেকে আলাদা। তিনি সবার এবং সব কিছুর চেয়ে মহান।

একজন সংগী

প্রথম মানুষের নাম ছিল *আদম*, যে নামের অর্থ *'মানুষ'*। *হযরত আদমকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ্‌তা'লা স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেছিলেন।*

> *পরে মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্য একজন উপযুক্ত সংগী তৈরী করব।"*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:১৮ আয়াত)*

> *সেইজন্য মাবুদ আল্লাহ্ আদমের উপর একটা গভীর ঘুম নিয়ে আসলেন, আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ একজন স্ত্রীলোক তৈরী করে তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন।*

তখন আদম এবং তাঁর স্ত্রী উলংগ থাকতেন, কিন্তু তাতে তাঁদের কোন লজ্জাবোধ ছিল না। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:২১-২২,২৫ আয়াত)*

এই আয়াতগুলো নিয়ে অনেক উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিছু কিছু লোক বিশ্বাস করে আল্লাহ্ স্ত্রীলোককে আদমের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। এ কথাটা ঠিক নয়। আল্লাহ্ সেই স্ত্রীলোকটিকে পুরুষ মানুষটির পাঁজর (বুকের পার্শ্ব অস্থি) থেকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সেই স্ত্রীলোকটি তার সঙ্গী হতে পারে। দাসী-বান্দী হওয়ার জন্য পুরুষ লোকের পায়ের গোঁড়ালী থেকে স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করা হয় নি। হযরত আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিয়েছিলেন 'হাওয়া', যে নামের অর্থ "জীবন" বা "*জন্মধাত্রী।*"

সেই নিখুঁত বাগান

এর আগে মাবুদ আল্লাহ্ পূর্ব দিকে আদন দেশে একটা বাগান করেছিলেন, আর সেখানেই তিনি তাঁর গড়া মানুষটিকে রাখলেন। সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল। তা ছাড়া বাগানের মাঝখানে তিনি 'জীবন-গাছ' ও 'নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ' নামে দু'টি গাছও জন্মিয়েছিলেন।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:৮,৯ আয়াত)

এই বাগানটি ছিল একটি মনোরম এবং নিখুঁত জায়গা। এটা যেকোন বাগান বা চিড়িয়াখানা থেকেও অনেক বেশী সুন্দর। সেই বাগানের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না আর বাগানের আবহাওয়াও ছিল ভিন্ন ধরনের। পাক-কিতাব বলে-

...কারণ তখনও মাবুদ আল্লাহ্ দুনিয়ার উপর বৃষ্টি পড়বার ব্যবস্থা করেন নি। ...তবে মাটির তলা থেকে পানি উঠত এবং তাতেই মাটি ভিজত।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:৫,৬ আয়াত)

আদন বাগান কি রকম ছিল, সে সম্পর্কে আমাদের অল্প ধারণা আছে। আমরা শুধু জানি আল্লাহ্তা'লা হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার বসবাসের জন্য একটা চমৎকার জায়গার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি চান নি তাঁদের কোন সমস্যা থাকুক। তাঁদের জন্যে সেখানে অনেক খাবার এবং প্রয়োজনীয় সব কিছুই ছিল। এটি ছিল হযরত আদম এবং বিবি হাওয়ার জন্য একটা নিখুঁত জায়গা।

সৃষ্টিকর্তা-মালিক

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া কি আদন বাগানে বাস করতে চান কিনা তা আল্লাহ্ তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেন নি। তিনি জানতেন তাঁদের জন্য কি সবচেয়ে বেশী ভাল হবে। আল্লাহ্ কারো সাথে পরামর্শ না করেই সাধারণ ভাবে কাজ করতে পারতেন, কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি মালিকও ছিলেন।

দুনিয়া ও তার মধ্যেকার সব কিছু মাবুদের; বিশ্ব ও তার মধ্যে যারা বাস করে তারাও তাঁর। *(জবুর শরীফ ২৪:১ আয়াত)*

তোমরা জেনো আল্লাহ্‌ই মাবুদ। তিনিই আমাদের তৈরী করেছেন, আমরা তাঁরই; আমরা তাঁরই বান্দা। *(জবুর শরীফ ১০০:৩ আয়াত)*

আল্লাহ্ যেমন ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের মালিক, তেমনি তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরও মালিক। যেভাবে আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে তাঁর খেদমত করার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেভাবে তিনি মানুষকে এই দুনিয়ার দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন।

মাবুদ আল্লাহ্ সেই মানুষটিকে নিয়ে আদন বাগানে রাখলেন যাতে তিনি তাতে চাষ করতে পারেন ও তার দেখাশোনা করতে পারেন।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:১৫ আয়াত)

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সাথে পরামর্শ না করেই তাঁদেরকে আদন বাগানে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, তাঁরা তাঁদের পুরো জীবনে কোন সিদ্ধান্ত বেছে নেবে না। আল্লাহ্ মানুষকে একটি ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। মানুষের বেছে নেওয়ার পর ক্ষমতা ছিল। মানুষকে অবশ্যই দু'টি সিদ্ধান্তের বিষয় চিন্তা করে সেগুলোর মধ্যে একটি বেছে নিতে হবে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া কি আল্লাহ্‌কে মহব্বত এবং বিশ্বাস করার পথ বেছে নেবেন? তা জানার জন্য আল্লাহ্ তাঁদেরকে দু'টি গাছ বিষয়ক একটি সাধারণ পছন্দ দিয়েছিলেন।

...বাগানের মাঝখানে তিনি 'জীবন-গাছ' ও 'নেকী-বদী-জ্ঞানের গাছ' নামে দু'টি গাছও জন্মিয়েছিলেন। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:৯ আয়াত)*

প্রথম গাছটির নাম ছিল *জীবন-গাছ*। যদি মানুষ সেই গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতে তাহলে সে চিরকালের জন্য বাঁচত।

আল্লাহ্ তাঁদেরকে নেকী-বদী জ্ঞানের গাছ নামে দ্বিতীয় *গাছটি দেখালেন এবং এর ফল খাওয়ার বিষয়ে একটি সতর্ক বাণী দিলেন*। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া *"নেকী"* বা *"ভাল"*-এর বিষয়ে জানতেন, কিন্তু *"বদী"* বা "খারাপ"-এর বিষয়ে জানতেন না। তাঁরা গুনাহের বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, কারণ তাঁদেরকে নিষ্পাপ করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন খারাপ স্বভাব নেই, কেবল ভাল স্বভাবই আছে। আর তাই তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যেও কেবল আল্লাহ্‌র সেই ভাল স্বভাবের জ্ঞানই ছিল। যদি তাঁরা সেই একটি গাছের ফল খান তাহলে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ভালোর পাশাপাশি খারাপটাও জানবেন।

পরে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে হুকুম দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু ***নেকী-বদী-জ্ঞানের***

> ***যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না,*** *কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:১৬,১৭ আয়াত)*

এই আলোচনার পূর্বের একটি অংশে আমরা শিখেছি যে, যদি একজন লোক আল্লাহ্‌র প্রাকৃতিক নিয়ম অমান্য করে, তাহলে তার পরিণাম থাকবে। যদি একজন লোক মধ্যাকর্ষণ সূত্র না মানে তাহলে সে নীচে পড়ে যাবে। *এই একই মূলনীতি আল্লাহ্‌র* যেকোন শরীয়ত ও হুকুমের বেলায়ও খাটে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার বেলায়ও আল্লাহ্ একটি সাধারণ নিয়ম তৈরী করেছেনঃ তোমরা সেই একটি গাছের ফলটি খাবে না। যদি তাঁরা সেই হুকুমটি না মানেন তাহলে এর পরিণাম খুবই পরিষ্কার, অর্থাৎ মানুষ মারা যাবে।

এই গাছটিই ছিল মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র পরীক্ষা। যন্ত্রের বেছে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, কিন্তু মানুষের তা আছে। সেই ফল খাওয়া বা না খাওয়া, হুকুমের বাধ্য হওয়া বা না হওয়ার ক্ষমতা মানুষের ছিল। একটি রোবট বলতে পারেঃ "আমি মেনে চলব", আর তাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে; কারণ বাধ্য হওয়ার জন্য তাকে সেভাবে সাজানো হয়েছে। তার নিজস্ব কোন পছন্দ করার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে মানুষ বলতে পারে *"আমি মেনে চলব"*, কিন্তু হুকুমদানকারীর উপর বিশ্বাস করা ও তাঁর বাধ্য হওয়ার পথ সে বেছে নিতে পারে। পছন্দ করার সামর্থ থাকাই 'মেনে চলা/বাধ্য হওয়া' শব্দটিকে অর্থ ও গভীরতা দান করে। এ থেকে বোঝা যায় পছন্দ করার ক্ষমতা একটি সম্পর্ককে খাঁটি করে তোলে।

এই একটি মাত্র সীমাবদ্ধতা হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার জীবনকে কঠিন করে তুলে নি, কারণ তাঁদের জন্য বাগানে প্রচুর ফল ছিল।

> *সেখানকার মাটিতে তিনি এমন সব গাছ জন্মিয়েছিলেন যা দেখতেও সুন্দর এবং যার ফল খেতেও ভাল।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:৯ আয়াত)*

তাঁর গৌরবের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল

হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা দান করে আল্লাহ্ আশা করেন নি তাঁরা পালিয়ে যাবে এবং নিজেদের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ বাধ্য হয়ে তাঁর গৌরব প্রকাশ ও তাঁকে সম্মান দান করতে পারে।

> *"আমাদের মাবুদ ও আল্লাহ্, তুমি প্রশংসা, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ; আর তোমারই ইচ্ছাতে সেই সব সৃষ্ট হয়েছে এবং টিকে আছে।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ৪:১১ আয়াত)*

একটি ছেলে তার বাবার বাধ্য হয়ে বাবাকে সম্মান করে। একই কথা আল্লাহ্ ও মানুষের বেলায়ও খাটে। মানুষ যখন আল্লাহ্‌র বাধ্য হয় তখন সে আল্লাহ্‌কে সম্মানিত করে। আল্লাহ্ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। তাই তিনি মানুষের কাছ থেকে পূর্ণ সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আমরা যখন আল্লাহ্‌কে সম্মান দিই তখন আমরা অনেক রহমত পাই। পাক-কিতাব বলে মানুষ যখন তার জন্য আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বাধ্য হয় তখন সে মহা সুখ ও পূর্ণতা পায়। এই কথা হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার ব্যাপারেও সত্য ছিল।

> *আল্লাহ্ তাঁদের দোয়া করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতায় পূর্ণ হও, আর নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে দুনিয়া ভরে তোলো এবং দুনিয়াকে নিজেদের শাসনের অধীনে আন। এছাড়া তোমরা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী এবং মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রত্যেকটি প্রাণীর উপরে রাজত্ব কর।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৮ আয়াত)*

মানুষ-আল্লাহ্‌র বন্ধু

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার মঙ্গলের সমস্ত দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁদের প্রত্যেকটি প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন।

> *এর পরে আল্লাহ্ বললেন, "দেখ, দুনিয়ার উপরে প্রত্যেকটি শস্য ও শাক-সব্জী যার নিজের বীজ আছে এবং প্রত্যেকটি গাছ যার ফলের মধ্যে তার বীজ রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের দিলাম। এগুলোই তোমাদের খাবার হবে। দুনিয়ার উপরের প্রত্যেকটি পশু, আসমানের প্রত্যেকটি পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রত্যেকটি প্রাণী, এক কথায় সমস্ত প্রাণীর খাবারের জন্য আমি সমস্ত শস্য ও শাক-সব্জী দিলাম।" আর তা-ই হল।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৯,৩০ আয়াত)*

সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় যে আল্লাহ্ ও হযরত আদম ঘুরে বেড়াতেন, পাক-কিতাব আমাদের সে সম্বন্ধে বলে। এই ধারণাটি বুঝা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে সামনা-সামনি আলাপ-আলোচনা করতে পেরেছিলেন, তা বুঝা আমাদের যুক্তির বাইরে। স্পষ্টতঃ কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু পাক-কিতাব স্পষ্ট করে বলে আল্লাহ্‌তা'লা দূরের বা নাগালের বাইরের কোন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাছের বন্ধু। যেহেতু হযরত আদম ও বিবি হাওয়া গুনাহ্ করেন নি, তাই তাঁরা আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে থাকতে পেরেছিলেন। *শুধুমাত্র নিখুঁত[১] লোকেরাই নিখুঁত আল্লাহ্‌র সাথে বাস করতে পারে।*

একটি আদর্শ পরিবারে মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদেরকে মহব্বতপূর্ণ যত্ন দান করেন। ছেলেমেয়েরা যখন মা-বাবার বাধ্য থাকে তখন তারা মা-বাবাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা দান করে। আল্লাহ্‌র সাথে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ারও ঠিক একই

সম্পর্ক ছিল। হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার প্রয়োজনীয় সব কিছুই আল্লাহ্ যুগিয়ে দিয়েছিলেন। আর তাঁরাও খুশী মনে আল্লাহ্‌কে মহব্বত করেছিলেন এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর উপর নির্ভর করে তাঁরা তাঁকে সম্মান দান করেছিলেন। এই মহব্বতপূর্ণ সম্পর্ক উপভোগ করার জন্য আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে

> *আল্লাহ্ তাঁর নিজের তৈরী সব কিছু দেখলেন। সেগুলো **সত্যিই খুব চমৎকার** হয়েছিল। এইভাবে সন্ধ্যাও গেল সকালও গেল, আর সেটাই হল ষষ্ঠ দিন।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:৩১ আয়াত)*

আমরা মানুষেরা প্রায়ই প্রবল উৎসাহ সহকারে একটি নতুন কাজ হাতে নিই। কিন্তু একটা সময় পরে আমরা আমাদের উৎসাহ হারিয়ে ফেলি এবং বড় কাজটা শেষ করি না। কিন্তু আল্লাহ্ সেরকম নন, তিনি সব সময় তাঁর উদ্দেশ্য সমূহ পরিপূর্ণ করেন। আমরা আমাদের মন পরিবর্তন করতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্ কখনও তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন না।

> *...কিন্তু মাবুদের পরিকল্পনা চিরকাল টিকে থাকে; তাঁর মন যুগ যুগ ধরেই স্থির থাকে।* *(জবুর শরীফ ৩৩:১১ আয়াত)*

এখন সৃষ্টির কাজ শেষ হয়েছে। পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্ সপ্তম দিনে কোন কাজ করলেন না। তিনি যে ক্লান্ত ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির কাজ পূর্ণ ও শেষ হয়েছে। আর তাঁর এখন সময় হয়েছে সৃষ্ট জিনিষ উপভোগ করার।

এই দুনিয়াটা কি এমনি এমনি গড়ে উঠেছে?

কিতাবুল মোকাদ্দসে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নেই। যেসব লোক বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তা'লা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যেসব লোক বিশ্বাস করে এই দুনিয়া এমনি এমনি গড়ে উঠেছে, তাদের মতের মধ্যে অনেক বিরোধ আছে। অনেক লোক মনে করে যে, এটা ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা মত-বিরোধ। এই মত-বিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা করাটা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ধারণা আলোচনা করব।

বিবর্তনবাদ এই দুনিয়ার মূল উৎসের বিষয়ে একটি ধারণামাত্র; এটা বিজ্ঞান নয়। আবার সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসও ধর্ম নয়। ১৮৫৯ সালে চার্লস্ ডারউইন নামে একজন দার্শনিক বিবর্তনবাদ সম্পর্কে প্রথম বারের মত তাঁর ধারণা লিখেছিলেন। তারপর থেকেই ডারউইনের মৌলিক ধারণার জায়গায় বিভিন্ন নতুন নতুন ধারণা এসেছে, যেমন- নব্য-ডারউইনবাদ এবং মাঝে

মাঝে বাধাগ্রস্থ হওয়া ভারসাম্যবাদ। এই তত্ত্ব সমূহ একটি অন্যটি থেকে খুবই ভিন্ন। দুনিয়ার মৌলিক উৎসকে প্রমাণ করে এমন কোন সর্বজনসম্মত তথ্য নেই। বিবর্তনবাদ নিয়ে ভাল ভাবে অধ্যয়নকারী অনেকে বলেন যে, এটা কোন খাঁটি বিজ্ঞান নয়, বরং ধর্মের মত এটিও এক ধরনের বিশ্বাস। বিভিন্ন ধর্ম কিছু জিনিষকে "সত্য" বলে গ্রহণ করে। সেভাবে বিবর্তনবাদ পূর্ব থেকে ধরে নেয় আল্লাহ্ বলতে কেউ নেই এবং এই দুনিয়াদারী অনেক বিশাল সময় ধরে এমনি এমনি সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনবাদীরা নির্দেশ করে যে, একটি জীবকোষ থেকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকোষে পরিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রাণীসত্তা থেকে মানুষে বিবর্তিত হয়। এটা পদার্থ জ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলো লংঘন করে।

অন্যদিকে সৃষ্টিবাদকে পুরোটা ধর্মের মত বলাও সঠিক নয়। অনেক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে একজন বুদ্ধিমান নির্মাতা এই জটিল[২] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নক্‌শা করেছেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যবহার করে তাঁরা দেখান পৃথিবীটা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, কারণ তার সবগুলো অংশ একই সাথে কাজ করে। একটি অংশ আরেকটিকে ছাড়া ঠিকমত কাজ করতে পারে না। জটিলতা ও ক্রম শুধু তখনই থাকতে পারে যদি এই দুনিয়াদারী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিকল্পিত হয়। প্রকৃতি বিশৃঙ্খল ভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। যদিও এসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞানী কিতাবুল মোকাদ্দস বিশ্বাস করে না, কিন্তু অনেকে পাক-কিতাবের কথাগুলো সম্মান করে এবং সেই কথাগুলোকে পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে। বিজ্ঞানীদের এই দলের নাম হল সৃষ্টিবাদ বিজ্ঞানী।

সম্ভবতঃ ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে (পরিশিষ্ট দেখুন)। তার বেশীর ভাগ লেখা সাধারণ লোক পড়তে ও বুঝতে পারে। আপনি কোন্‌টি বিশ্বাস করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে এই দু'টা বিষয় সম্পর্কে আরও বেশী করে অধ্যয়ন করুন।

কিছু কিছু লোক ডাইনোসরদের বিষয় শুনে চিন্তা করে কিতাবুল মোকাদ্দসে লেখা সৃষ্টির বিবরণ কেমন করে সত্য হতে পারে। কারণ আজকাল তো ডাইনোসর দেখা যায় না। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ অন্যান্য জীবজন্তুর সাথে সাথে ডাইনোসরদেরও সৃষ্টি করেছেন। (মানুষ ও ডাইনোসর যে একই সময়ে বেঁচে ছিল তার সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে)।

আবার অন্যেরা এই দুনিয়ার বয়স সম্বন্ধে ধারণা করে। অনেক বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে এই দুনিয়া খুবই পুরাতন, কিন্তু পাক-কিতাব অনেক দীর্ঘ সময়ের কথা উল্লেখ করে না। অনেক বিজ্ঞানীরা সময় নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। কিছু কিছু পদ্ধতি জ্যোতির্বিদ্যা, সূর্য, পৃথিবী এবং জীববিদ্যা বিষয়ক। সময় নির্ণয়ের এই পদ্ধতিগুলো দুনিয়াদারীর বয়স নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এই

পদ্ধতিগুলো বিভিন্ন গাণিতিক হিসাব ব্যবহার করে, কিন্তু এগুলো সব অনুমান নির্ভর। কোন্ ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে, তার উপরেই দুনিয়ার বয়স নির্ধারিত হয়। দুনিয়ার বয়স সম্বন্ধে যেসব ধারণা প্রচলিত আছে, সে অনুযায়ী দুনিয়ার বয়স কয়েক হাজার থেকে কোটি বছর পর্যন্ত। জীববিদ্যা বিষয়ক বিবর্তনের জন্য ডারউইনের মতবাদ ৪০ কোটি বছরের উল্লেখ করে। বর্তমানে সাধারণ হিসাব হল এই দুনিয়াদারীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। "কোন্ হিসাবটি সঠিক?"

দুনিয়ার বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের বিবরণের সাথে মিলে এমন একটি যৌক্তিক উত্তর কি আছে? আমরা যদি সূক্ষ্ম ভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করি, তাহলে বুঝতে পারব আল্লাহ্ একটি পরিপক্ক দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদমকে আল্লাহ্‌তা'লা যেদিন সৃষ্টি করেছিলেন সেদিনই তাঁর পক্ষে উঁচু উঁচু গাছের মাঝখানে হাঁটা, বিশাল আকৃতির প্রাণীদেরকে দেখে বিস্মিত হওয়া এবং রাতের আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকানো সম্ভবপর ছিল। হয়ত হযরত আদম চিন্তা করেছিলেন "এই জায়গাটি এখানে অনেকদিন থেকে আছে," কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে বলতেন এই দুনিয়ার বয়স ৬ দিন। আল্লাহ্ এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন যেন এটি সম্পূর্ণভাবে সচল হয়। বিজ্ঞানীরা অতীতের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেন এই দুনিয়ার বয়স কত হতে পারে। আল্লাহ্‌র পাক-কালাম একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা উৎস সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্‌ই ছিলেন সেই সাক্ষী।

তাই যখন আল্লাহ্ বলেছেন তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন তখন আমরা তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারি। অনেক শতাব্দী আগে একজন বাদশাহ্ দুনিয়ার দিকে তাকিয়েছিলেন এবং এর মধ্যে তাঁর নিজের অবস্থানের কথা চিন্তা করেছেন এই ভাবে-

> *"আমি যখন তোমার হাতে গড়া আসমানের দিকে তাকাই আর সেখানে তোমার স্থাপিত চাঁদ আর তারাগুলো দেখি, তখন ভাবি, মানুষ এমন কি যে, তুমি তার বিষয় চিন্তা কর? মানুষের সন্তানই বা কি যে, তুমি তার দিকে মনোযোগ দাও?*
>
> *তুমি মানুষকে ফেরেশতার চেয়ে সামান্য নীচু করেছ; রাজতাজ হিসাবে তুমি তাকে দান করেছ গৌরব ও সম্মান।*
>
> *তোমার হাতের সৃষ্টির শাসনভার তুমি তারই হাতে দিয়েছ আর তার পায়ের তলায় রেখেছ এই সব- গরু ও ভেড়ার পাল আর দুনিয়ার অন্য সব পশু, আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখী, সাগরের মাছ আর সাগর-পথে ঘুরে বেড়ানো অন্য সব প্রাণী। হে মাবুদ, আমাদের মালিক, সারা দুনিয়ায় রয়েছে তোমার মহিমার প্রকাশ।"* *(জবুর শরীফ ৮:৩-৯ আয়াত)*

চতুর্থ অধ্যায়

১ শয়তান

২ আল্লাহ্ কি একথা বলেছেন?

৩ তুমি কোথায়?

৪ মৃত্যু

১ শয়তান

সৃষ্টির সব দিনগুলোর কাজ নিয়ে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি সৃষ্টিই চমৎকার হয়েছে। সব কিছুই ছিল ঠিকঠাক। কোন রোগ-শোক, অমিল এবং মৃত্যু ছিল না। মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যে একটি অনন্য সম্পর্ক, সহভাগিতা ও বন্ধুত্ব ছিল। আদন বাগানটি ছিল বসবাসের একটি নিখুঁত জায়গা। সবকিছুই ছিল অত্যন্ত সুন্দর।

কিন্তু আজ আমাদের জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-শোক আছে। মনে হচ্ছে যেন দেহ ও মনের দিক থেকে শক্তিশালী লোকেরাই কেবল সফল হতে পারে। বর্তমানে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ এবং মানুষে মানুষে মত-বিরোধ দেখা যায়। অনেক ক্ষমতাবান নেতারা খারাপ কাজ করছে। পরিবার, সরকার এবং সমাজে এটা অহরহ ঘটেছে। সব কিছুই মনে হয় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রাণী ও মানব জগতের সর্বস্তরে অবিরাম যুদ্ধ চলছে। এখন এই দুনিয়াটা *খুব একটা চমৎকার জায়গা নয়*। আদন বাগানে ঠিক কি ঘটেছিল?

লুসিফার

আদন বাগানে দ্বন্দ্ব এবং সমস্যা শুরু হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব ও সমস্যার জন্মদাতা ছিল শয়তান। শয়তান কিন্তু আগে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা একজন ফেরেশতা (কারুবী) ছিল। এই ফেরেশতাটির ল্যাটিন ভাষার নাম লুসিফার। এই লুসিফার (বিস্তারিত দেখুন, ২২ পৃষ্ঠায় "অভিষিক্ত কারুবী") সম্বন্ধে পাক-কিতাব বলে-

> *তুমি আল্লাহ্‌র বাগান আদনে ছিলে। সব রকম দামী দামী পাথর ... দিয়ে তুমি সাজানো ছিলে।* *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১৩)*

আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ফেরেশতাদের মধ্যে লুসিফার ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তার নামের অর্থ *ভোরের তারা*। *কারুবী* নামক ফেরেশতা দলের মধ্যে সেও ছিল একজন। যেহেতু আল্লাহ্ তাঁকে বিশেষ নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাই সে আল্লাহ্‌র সামনে যেতে পারত।

> *রক্ষাকারী কারুবী হিসাবে তোমাকে অভিষেক করা হয়েছিল, ... তুমি আল্লাহ্‌র পবিত্র পাহাড়ে ছিলে।* *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১৪)*

লুসিফার ছিল নিখুঁত। তাঁর অবিশ্বাস্য রকমের সৌন্দর্য ও বিশেষ জ্ঞান ছিল।

> *তোমার সৃষ্টির দিন থেকে তোমার চালচলনে তুমি নির্দোষ ছিলে।*
> *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১৫ আয়াত)*

> *তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিখুঁত, জ্ঞানে পূর্ণ এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।*
> *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১২ আয়াত)*

যদিও লুসিফার ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাবান ফেরেশতা, কিন্তু সে যে অন্য ফেরেশতাদের উপরে শাসন করত, সেরকম কোন নির্দেশ কিতাবুল মোকাদ্দসে পাওয়া যায় না।

অহংকার

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে না ঠিক কখন লুসিফারের পতন হয়েছিল বা ঠিক কখন থেকে সে শয়তান নামে পরিচিত হয়েছিল। অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে এই ঘটনাটি সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে পরে কোন এক সময়ে ঘটেছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে লুসিফারের মনে অহংকার এসেছিল। কেবল তা-ই নয়, অহংকারের সাথে সাথে তার মনে উচ্চাকাংখাও এসেছিল। সে নিজের সৌন্দর্য ও শক্তির বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং এই চিন্তাই তার উপর *আধিপত্য বিস্তার করেছিল*। লুসিফার পাঁচভাবে তার উচ্চাকাংখা প্রকাশ করেছিল। এ থেকে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে, লুসিফার আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছিল।

> *হে শুকতারা, ভোরের সন্তান, ... তুমি মনে মনে বলেছ,*
> *"আমি বেহেশতে উঠব,*
> *আল্লাহ্‌র তারাগুলোর উপরে আমার সিংহাসন উঠাব;*
> *যেখানে দেবতারা জমায়েত হয় উত্তর দিকের সেই পাহাড়ের উপরে*
> *আমি সিংহাসনে বসব।*
> *আমি মেঘের মাথার উপরে উঠব;*
> *আমি আল্লাহ্‌তা'লার সমান হব।"* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ১৪:১২-১৪ আয়াত)*

লুসিফার শুধু যে বেহেশতের নিয়ন্ত্রণ নিতে চেয়েছিল তা-ই নয়, সে মহান আল্লাহ্‌র সমানও হতে চেয়েছিল। লুসিফার নিজেকে আল্লাহ্‌র জায়গায় দাঁড় করানোর জন্য বিদ্রোহ করতে সংকল্পবদ্ধ ছিল। ভেবেছিল এভাবেই সে সব ফেরেশতাদের উপরে নেতা হবে। সে নিজেই পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর বাদশাহী করবে। লুসিফারের অন্তর অহংকার ও উচ্চাকাংখায় ভরে উঠেছিল।

লুসিফারের একমাত্র সমস্যা ছিল আল্লাহ্‌ তার সমস্ত চিন্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন। মনে করে দেখুন আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ তিনি সব জানেন। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে তিনি অহংকার ঘৃণা করেন। মাবুদের ঘৃণিত গুনাহ্‌গুলোর মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম।

> *মাবুদ কমপক্ষে সাতটা জিনিষ ঘৃণা করেন যেগুলো তাঁর কাছে জঘন্য:*
> *গর্বে ভরা চোখের চাহনি ...।* *(নবীদের কিতাব, মেসাল ৬:১৬,১৭ আয়াত)*

লুসিফার ইচ্ছাকৃত ভাবে তার জন্য করা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিল। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ্‌ ফেরেশতাদেরকে রোবট হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। প্রত্যেক ফেরেশতারই একটি ইচ্ছাশক্তি ছিল। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌র সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর এটা ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদেরকে স্বেচ্ছায় সমর্পণের প্রকাশ। কিন্তু লুসিফার শুধুমাত্র ফেরেশতা হয়ে থাকাতেই সন্তুষ্ট ছিল না। সে আরও বড় উচ্চ পদ পেতে চেয়েছিল।

তার অহংকারের দরুন সে বিদ্রোহ করেছিল। আল্লাহ্‌র দেওয়া পদ সে ঘৃণা করেছিল। এছাড়া সে আল্লাহ্‌কেও ঘৃণা করেছিল। 'ঘৃণা' শব্দের অভিধানিক অর্থ হলঃ কাউকে অবজ্ঞা করা; *কাউকে নীচু চোখে দেখা; কাউকে তীব্রভাবে অপছন্দ করা*। আল্লাহ্ লুসিফারের সেই মনোভাবের নাম দিয়েছিলেন ***গুনাহ্***।

বিচার

আল্লাহ্ নিখুঁত, তাই তিনি লুসিফারের গুনাহ্ সহ্য করতে পারেন নি। *যেখানে নিখুঁততা থাকে, সেখানে কোন খুঁত থাকতে পারে না*। আমরা বার বার এই সত্যটি দেখতে পাব যখন নবীদের লেখা কিতাবগুলোর দিকে এগিয়ে যাব।

ন্যায়বান *(নিখুঁত)* আল্লাহ্‌র অন্যায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ্‌র *পবিত্রতায়* গুনাহের কোন স্থান নেই।

নিষ্পাপ আল্লাহ্ তাঁর উপস্থিতিতে গুনাহ্ সহ্য করতে পারেন না।

এটা এমন একটা বাস্তবতা, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোন প্রাকৃতিক নিয়মের মত অনড়। আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে লুসিফারের গুনাহের জবাব দিয়েছিলেন। তিনি তাকে বেহেশত থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

> *তোমার অনেক ব্যবসার দরুন তুমি জুলুমবাজ হয়ে গুনাহ্ করলে। কাজেই আল্লাহ্‌র পাহাড় থেকে আমি তোমাকে নাপাক অবস্থায় তাড়িয়ে দিলাম। হে রক্ষাকারী কারুবী, আমি তোমাকে আগুনের মত ঝক্‌মক করা পাথরের মধ্য থেকে সরিয়ে দিলাম। তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার দিল অহংকারে ভরে উঠেছে আর তোমার জাঁকজমকের জন্য তুমি তোমার জ্ঞানকে নষ্ট করেছ। তাই আমি তোমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।* *(নবীদের কিতাব, হেজকিল ২৮:১৬,১৭ আয়াত)*

লুসিফার বিনা যুদ্ধে বেহেশত ত্যাগ করে নি। এখনও সে খুব শক্তিশালী। আরও অনেক ফেরেশতা তার দলে যোগ দিয়েছিল। কি ঘটেছিল সে বিষয়ে পাক-কিতাব আমাদের কিছু বর্ণনা দান করে। আমি নীচে দেওয়া কিতাবের অংশটির মধ্যেকার কয়েকটি শব্দ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করেছি যাতে আপনি এটা আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেন। আয়াতগুলো পড়তে পড়তে আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক কি ঘটেছিল এবং কে সেই কাজটি করেছিল।

> *তারপর আসমানে আর একটা চিহ্ন দেখা গেল- আগুনের মত লাল একটা বিরাট **দানব। ...তার লেজ** দিয়ে সে আসমানের তিন ভাগের এক ভাগ তারা টেনে এনে দুনিয়াতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ...*
>
> *তারপর বেহেশতে যুদ্ধ হল। মিখাইল ও তাঁর অধীন ফেরেশতারা সেই **দানব** ও তাঁর দূতদের সংগে যুদ্ধ করলেন। **সেই দানব** জয়ী হতে পারল না এবং বেহেশতে তাদের আর থাকতেও দেওয়া হল*

না। তখন সেই বিরাট দানবকে ও তাঁর সংগে তার দূতদের দুনিয়াতে ফেলে দেওয়া হল। এই দানব হল সেই পুরানো সাপ যাকে ইবলিস বা শয়তান বলা হয়। সে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ভুল পথে নিয়ে যায়।[১]

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ১২:৩-৯ আয়াত)

ইবলিস, শয়তান এবং খারাপ রূহেরা

পাক-কিতাবের আয়াত সমূহ নির্দেশ করে বলে, এক-তৃতীয়াংশ ফেরেশতা লুসিফারের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। লুসিফার *ইবলিস* বা *শয়তান* নামে পরিচিত হল। যেভাবে আল্লাহ্‌র নাম তাঁর গুণসমূহ বর্ণনা করে, একই ভাবে লুসিফারের নাম তার চরিত্র প্রকাশ করে। শয়তান নামের অর্থ হল *প্রতিপক্ষ* বা *শত্রু*। ইবলিস শব্দের অর্থ *মিথ্যা অভিযোগকারী বা নিন্দাকারী*। তাকে অনুসরণকারী ফেরেশতাদের এখন বলা হয় *খারাপ রূহ্‌*।

আগুনের হ্রদ

ইবলিস ও তার দুষ্ট সঙ্গীদের বেহেশত থেকে বের করে দেওয়াটা ছিল সেই বিদ্রোহী রূহ্‌দের জন্য আল্লাহ্‌র বিচারের প্রথম পর্যায় মাত্র। চূড়ান্ত পর্যায়ের শাস্তিতে এই ইবলিস ও তার সঙ্গী ফেরেশতাদের চিরকালের আগুনে ফেলে দেওয়া হবে। এই আগুন তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৫:৪১ আয়াত)*।

এই স্থানটি হল *আগুনের হ্রদ*। কিছু কিছু শিল্পী শয়তান এবং তার সহযোগী খারাপ রূহ্‌দের ছবি চিত্রিত করেছে। তাদের ছবিগুলোতে তারা দেখিয়েছে শয়তান ও তার সঙ্গী খারাপ রূহেরা কোমর সমান গভীর আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন দুর্দশাময় ও খারাপ কাজের পরিকল্পনা করছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম আমাদের বলে শয়তানকে বেহেশত থেকে বিতাড়িত করা হলেও এখনও আগুনের হ্রদে ফেলে দেওয়া হয় নি। ভবিষ্যতে শয়তান ও তার সঙ্গী খারাপ রূহ্‌দেরকে শাস্তির স্থানে বেঁধে রাখা হবে। পাক-কিতাব ভবিষ্যতের এসব ঘটনা সম্পর্কে বলে-

যে তাদের ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল সেই ইবলিসকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে ফেলে দেওয়া হল। ...সেখানে তারা চিরকাল ধরে দিনরাত যন্ত্রণা ভোগ করবে। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২০:১০ আয়াত)*

যদিও শয়তান ও তার সহযোগী দুষ্ট ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌ তাঁর সামনে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তারপরও তাদের প্রচুর ক্ষমতা ও জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল। এখন তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তারা সব ধরনের ভাল বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করবে। শয়তান আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ধ্বংস করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্‌ যেসব বিষয়কে মূল্য দেন, সে সেসব বিষয়ের বিরোধী। সে হবে খুব খারাপ একজন শত্রু।

২ আল্লাহ্ কি একথা বলেছেন?

হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্ তাঁদেরকে একটি বাগানে রাখলেন। কিন্তু তিনি কেবল তাঁদেরকে সেখানে রেখেই গেলেন না। পাক-কিতাব বলে তিনি তাঁদেরকে দেখতে বাগানে আসতেন এবং নিয়মিত তাঁদের সংগে কথা বলতেন। তাঁরা আল্লাহ্কে তাঁদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করতেন এবং আল্লাহ্ তাঁদের প্রতিটি প্রয়োজনের যত্ন নিতেন।

প্রতারক

কিন্তু এরপর শয়তান চুপিচুপি সেই বাগানে ঢুকল। সে ঢাকঢোল পিটিয়ে বা কাউকে জানিয়ে শুনিয়ে সেখানে ঢুকে নি। এ বিষয়ে শয়তান ছিল খুবই চতুর ও ধূর্ত। পাক-কিতাব বলে সে হল মহাপ্রতারক, অর্থাৎ সেই ইবলিস। সে *কখনও সম্পূর্ণ* সত্য বলে না।

> *ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ তার মধ্যে সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮:৪৪ আয়াত)*

'মিথ্যা' শব্দটির মূল গ্রীক শব্দ *Pseudos (সুডোস)*। এর অর্থ জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা চিন্তা করা। *মেকি* বা ছল বুঝাতে আমরা এই ইংরেজী শব্দটি ব্যবহার করি।

কয়েক বছর আগে আমি একটি জনপ্রিয় খবরের ম্যাগাজিনে শয়তান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। সেই প্রবন্ধে শয়তানকে ছবির মত করে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বর্ণনা অনুযায়ী শয়তানের শরীর লাল রংয়ের, মাথায় দু'টি শিং, পিছনে একটি লেজ আছে। সম্পূর্ণ বর্ণনাটি ছিল খুবই ভয়ংকর। কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে এই ধরনের ছবি বিভ্রান্তিকর। পাক-কিতাব বলে-

> *শয়তানও নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেশতা বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ১১:১৪ আয়াত)*

সে যতদূর সম্ভব তার সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং নিজেকে আল্লাহ্র চেহারায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কল্পনা করুন শয়তান উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একজন ফেরেশতা বা সবচেয়ে সুন্দর ধর্মীয় পোষাকে সজ্জিত একজন মিষ্টভাষী লোক। সে ধর্ম ভালবাসে। সে সত্যের অনুকরণ করে কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে একজন ছদ্মবেশী ভণ্ড। সে ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলে।

অনেকে শয়তানকে একটি রূপকথার গল্প মনে করে। শয়তান চায় আপনি এরকমটি চিন্তা করেন *যাতে সে গোপনে তার প্রতারণার* কাজ করতে পারে।

প্রতারণা

এভাবে সব ধরনের চালাকী সহকারে শয়তান আদন বাগানে পৌঁছাল। সে সাপের রূপ ধরে প্রবেশ করেছিল। এটা আশ্চর্য কিছু না, কারণ পাক-কিতাবে খারাপ রূহ্‌দের বিষয়ে এমন কয়েকটি ঘটনার কথা লেখা আছে যেখানে তারা মানুষ ও পশুদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা এসব মানুষ ও পশুর মধ্য দিয়ে কথা বলেছে বা তাদেরকে দিয়ে অস্বাভাবিক ভাবে কাজ করিয়েছে। একই ভাবে ইবলিস শয়তান সাপের বেশে বিবি হাওয়ার সংগে কথা বলেছিল।

> *মাবুদ আল্লাহ্‌র তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, "আল্লাহ্ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১ আয়াত)*

সাপকে কথা বলতে শোনায় বিবি হাওয়ার মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় নি। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া বাগানে প্রতিদিনই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নতুন ও আকর্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। হয়ত বিবি হাওয়া চিন্তা করেছিলেন এই সাপটি ঐসব নতুন সৃষ্টির অন্যতম।

সন্দেহ

যা-ই হোক, মজার বিষয় হল বিবি হাওয়াকে করা শয়তানের প্রথম প্রশ্নটি ছিল আল্লাহ্ সম্বন্ধে। এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সে বিবি হাওয়ার মনে এমন একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যা তিনি আগে কখনও চিন্তা করেন নি। শয়তানের সেই ধারণাটা ছিল- *"সৃষ্ট জিনিষ স্রষ্টাকে প্রশ্ন করতে পারে।"* হয়ত শয়তান বিবি হাওয়াকে খুবই নরম স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, *"আচ্ছা, আল্লাহ্ কি সত্যিই বলেছেন...? আমি বলতে চাচ্ছি- সত্যিই কি আল্লাহ্ একথা বলেছেন?"*

আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিবি হাওয়ার কাছে এই কথা বলে শয়তান ইঙ্গিত দিয়েছিল যে, মানুষ খুবই সরল-মনা, তাই সে আল্লাহ্‌র কথাকে আক্ষরিক ভাবে গ্রহণ করে। শয়তানের সেই ইঙ্গিতটা ছিল অনেকটা এরকম-

> *"সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে ভাল কিছু একটা গোপন করেছেন। তোমরা কি তার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পার? হয়ত আল্লাহ্ নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেন, তিনি সেরকম ভাল এবং প্রেমময় নন।"*

এর মধ্যে একটা আভাস ছিল। অর্থাৎ শয়তান ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিল আল্লাহ্ একেবারে সৎ নন। সে এমন ভান করেছিল যেন মানুষের বিষয়ে আল্লাহ্‌র চেয়ে সে আরও বেশী চিন্তিত। সে আল্লাহ্‌র ভাল স্বভাব অনুকরণ করেছিল এবং সত্যকে বিকৃত করেছিল। সে আল্লাহ্‌র কালামকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। যখন সে আল্লাহ্‌র কালাম সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিল তখন সে মানুষের মনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের বীজ বুনেছিল।

এছাড়াও আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে শয়তান অতিরিক্ত কথা বলেছিল। *সব গাছের* ফল খেতে আল্লাহ্‌ নিষেধ করেন নি। আল্লাহ্‌ কেবল মাত্র *একটি গাছের* কথাই উল্লেখ করেছেন। আর সেই গাছটি ছিল নেকী-বদী জ্ঞানের গাছ। কিন্তু এই বাড়িয়ে বলার ফলে মানুষের মনে শয়তানের প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়েছিল।

> *জবাবে স্ত্রীলোকটি (সাপকে) বললেন, "বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ বলেছেন, 'তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে'।"* (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২,৩ আয়াত)

বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র পক্ষ অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছিলেন, যদিও আল্লাহ্‌র কাউকে তাঁর পক্ষে টানার দরকার হয় না। তিনি নিজের প্রবল আগ্রহে আল্লাহ্‌র হুকুমের সাথে কিছুটা যোগ করেছিলেন। আল্লাহ্‌ পুরুষ মানুষটিকে সেই গাছের ফল *না খেতে* বলেছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও বলেন নি তাঁরা সেই ফল ছুঁতে পারবে না। যখন কেউ আল্লাহ্‌র কথার সাথে কোন কিছু *যোগ* করে, তখন সে সব সময় এর থেকে কোন কিছু *বাদও দেয়*। শয়তান মাঝে মাঝে আল্লাহ্‌র কালাম থেকে বিভিন্ন ধারণা যোগ বা বিয়োগ করতে লোকদেরকে প্রলোভিত করে। বিবি হাওয়া যে কথাটা যোগ করেছিল, তা খুবই সামান্য। কিন্তু তা ব্যবহার করে শয়তানের সুযোগ হয়েছিল আল্লাহ্‌কে আক্রমণ করার।

অস্বীকার

> *তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, "কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ্‌ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা* ***আল্লাহ্‌র মতই হয়ে উঠবে****।"* (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৪,৫ আয়াত)

শয়তান শুধু আল্লাহ্‌র কালাম সম্বন্ধে বিবি হাওয়ার মনে সন্দেহ ঢুকিয়েই সন্তুষ্ট রইল না, সে পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র কথা অস্বীকার করেছিল। সে অনায়াসে আল্লাহ্‌কে একজন মিথ্যাবাদী বলে ডেকেছিল। সে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, কারণ আল্লাহ্‌র ভয় ছিল হযরত আদম ও বিবি হাওয়া খুব বেশী জ্ঞানের অধিকারী হয়ে উঠবে। সে চালাকী করে সত্যের সঙ্গে ভুল মিশিয়েছিল। এটা সত্য ছিল যে, হযরত আদম ও বিবি হাওয়া ভাল ও খারাপের মধ্যেকার পার্থক্য জানতে পারবে। কিন্তু এই কথাটা মিথ্যা ছিল যে, তাঁরা সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌র মত হয়ে যাবে। শয়তান ইচ্ছা করে জেনেশুনে মিথ্যা বলেছিল।

অবাধ্যতা

> *স্ত্রীলোকটি যখন বুঝলেন যে, গাছটার ফলগুলো খেতে ভাল হবে এবং সেগুলো দেখতেও সুন্দর আর তা ছাড়া জ্ঞান লাভের জন্য কামনা*

করবার মতও বটে, তখন তিনি কয়েকটা ফল পেড়ে নিয়ে খেলেন। সেই ফল তিনি তাঁর স্বামীকেও দিলেন এবং তাঁর স্বামীও তা খেলেন।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৬ আয়াত)

শয়তান সফল হয়েছিল। হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে দুর্দশার মধ্যে ফেলে সে বাগান থেকে চলে গিয়েছিল। তাঁদের কাজের পরিণতি তাঁদেরকেই ভাবতে হয়েছিল। শয়তান কখনও তার কাজের পরিণামের বিষয়ে ভাবে না। পাক-কিতাব বলে-

তোমাদের শত্রু ইবলিস গর্জনকারী সিংহের মত করে কাকে খেয়ে ফেলবে তার খোঁজ করে বেড়াচ্ছে। (ইঞ্জিল শরীফ, ১ পিতর ৫:৮ আয়াত)

ইবলিস শয়তানও সিংহের মত করে মাংস খেয়ে কেবলই হাড়-গোড় ফেলে যায়। সে ভান করে যেন সে অনেক আনন্দ, মজা ও ভাল সময় দান করবে। কিন্তু এসব বিষয় স্থায়ী নয়। আসলে সে শুধুমাত্র সমস্যা, সংশয়, মনোব্যথা এবং ধ্বংস সৃষ্টি করে। সে কখনও ভাল কোন কিছু দেয় না।

কিছু লোক আল্লাহ্‌র হুকুমের অবাধ্য হওয়ার জন্য বিবি হাওয়ার উপর দোষ দেয়। কিন্তু যখন শয়তান ও বিবি হাওয়ার মধ্যে কথাবার্তা চলছিল তখন হযরত আদম মনে হয় বিবি হাওয়ার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বিবি হাওয়াকে সেই ফল খাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারতেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁর নিজেরও সেই ফল খাওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু তাঁরা উভয়েই সেই ফল খেয়েছিল।

ছেলেমেয়েরা যেভাবে মাঝে মাঝে তাদের মা-বাবার অবাধ্য হয়, সেভাবে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছিলেন। মা তার ছেলেমেয়েদের বলেন, "রাস্তায় খেলাধূলা কোরো না। খেললে ব্যথা পাবে, এমনকি গাড়ীর নীচে পড়ে মারাও যেতে পার।" কিন্তু অবাধ্য ছেলেমেয়েরা চিন্তা করে তারা তাদের মায়ের চেয়ে আরও বেশী জানে। নিরাপত্তার বিষয়ে তাদের মা-বাবাদের জ্ঞানের উপর তারা নির্ভর করে না। তারা তাদের মা-বাবার কর্তৃত্বকে অসম্মান করে। একই ভাবে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করে তাঁরা চিন্তা করেছিল তাঁরা আরও ভাল একটি পথ বেছে নিচ্ছিল। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের স্রষ্টার উপর আস্থা রাখে নি। আল্লাহ্ যে সত্য কথা বলছিলেন সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না।

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া শয়তানকে একজন মিথ্যাবাদী বলতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে শয়তানের বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। পাক-কিতাব বলে-

যে কেউ দুনিয়ার বন্ধু হতে ইচ্ছা করে সে নিজেকে আল্লাহ্‌র শত্রু করে তোলে। (ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ৪:৪ আয়াত)*

*দুনিয়া মানে যা কিছুর উপর শয়তানের প্রভাব আছে।

একজন লোক কাকে এবং কি বেছে নেয় তার একটি পরিণাম আছে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং শয়তানকে বিশ্বাস করাটা বেছে নিয়েছিলেন। একটি নিষিদ্ধ দুনিয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তাঁরা একটি নিখুঁত দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

একটি ভেঙ্গে-যাওয়া সম্পর্ক

যেকোন পছন্দেরই একটা পরিণতি আছে। আমরা আগে পড়েছি *শরীয়ত অমান্য করলে তার ফলও ভোগ করতে হবে।* পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় গুনাহের দরুন আমাদেরকে অনেক ক্ষতির শিকার হতে হয়। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া নিজেদের ইচ্ছাতেই শয়তানের মিথ্যা কথার বাধ্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার ফলে আল্লাহ্‌ ও মানুষের সাথে সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিখুঁত আল্লাহ্‌ মিশ্র বিশ্বস্ততাকে অনুমতি দেন না। তিনি চান না কেউ তাঁর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখুক, আবার একই সময়ে আংশিকভাবে বেঈমানী করুক। যদি সম্পর্কের মধ্যে কোন বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কোন সম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না। তখন বন্ধুত্ব ভেঙ্গে যায়।

> *"এইজন্য আল্লাহ্‌ মানুষকে তার দিলের কামনা-বাসনা অনুসারে জঘন্য কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। ...*
>
> *আল্লাহ্‌র সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের (শয়তানের) পূজা করেছে।"* [২]
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ১:২৪,২৫ আয়াত)*

ডুমুর পাতা

> *এতে তখনই তাঁদের দু'জনের চোখ খুলে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা উলংগ অবস্থায় আছেন।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৭ আয়াত)*

সেই গাছের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া বুঝতে পারলেন ভীষণ খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। এই প্রথম বারের মত তাঁদের মধ্যে দোষ ও লজ্জাপূর্ণ অস্বস্তিকর অনুভূতি আসল। পাক-কিতাব বলে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। এই প্রথম বারের মত তাঁরা জানতে পারলেন তাঁরা উলঙ্গ। তাঁরা সাহায্যের জন্য চারদিকে তাকালেন।

> *তখন তাঁরা কতগুলো ডুমুরের পাতা একসংগে জুড়ে নিয়ে নিজেদের জন্য খাটো ঘাগ্‌রা তৈরী করে নিলেন।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৭ আয়াত)*

সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যদি তাঁরা তাঁদের বাইরের *চেহারায়* পরিবর্তন আনেন, তাহলে আল্লাহ্‌ কখনও তাঁদের *অন্তরের* মনোভাবের পরিবর্তন বুঝতে পারবেন না। তাঁরা কেবল বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাবেন এবং ভান করবেন যেন সব কিছুই ঠিক আছে। এটা ছিল নিজেদের অন্যায় ঢাকা দেওয়ার বিষয়ে মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা।

সেই ডুমুর পাতা দিয়ে নিজেদের ঢাকবার চেষ্টার মধ্যে কেবল একটি মাত্র সমস্যা ছিল। সেই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। যদিও হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার বাইরের চেহারায় পরিবর্তন ছিল, তাঁদের ভিতরের চেহারাটা নিখুঁত ছিল না। দোষবোধ তাঁদের মনকে অস্থির করে তুলেছিল। তাঁরা দোষী হয়েই থাকলেন।

যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা মাবুদ আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাঁদের পড়তে না হয়।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৮ আয়াত)

কেবলমাত্র দোষী লোকেরাই দৌড়ে পালায় এবং নিজেদেরকে লুকায়। আপনি একজন বন্ধু থেকে লুকাবেন না। এতে করে আল্লাহ্‌ ও মানুষের মধ্যে একটি বাধা বিরাজ করল। তাদের মধ্যেকার বন্ধুত্ব/সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

খারাপ রূহ্‌, জ্বীন ও যাদু-টোনা কি?

সারা দুনিয়া জুড়ে লোকেরা খারাপ রূহের (যেমন- ভূত-প্রেত, পেত্নী, ইত্যাদি) শক্তির উপর জয়ী হওয়া বা নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করেছে। এজন্য কিছু লোক তাবিজ-কবজ পরে। কিছু লোক তাদের ঘর বন্ধ করে। কিছু লোক পড়া পানি খায়। কেউ কেউ বৈদ্যের কাছে যায়। আবার কেউবা আল্লাহ্‌র নাম নেয় অথবা ঘরে ঢোকার বা গাড়ীতে উঠার আগে দোয়া-দরূদ পড়ে, কারণ তারা বিশ্বাস করে হয়ত তাদের ঘরে, গাড়ীতে বা তাদের শরীরে ভূত-প্রেতের আছর আছে। কেউ কেউ "রক্ষাকারী রূহ্‌দের" উদ্দেশ্যে কোরবানী দেয় যাতে খারাপ রূহেরা তাদের ছেড়ে চলে যায়।

এসব ধারণা আল্লাহ্‌ থেকে নয়, কিন্তু মানুষ থেকে এসেছে। পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় শয়তান এবং তার সঙ্গী খারাপ রূহেরা (পাক-কিতাবে এদের ভূত বলা হয়েছে) কয়েক ধরনের কেরামতী কাজ করতে পারে। খারাপ রূহেরা শক্তিশালী হলেও তারা সর্বশক্তিমান নয়। যদি আল্লাহ্‌র উপর আমাদের ঈমান থাকে এবং আমরা তাঁর কথা মেনে চলি তাহলে খারাপ রূহ্‌দের বিষয়ে আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আল্লাহ্‌তা'লা খারাপ রূহ্‌দের চেয়ে আরও অসীম শক্তিশালী।

"মাবুদই শক্ত কেল্লার মত; আল্লাহভক্ত লোক সেখানে দৌড়ে গিয়ে রক্ষা পায়।" *(নবীদের কিতাব, মেসাল ১৮:১০ আয়াত)*

"প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরই দেওয়া মহা শক্তিতে শক্তিমান হও। এছাড়া ঈমানের ঢালও তুলে নাও; সেই ঢাল দিয়ে তোমরা ইবলিসের সব জ্বলন্ত তীর নিভিয়ে ফেলতে পারবে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ৬:১০,১৬ আয়াত)

আল্লাহ্ কি বাড়াবাড়ি করছেন?

কেউ হয়ত বলতে পারে, "তাদের গুনাহ্ একেবারেই সামান্য! খুবই ছোট!" এটা সত্য। আল্লাহ্ মানুষের পথের মধ্যে একটি বড় বাধা রাখেন নি। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া অনেক গাছের ফল খেতে পারতেন। আল্লাহ্ শুধু একটি ছোট পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এই পরীক্ষাটি থেকে বোঝা যায় মানুষ অন্যান্য সৃষ্ট প্রাণী থেকে আলাদা, কারণ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল।

ধরুন, একটি যুবতী মেয়ে একজন দয়ালু মানুষকে বিয়ে করার পরিকল্পনা করছে। মেয়েটি চিন্তা করল সেই মানুষটিই এই দুনিয়ার সবচেয়ে দয়ালু মানুষ। মানুষটি তার প্রতি বিভিন্নভাবে ভালবাসা দেখিয়েছিল, যেমন- সে তার জন্য বিশেষ বিশেষ কাজ করত, যখন সে দুঃখ পেত তখন সান্ত্বনা দিত, সুখের সময়ে তার সাথে হাসত এবং তাকে বলত সে তাকে ভালবাসে। তারপরে একদিন মেয়েটি দেখতে পেল মানুষটির কোন ইচ্ছাশক্তি নেই। সে একটা রোবট আর তাকে বানানোই হয়েছে *দয়ালু* হওয়ার জন্য। আসলে এটা কতই না হতাশার বিষয়! এটাকে খুবই কৃত্রিম, অর্থহীনও অনুভূতিশূন্য মনে হবে। আর আসলে এটা তা-ই।

আল্লাহ্ মানুষকে একটি সহজ-সরল পছন্দ দান করেছিলেন। কিন্তু এই পছন্দটি একটি বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল। মানুষের এই-

খাওয়া	বা	না খাওয়া
বাধ্য হওয়া	বা	অবাধ্য হওয়া
ভালবাসা	বা	ভাল না বাসার এই পছন্দই মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করেছে

আসলে এই পছন্দ করার ক্ষমতা অন্য কোন সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে নেই। মানুষ রোবট ছিল না। আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়ার পথ বেছে নেওয়ার দ্বারা মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা ও সম্মান দেখানো সম্ভব ছিল।

যদিও সেই পরীক্ষাটিকে সামান্য মনে হয়েছিল, কিন্তু এমনকি ছোট বিষয়ে আল্লাহ্‌র কথা অমান্য করাটাও মারাত্মক ভুল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্ নিখুঁত, পবিত্র ও ন্যায়বান। তিনি গুনাহ্ সহ্য করতে পারেন না। আর অবাধ্যতা মানে গুনাহ্।

৩ তুমি কোথায়?

শয়তান হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সাথে প্রতারণা করে এই চিন্তা করিয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র সমান হতে পারবে। সে নিজেও আল্লাহ্‌র মত মহান হতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ মানুষকে নিজের সহজাত প্রবৃত্তি বা ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি। মানুষের উচিত ছিল শুধু আল্লাহ্‌র কথামত চলা। আর আল্লাহ্ বলেছিলেন...

"কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:১৭ আয়াত)

তাঁরা সেই গাছের ফল খেয়েছিলেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সবকিছু বদলে গিয়েছিল। আল্লাহ্ ঠিক যেভাবে বলেছেন সেভাবে এটা ঘটেছিল। আল্লাহ্‌র মুখের কথা পরিবর্তন হয় নি। আল্লাহ্‌র কথার কখনও পরিবর্তন হয় না।

যখন সন্ধ্যার বাতাস বইতে শুরু করল তখন তাঁরা মাবুদ আল্লাহ্‌র গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে তাঁদের পড়তে না হয়।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৮ আয়াত)

যখন হযরত আদম ও বিবি হাওয়া গাছপালার পেছনে লুকিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র আসার শব্দ শুনেছিলেন তখন তাঁরা কি চিন্তা করছিলেন, সে বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসে কিছু লেখা নেই। যখন আপনি ছোটবেলায় আপনার মা-বাবার অনুপস্থিতিতে অন্যায় কিছু একটা করতেন, আর তারপর তাঁদেরকে ফিরে আসতে দেখতে পেতেন, তখন আপনার কেমন লাগত? আপনারও হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার মতই একই অবস্থা হত। তাঁরা যে কেবল অবাধ্যই হয়েছিলেন তা নয়, তাঁরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কথাকে অমান্য করেছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন তাঁদের এই কাজের জন্য তাঁদের সৃষ্টিকর্তা-মালিক ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কি বলবেন ও কি করবেন?

মাবুদ আল্লাহ্ আদমকে ডেকে বললেন, "তুমি কোথায়?।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:৯ আয়াত)

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া তাঁদের লুকানোর জায়গা থেকে মাথা বের করেছিলেন। তাঁদের চোখে-মুখে নিষ্পাপতার ছাপ নিয়ে যেন তাঁরা বলেছিলেন, "ও, আপনি কি আমাদের খোঁজ করছেন?" হযরত আদম কথা বলে উঠেছিলেন-

"বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১০ আয়াত)*

হযরত আদম কথাটি বললেন বটে, কিন্তু তিনি ভুল করলেন। তিনি যে আগে

কখনও ভয় অনুভব করেন নি, সেই সত্য কথাটি তিনি এড়িয়ে গেলেন। এছাড়াও উলংগতার জন্য তাঁর মনে কখনও বিরক্ত আসে নি। তারপরে আল্লাহ্ বললেন-

"তুমি যে উলংগ সেই কথা কে তোমাকে বলল? যে গাছের ফল খেতে আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তা কি তুমি খেয়েছ?।"
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১১ আয়াত)

প্রশ্ন আর প্রশ্ন!

হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে আল্লাহ্ কেন এসব প্রশ্ন করেছিলেন? সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ কি জানতেন না *কোথায়* তাঁরা লুকিয়ে ছিলেন? তিনি কি জানতেন না তাঁরা *কেন* নিজেদেরকে উলংগ মনে করছিলেন? সত্যি কথা হল এই- সেই বাগানে ঠিক কি ঘটেছে তা আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু তিনি এসব প্রশ্ন করেছিলেন যাতে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া সঠিক ভাবে বুঝতে পারেন তাঁরা ঠিক কি করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্র কথা অমান্য করেছিলেন। *তাঁরা আল্লাহ্র পরিবর্তে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন!*

কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়নের সময় আমরা দেখতে পাব আল্লাহ্ অনেকবার মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন যাতে মানুষ আরও পরিষ্কার ভাবে বিভিন্ন বিষয় বুঝতে পারে।

আল্লাহ্র দোষ

এছাড়াও হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যাতে নিজেদের গুনাহ্ নিজেরাই স্বীকার করতে পারে সেজন্য আল্লাহ্র প্রশ্নগুলো একটি সুযোগ করে দিয়েছিল।

আদম বললেন, "যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি।"
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১২ আয়াত)

হযরত আদম স্বীকার করেছেন তিনি ফলটি খেয়েছেন, কিন্তু *"যে স্ত্রীলোককে* তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ" বলে তিনি বিবি হাওয়ার উপর দোষ চাপিয়েছিলেন। এর থেকে বুঝা যায় হযরত আদম মনে করেছিলেন তিনি সেই ঘটনার শিকার। এছাড়াও তিনি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন যে, এটা পুরোটা আল্লাহ্র দোষ। কেননা যদি আল্লাহ্ স্ত্রীলোককে সৃষ্টি না করতেন তবে সেই স্ত্রীলোক তাকে সেই ফল দিতেন না, আর তিনিও তা খেতেন না। এইভাবে হযরত আদম তাঁর গুনাহের জন্য আল্লাহ্র উপর দোষ চাপিয়েছিলেন!

তখন মাবুদ আল্লাহ্ সেই স্ত্রীলোককে বললেন, "তুমি এ কি করেছ?" স্ত্রীলোকটি বললেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেইজন্য আমি তা খেয়েছি।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১৩ আয়াত)*

আবার বিবি হাওয়া দোষ দিলেন সাপকে। তিনি মনে মনে ভাবলেন এটা ছিল

সাপেরই দোষ। আর হ্যাঁ, আল্লাহ্‌ যদি সেই সাপকে সৃষ্টি না করতেন... তাহলে তিনিও গুনাহ্‌ করতেন না।

সত্য বিষয় হল হযরত আদম ও বিবি হাওয়া নিজেদের ইচ্ছাতেই গুনাহ্‌ করার পথ বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু একই সময়ে তাঁরা আবার নিজেদের গুনাহ্‌ স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা স্বীকার করেন নি তাঁরা দোষী।

তাঁরা বলেছিলেন	তাঁদের যা বলা উচিত ছিল
হযরত আদমঃ *"যে স্ত্রীলোককে তুমি আমার সংগিনী হিসাবে দিয়েছ সে-ই আমাকে ঐ গাছের ফল দিয়েছে আর আমি তা খেয়েছি।"*	"হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছি। তুমি আমাকে একটি গাছের ফল না খাওয়ার জন্য পরিষ্কার ভাবে যে হুকুম দিয়েছিলে, আমি তা অমান্য করেছি। আমি গুনাহ্‌ করেছি। দয়া করে আমায় মাফ কোরো।"
বিবি হাওয়াঃ *স্ত্রীলোকটি বললেন, "ঐ সাপ আমাকে ছলনা করে ভুলিয়েছে আর সেই জন্য আমি তা খেয়েছি।"*	"মাবুদ আল্লাহ্‌। তোমার হুকুম অমান্য করে আমিও গুনাহ্‌ করেছি। দয়া করে আমাকে বলে দাও কিভাবে আমি আবার তোমার সাথে আমার পুরনো সম্পর্ক ফিরে পেতে পারি।"
১। মন-মানসিকতায় ঘটনার শিকার ২। অন্যদের দোষ দেওয়া	১। নিজেদের কাজগুলোর দায়ী হওয়া ২। পুনর্মিলনের জন্য আল্লাহ্‌র সমাধানের পথ খোঁজ করা

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া ভুল কাজ *করেছিলেন*। আর এখন তাঁরা ভুল *বললেন*। নিজেদের দোষ ও লজ্জার অনুভূতির দরুন তাঁদের উচিত ছিল আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের গুনাহ্‌ স্বীকার করা। তা না করে তাঁরা আবার গুনাহ্‌ করলেন, কারণ তাঁরা নিজেদের অবাধ্যতার দায় গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে ধ্বংস করে ফেলেন নি। যদি সেই সময় আমরা বিচারক হতাম তাহলে আমরা তাঁদের উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিতাম। যদিও তাঁরা রহমত পাওয়ার অযোগ্য ছিলেন, তারপরও আল্লাহ্‌ তাঁদেরকে সীমাহীন রহমত দেখিয়েছিলেন।

একটি ওয়াদা

হযরত আদম এবং বিবি হাওয়ার প্রথম গুনাহের দরুন ভবিষ্যতের সব প্রজন্মের উপর চরম পরিণতি ছিল। তাঁরা ছিলেন সব মানুষের প্রতিনিধি। তাঁদের গুনাহ্‌ শাস্তি বয়ে এনেছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ মহব্বতপূর্বক একটি ওয়াদাও দান করেছিলেন।

> *তখন মাবুদ আল্লাহ্‌ সেই সাপকে বললেন, "তোমার এই কাজের জন্য... আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও*

স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব। সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১৪,১৫ আয়াত)*

আসুন আমরা এই আয়াতগুলো আরও ভালভাবে পরীক্ষা করি। স্ত্রীলোকেরা এবং সাপেরা যে একে অন্যকে ঘৃণা করবে, আল্লাহ্ আসলে তা বলছিলেন না। আসলে এই ওয়াদার মধ্যে দুটি অংশ ছিলঃ

১। *আল্লাহ্ শয়তান ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং শয়তানের বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করবেন।*

২। *স্ত্রীলোকের বংশের একজন শয়তানের মাথা পিষে দেবে আর শয়তান তাঁর পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।*

মাবুদ আল্লাহ্ বলছিলেন ভবিষ্যতে তিনি মানুষকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবেন। ভবিষ্যতে একজন স্ত্রীলোকের গর্ভে একটি ছেলে শিশু জন্মগ্রহণ করবে। সে শয়তানের মাথা *পিষে* দেবে। সেই আঘাতটি হবে মারাত্মক জখম। আবার শয়তানও সেই ছেলেকে আঘাত করবে, কিন্তু সেটি হবে শুধুমাত্র পায়ের গোঁড়ালীতে *ছোবল* এবং সাময়িক জখম, যা ভাল হয়ে যাবে।

বিবি হাওয়ার সেই ভবিষ্যত বংশধরের বিষয়ে করা অনেকগুলো *ওয়াদার* মধ্যে এটাই সর্বপ্রথম ওয়াদা। এই ছেলেটি সেই ওয়াদা-করা মুক্তিদাতা হিসাবে পরিচিত হবেন, কারণ আল্লাহ্ তাঁকে একটি বিশেষ কাজের ভার দেবেন। তিনি মানবজাতিকে গুনাহের পরিণতি ও শয়তানের শক্তির হাত থেকে মুক্ত করবেন। হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাছে অবশ্যই এটা একটা বড় *সুসংবাদ* ছিল।

যেসব উপাধি আল্লাহ্‌র চরিত্র প্রকাশ করে, একজন *মুক্তিদাতার* বিষয়ে এই ওয়াদা সেসব উপাধির তালিকার সাথে আরেকটি নাম যোগ করেছিল। তিনি নাজাতদাতা হিসাবে পরিচিত হবেন।

"আমি ছাড়া আর মাবুদ নেই; আমি ন্যায়বান আল্লাহ্, আমি উদ্ধারকর্তা। আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। হে দুনিয়ার সব শেষ সীমাগুলো, আমার দিকে ফেরো এবং উদ্ধার পাও, কারণ আমিই আল্লাহ্, আর কেউ মাবুদ নেই।" *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫:২১,২২ আয়াত)*

একটি বদদোয়া

আমরা আগেই দেখেছি যে, সব সময়ই গুনাহের একটি পরিণতি থাকে। যখন একজন লোক গাছে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় আর তার হাড় ভেঙ্গে যায় তখন সে প্রমাণ করে মধ্যাকর্ষণের শক্তি আছে। আমরা অবশ্যই এই নিয়মটিকে অস্বীকার করতে পারব না। একই ভাবে যখন একজন লোক আল্লাহ্‌র কালাম অমান্য করে তখন তার নেতিবাচক পরিণতি থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম ও

বিবি হাওয়ার গুনাহ্ উপেক্ষা করে যেতে পারেন নি। তিনি বলতে পারতেন না, *"আরে, এই কথা ভুলে যাও"*, বা *"এই গুনাহ্ করা ছাড়া তোমাদের আর কোন উপায় ছিল না। ধরে নাও কখনও কোন গুনাহ্ই হয় নি"* বা *"এটা ছিল কেবলই একটি ছোট গুনাহ্।"* না! আল্লাহ্ পবিত্র এবং ন্যায়বান। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গিয়েছে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া ছিলেন দোষী। এই একটি মাত্র গুনাহ্ই বিচার, ভয় ও লজ্জা বয়ে এনেছিল। এই একটি মাত্র গুনাহ্ই আরও বেশী গুনাহ্ বয়ে এনেছিল। এই দুনিয়া এবং এর মধ্যেকার সব কিছু সেই বদদোয়ার কারণে কষ্ট পেয়েছিল। এতে জীবজন্তু, সাগর-মহাসাগর, পাখি, এমনকি ভূমি পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সৃষ্টি আর নিখুঁত রইল না। পাক-কিতাব বলে, এই বদদোয়ার ফলে-

> *...গোটা সৃষ্টিটাই যেন এক ভীষণ প্রসব-বেদনায় এখনও কাতরাচ্ছে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৮:২২ আয়াত)*

মানুষ কষ্টকর প্রসবের মধ্য দিয়ে এই দুনিয়াতে আসবে এবং মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি জীবনে মানুষ অবিচার, ঘাম ও দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আল্লাহ্ হযরত আদমকে বলেছেন-

> *"যে গাছের ফল খেতে আমি নিষেধ করেছিলাম তুমি... তা খেয়েছ। তাই তোমার দরুন মাটিকে বদদোয়া দেওয়া হল। সারা জীবন ভীষণ পরিশ্রম করে তবে তুমি মাটির ফসল খাবে। তোমার জন্য মাটিতে কাঁটাগাছ ও শিয়ালকাঁটা গজাবে, কিন্তু তোমার খাবার হবে ক্ষেতের ফসল। যে মাটি থেকে তোমাকে তৈরী করা হয়েছিল সেই মাটিতে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমাকে খেতে হবে। তোমার এই ধুলার শরীর ধুলাতেই ফিরে যাবে।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:১৭-১৯ আয়াত)*

জীবনের সব ক্ষেত্রে আমরা "কাঁটা" দেখতে পাই। আমরা বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। হযরত আদমের গুনাহের কারণে দুঃখময় পরিণতি বয়ে এসেছিল। কিন্তু মানুষের গুনাহের সবচেয়ে তিক্ত পরিণতি হল মৃত্যু, যে বিষয়ে আল্লাহ্ মানুষকে সতর্ক করেছিলেন।

৪ মৃত্যু

> *পরে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে (আদমকে) হুকুম দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ*

যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২:১৬,১৭ আয়াত)

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া বেছে নিয়েছিলেন তখন তাঁরা আল্লাহ্‌কে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। *তিনি কি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করবেন? মানুষ কি মারা যাবে? অথবা আল্লাহ্ কি শুধু কথার কথা বলছিলেন?* এ বিষয়ে পাক-কিতাবের কথা খুবই স্পষ্ট-

তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও জমীন শেষ হওয়া সহজ। *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬ঃ১৭ আয়াত)*

মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলতে আমাদের ভাল লাগে না। এটা একটি নিষিদ্ধ বিষয়। সারা দুনিয়া জুড়ে ভ্রমণ করে দুর্গম অঞ্চলে বাসকারী অনেক লোকদের আমি দেখতে গিয়েছি। দুনিয়ার কোন সমাজই মৃত্যুকে উপভোগের বিষয় মনে করে না। আমি অনেক খোলা কবরের কাছে দাঁড়িয়েছি। শহরাঞ্চলে হোক বা জঙ্গলে হোক, সবগুলো কবরই দুঃখের ছবি প্রকাশ করে। মৃত্যু মানে প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ। সেই প্রিয় মানুষটি আমাদের উপস্থিতি ছেড়ে চলে গিয়েছে এবং আর কখনও আমাদের কাছে ফিরে আসবে না। এই ক্ষতি বা বিচ্ছেদের ধারণাটি কিতাবুল মোকাদ্দসে দেওয়া মৃত্যু অর্থটির খুব কাছাকাছি। কিতাবুল মোকাদ্দসে মৃত্যু মানে ***বিচ্ছেদ***। মৃত্যু মানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা অস্তিত্বহীন হওয়া *নয়*।

আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে গুনাহের কারণে মৃত্যু শুরু হয়েছিল। মৃত্যু হল গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ। যেভাবে একজন কর্মচারীকে তার কাজের জন্য বেতন দেওয়া হয়, সেই ভাবে *গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)*।

পাক-কিতাব অনেক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে মৃত্যু সম্বন্ধে বলে। আমরা এমন তিনটি মৃত্যু সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

১। একটি সম্পর্কের মৃত্যু (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের রূহের বিচ্ছেদ)

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে মেনে চলার জন্য একটি নিয়ম দিয়েছিলেন। যখন তাঁরা এই নিয়মটি মেনে চলেছিলেন তখন তাঁরা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা এটি অমান্য করেছিলেন তখন তাঁরা এর পরিণতি ভোগ করেছিলেন। নিখুঁত আল্লাহ্ মিশ্র বিশ্বস্ততার অনুমতি দিতে পারেন না। বিশ্বাস ছাড়া কোন সম্পর্কই বেঁচে থাকতে পারে না। যখন হযরত আদম ও বিবি হাওয়া শয়তানের মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের একটি বিশাল ফাঁক সৃষ্টি হয়েছিল। বন্ধুত্ব ভেঙ্গে গিয়েছিল।

কিন্তু তাঁদের গুনাহের পরিণাম আরও দূরে চলে গিয়েছিল। হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার অবাধ্যতার কারণে তাঁদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনী তথা

সব মানুষ এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যেকার সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গিয়েছিল। যদিও আমরা প্রতিদিন বেঁচে আছি এবং শ্বাস নিই তবুও আল্লাহ্ সব মানুষকে দেখেন এই ভাবে...

অবাধ্যতা আর গুনাহের দরুন তোমরা মৃত।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ২:১ আয়াত)

এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি।

আমি আমার জীবনের বেশীর ভাগ সময় কয়েকটা গরম প্রধান দেশে ভ্রমণ ও বাস করে কাটিয়েছি। কয়েক বছর আমার স্ত্রী ও আমি একটি মাচাং ঘরে বাস করেছি। এক সময় একটি বড় ইঁদুর আমাদের ঘরের নীচের ফাঁকা জায়গাটিতে ঠাঁই নিয়েছিল। সেটি সেখানেই থাকত। কিন্তু এক সময় আমাদের শোবার ঘরের ঠিক নীচে সেটি মরে পড়েছিল। গরম ও আর্দ্র জলবায়ুতে সেই মৃত দেহ থেকে ভীষণ বিকট দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল, যার ফলে আমরা আর আমাদের শোবার ঘরে ঘুমাতে পারি নি। আমরা অন্য কামরায় চলে গিয়েছিলাম।

পরের দিন আমাদের ছেলে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। একটি লম্বা লাঠি দিয়ে সে সেই মরা ইঁদুরটিকে বাইরে টেনে এনেছিল। *সেই মৃত দেহটিতে পোকার বাসা দেখে সে ঘৃণায় পিছিয়ে আসল।* সে ওয়াক ওয়াক করে চোখ-মুখ উল্টে ফেলল। তারপর প্লাস্টিক ব্যাগে হাত মুড়িয়ে ইঁদুরটির লেজ ধরে তাড়াতাড়ি সেটিকে টেনে বাইরে আনল। এরপর জঙ্গলের দিকে দৌড়ে গিয়ে মৃত ইঁদুরটিকে যত দূরে পারল তত দূরে ছুঁড়ে মারল।

যদি সেই ইঁদুরটি আমাদের ছেলের চিন্তাগুলো জানতে পারত, তাহলে এই চিৎকার শুনতে পেত, "এখান থেকে দূর হও!" আর সেই ইঁদুর যদি আমাদের ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে পারত "কত দিনের জন্য?" তাহলে আমাদের ছেলে উত্তর দিত *"চিরকালের জন্য।"*

আমাদের গুনাহের প্রতি আল্লাহ্‌র মনোভাব সম্বন্ধে ইঁদুরের সেই মৃত পঁচা দেহটি দু'টি সত্য শিক্ষা দেয়।

- মৃত ইঁদুরটির গন্ধ ঠিক যেভাবে আমার স্ত্রী ও আমাকে ঘরের অন্য একটি রুমে চলে যেতে বাধ্য করেছিল এবং ঠিক যেভাবে আমাদের ছেলে সেই বিশ্রী মৃতদেহটি আমাদের ঘরের নীচ থেকে দূরে ছুঁড়ে মেরেছিল, সেভাবে আল্লাহ্ নিজেকে গুনাহ্‌পূর্ণ মানুষের কাছ থেকে আলাদা করেছেন। পাক-কিতাব বলে-

> *তোমাদের অন্যায় মাবুদের কাছ থেকে তোমাদের আলাদা করে দিয়েছে। তোমাদের গুনাহের দরুন তিনি তাঁর মুখ তোমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫৯:২ আয়াত)*

কেউ কেউ বলে আল্লাহ্ অনেক দূরে থাকেন বলে মনে হয়। তবে আসল কথা হল মানুষ... *"আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ১:২১ আয়াত)*

পবিত্রতার মধ্যে গুনাহের লেশমাত্র থাকতে পারে না। গুনাহ্ পঁচা মৃতদেহের মত। মনে রাখুন যেভাবে আমরা পঁচা ইঁদুরের প্রতি সাড়া দিই সেভাবে আল্লাহ্ আমাদের গুনাহের প্রতি সাড়া দেন। ঠিক যেভাবে সেই ভীষণ দুর্গন্ধ আমাদের তাড়িত করেছিল, সেভাবে একজন নিখুঁত আল্লাহ্ তাঁর উপস্থিতিতে গুনাহ্‌কে থাকতে দিতে পারেন না। আল্লাহ্ সম্বন্ধে পাক-কিতাবে লেখা আছে--

> *তুমি এত খাঁটি যে, তুমি খারাপীর দিকে তাকাতে পার না এবং অন্যায় সহ্য করতে পার না।* *(নবীদের কিতাব, হাবাক্কুক ১:১৩ আয়াত)*

গুনাহ্ বিশুদ্ধ পানির মধ্যে বিষ ঢালার মতই বিষয়। অল্প একটু বিষ সব কিছু নষ্ট করে। যেহেতু প্রত্যেকে গুনাহ্ করেছে, তাই আল্লাহ্ তাঁর নিজেকে সব লোকদের কাছ থেকে আলাদা করেছেন।

❖ দ্বিতীয়তঃ মৃত ইঁদুরের ঘটনাটি আমাদের শিক্ষা দেয়ঃ "কতদিন আল্লাহ্ চান আমরা তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকি?" উত্তরটি পরিষ্কার। চিরকালের জন্য! গুনাহের অসীম ও অনন্ত পরিণতি আছে। ঠিক যেভাবে আমরা আর একটি দিনের জন্যেও পঁচা ইঁদুরের সাথে বাস করতে চাইব না, সেভাবে আল্লাহ্‌ও কখনও গুনাহ্‌কে তাঁর উপস্থিতিতে থাকার অনুমতি দেবেন না।

এটা একটা কঠিন সংবাদ, কিন্তু সামনের দিকে পড়ে যেতে থাকুন। আমাদের জন্য সুসংবাদও আছে। এ পর্যন্ত আমরা বুঝেছি মানুষ গুনাহ্ করায় আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে। এই বিচ্ছেদ একটা মারাত্মক ব্যাপার। বন্ধুত্ব সম্পর্কটি ভেঙ্গে গিয়েছে, অর্থাৎ সম্পর্কের মৃত্যু হয়েছে।

২। দেহের মৃত্যু (মানুষের দেহ থেকে তার রূহের বিচ্ছেদ)

দেহের মৃত্যু সম্বন্ধে বুঝা আমাদের জন্য কঠিন কোন ব্যাপার নয়। আমাদের পরিবার ও আমাদের উপর মৃত্যুর প্রভাব সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। কিভাবে শারীরিক মৃত্যু হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল আমাদের সকলের সে বিষয়টা বুঝা প্রয়োজন।

যখন কোন লোক জীবন্ত পাতাযুক্ত একটি ডাল কাটে তখন সেই ডালের পাতাগুলো সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায় না এবং সেগুলোকে মৃত দেখায় না। আল্লাহ্ হযরত আদমকে বলেছেন, *"যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেদিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"* আল্লাহ্ বুঝান নি সেই গাছের ফল খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আদম

মাটিতে পড়ে মারা যাবে। আল্লাহ্‌ বুঝিয়েছিলেন হযরত আদম তাঁর জীবনের উৎস হিসাবে আল্লাহ্‌কে আর পাবেন না। যেভাবে গাছের ডালটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যাবে, সেভাবে হযরত আদমের দেহ মারা যাবে এবং ধুলায় ফিরে যাবে *(জবুর শরীফ ১০৪:২৯ আয়াত)*।

যদিও দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু রূহ্‌ বেঁচে থাকে। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে মানুষের রূহ্‌ অমর, অর্থাৎ এর মৃত্যু নেই।

৩। ভবিষ্যত আনন্দের মৃত্যু- দ্বিতীয় মৃত্যু (আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চিরকালের জন্য মানুষের রূহের বিচ্ছেদ)

পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহ্‌ মানুষের জন্য একটি সুন্দর জায়গা প্রস্তুত করছেন। এই জায়গার নাম জান্নাত বা বেহেশত। তিনি এই অবিশ্বাস্য ধরনের জায়গার নক্‌শা করেছেন যাতে মানুষ তাঁর সাথে চিরকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে পারে। এখানে মানুষ আনন্দপূর্ণ অনন্ত জীবন ভোগ করবে। এটা এমন একটি সুন্দর জায়গা যেখানে কোন গুনাহ্‌, কষ্ট ও মৃত্যু নেই।

অনন্ত জীবন যেমন আছে, তেমনি আছে অনন্ত মৃত্যু। পাক-কিতাব যখন মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করে তখন মাঝে মাঝে এর অর্থ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র আসল পরিকল্পনার মৃত্যু। পাক-কিতাবে এই মৃত্যুকে বলা হয়েছে *"দ্বিতীয় মৃত্যু।"* কারণ এই মৃত্যু শারীরিক মৃত্যুর পরে হয়। সব লোকের এই মৃত্যু হবে না। কেবল তাদেরই এই মৃত্যু হবে যাদের আল্লাহ্‌ নিজের সঙ্গে চিরকাল ধরে বাস করতে দেবেন না। পাক-কিতাব বলে এই লোকেরা আগুনের হ্রদে যাবে। এটা এমন একটি ভয়ংকর জায়গা যা শয়তান ও তার সঙ্গী ফেরেশতাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

> *এই আগুনের হ্রদে পড়াই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২০:১৪ আয়াত)*

পাক-কিতাব শিক্ষা দেয়-

- লোকদের জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে জীবিত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হবে *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ১৯:২০ আয়াত)*।
- দেহের মৃত্যু হলেও রূহ্‌ অমর থাকবে। আর সেখানে তারা চিরকাল ধরে দিন-রাত যন্ত্রণা ভোগ করবে *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২০:১০ আয়াত)*।
- এটা একটা দুঃখের *(জবুর শরীফ ১১৬:৩ আয়াত)*।
- গোশ্‌ত খাওয়া পোকাদের *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৯:৪৮ আয়াত)* এবং
- গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৮:১২; ২২:১৩; ২৫:৩০ আয়াত)* জায়গা।
- লোকেরা সেখানে কান্না করবে। ভীষণ যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষবে। তারা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হবে *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২৪ আয়াত)*।

তারা এই জীবনের কথা স্মরণ করবে। তারা চাইবে কেউই যাতে এই ভয়ানক জায়গায় তাদের সংগে যোগ না দেয়। এটা এমন একটা জায়গা যেখানে তারা একা একা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে। এখানে লোকেরা আর তাদের দুষ্ট বন্ধুদের সাথে নিয়ে আনন্দ-স্ফূর্তি করতে পারবে না।

কিন্তু জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকের হ্রদের মধ্যে থাকাই হবে ভীতু, বেঈমান, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, জেনাকারী, জাদুকর, মূর্তিপূজাকারী এবং সব মিথ্যাবাদীদের শেষ দশা। এটাই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:৮ আয়াত)

এটাও অবশ্যই ভাল সংবাদ নয়। পড়ে যেতে থাকুন। সুসংবাদ আসছে।

গুনাহ্-স্বভাব

এখন গুনাহ্ ও মৃত্যু হযরত আদমের মধ্য দিয়ে আসা প্রত্যেকটি মানুষের উপর রাজত্ব পেল। আর সেজন্যই গুনাহ্ ও মৃত্যু বাবার মধ্য দিয়ে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে চলে আসে। আপেল থেকে আপেল জন্মে, বিড়ালেরা বিড়ালের জন্ম দেয় আর গুনাহ্গার মানুষ গুনাহ্গার মানুষের জন্ম দেয়।

একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে।

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৫:১২ আয়াত)

হযরত আদমের গুনাহের কারণে তাঁর সব বংশধরেরা তাঁর গুনাহ্-স্বভাবের অধিকারী হবে। আর যেহেতু তিনি মরেছিলেন, তাই তাঁর বংশধরেরা সবাই মারা যাবে।

প্রায় সময়ই গুনাহ্গার শব্দটির সাথে আমরা কতগুলো নির্দিষ্ট অপরাধের একটি তালিকা জুড়ে দিই। কিন্তু পাক-কিতাব বলে গুনাহ্ তার চেয়েও বেশী কিছু। মানুষের একটি *গুনাহ্ স্বভাব* আছে, যাকে কোন কোন সময় বলা হয় *আদমের স্বভাব।* স্বভাব মানে একজন লোকের অন্তরে বাসকারী বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্য সেই লোকের আচার-আচরণ পরিচালিত করে। যেমন- বিড়ালের স্বভাব বেশী কৌতূহলী হওয়া, কুকুরের স্বভাব মানুষের বন্ধু হওয়া। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী চলে। ঠিক সেই ভাবে প্রত্যেক লোকের মধ্যে গুনাহ্ স্বভাব থাকায় তারা গুনাহ্ করে।

আল্লাহ্ সৎ

গুনাহ্ ও মৃত্যু নিয়ে আলোচনা আনন্দের বিষয় নয়। যখন আল্লাহ্ অপ্রিয় বিষয় বর্ণনা করেন তখন তিনি তা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেন না। বিষয়টি ঠিক যেমন সেভাবেই তিনি তা সব সময় বর্ণনা করেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই গুনাহ্ ও মৃত্যু নামক এই দু'টি বিষয় আছে। আর এগুলো সম্বন্ধে পাক-কিতাবের বলা কথা আমাদের জানা প্রয়োজন। আল্লাহ্ নিখুঁত বলে তিনি আমাদের কাছ থেকে সত্যকে সরিয়ে রাখেন না।

আমরা কি খাঁটি স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করি?

একটা জনপ্রিয় বিশ্বাস ও শিক্ষা হল ছেলেমেয়েরা এই দুনিয়াতে নিখুঁত ও নিষ্পাপ শিশু হিসাবে জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পাক-কিতাব আমাদের এ ব্যাপারে কি শিক্ষা দেয়? আমরা কি সত্যি সত্যিই খাঁটি স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করি?

দাউদ নবী পাক-কিতাবের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ লিখেছেন। তাঁর মতে-

> *হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; গুনাহের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম।* *(জবুর শরীফ ৫১:৫ আয়াত)*

আইয়ুব নবী তাঁর কিতাবে বলেছেন-

> *নাপাক থেকে কেউ কি পাক-পবিত্র কিছু তৈরী করতে পারে? কেউ পারে না।* *(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ১৪:৪ আয়াত)*

আমাদের নিজেদের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই-

> *তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি কোথা থেকে আসে? যে সব কামনা-বাসনা তোমাদের শরীরের মধ্যে যুদ্ধ করে তার মধ্য থেকেই কি সেগুলো বের হয়ে আসে না?।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ৪:১ আয়াত)*

আমাদের নিজেদেরকে কিছু কঠিন প্রশ্ন করতে হবে। মা-বাবা কি আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে এবং অবাধ্য হতে শিক্ষা দিয়েছেন? তারা কি আমাদের স্বার্থপর হতে এবং লোকদের সাথে তর্ক করতে শিখিয়েছেন? এর উত্তর “না।” গুনাহ্ করার জন্য আমাদেরকে শিক্ষা পেতে হয় নি। স্বভাবগত ভাবেই আমরা এসব কাজ করি।

গুনাহ্ একটি সংক্রামক রোগের মত। পাক-কিতাব বলে আদমের গুনাহ্ স্বভাব (এর সমস্ত লক্ষণ ও পরিণতি সহকারে) আমাদের সকলের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে।

- ❖ পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল দেশের ওলফ লোকদের কয়েকটি প্রবাদ বাক্য এই সত্যটি শিক্ষা দেয়ঃ
- ❖ মহামারী শুধু আক্রান্ত লোকটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না।
- ❖ একটা লাফানো হরিণ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে এমন বাচ্চা জন্ম দেয় না।
- ❖ একটা ইঁদুর এমন বাচ্চার জন্ম দেয় না যে, বাচ্চাটি খুঁড়তে পারে না।
- ❖ একটা গাছের ডাল দীর্ঘ সময় ধরে পানিতে ভিজিয়ে রাখা হলেও এটা কখনও কুমির হয়ে যাবে না।

হযরত আদম গুনাহ্ করেছিলেন বলেই তাঁর সব বংশধরেরাই তাঁর গুনাহ্ স্বভাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে।

বংশগতির বিজ্ঞানীরা কি দেখতে পেয়েছেন?

"বাহ্যিক চেহারায় ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সব মানুষ আসলেই একটি একক পরিবারের সদস্য। মানুষের উৎপত্তি একটি মাত্র জায়গায়, যা খুব বেশী সময়ের নয়, প্রত্যেক মানুষই যে একটি একক পরিবারের সদস্য, এই ভ্রাতৃত্ব আমাদের উপলব্ধির চেয়েও আরও বেশী সুগভীর।" স্টিফেন জে গোল্ড এই কথাগুলো বলেছেন। তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্ম বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। তিনি ১৯৮৮ সালে নিউজউইক ম্যাগাজিনে *"হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার অনুসন্ধানে"* নামে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।[৩]

সেই প্রবন্ধে লেখা ছিল, *"...আণবিক জীববিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশ থেকে আসা লোকদের জীন পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন তাদের উঘঅ-এর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট আছে, যা নির্দেশ করে এই পৃথিবীর সব মানুষ একজন মাত্র স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে এসেছে। ...এমনকি বিভিন্ন জাতির মধ্যেও পার্থক্য ছিল না।"* পাক-কিতাব বলে-

> *আদম তাঁর স্ত্রীর নাম দিলেন হাওয়া (যার মানে 'জীবন'), কারণ তিনি সমস্ত জীবিত লোকদের মা হবেন।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২০ আয়াত)*

এরপরে ১৯৯৫ সালের 'টাইম'[৪] ম্যাগাজিনে একটি ছোট প্রবন্ধ ছিল, যে প্রবন্ধে বলা হয় বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে *"...একজন পূর্বপুরুষ 'আদমের' অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের মধ্যে তাঁর একই জীন আছে।"* পাক-কিতাব বলে-

> *তিনি একজন মানুষ থেকে সমস্ত জাতির লোক সৃষ্টি করেছেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত্ ১৭:২৬ আয়াত)*

মানব DNA-এর এসব গবেষণার উপসংহার হল- আমাদের সকলের আদিপুরুষ হিসাবে একজন পুরুষ এবং *একজন স্ত্রীলোক* আছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ এই বিষয়ে একমত, আবার কেউ কেউ একমত নন। এমনকি, যাঁরা একমত তাঁরা একথাও বলেন যে, সেই একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকটি কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণিত হযরত আদম ও বিবি হাওয়া নাও হতে পারেন। এছাড়াও তাঁরা হয়ত একসাথে বাস নাও করে থাকতে পারেন। অবস্থা যা-ই হোক না কেন, মজার বিষয় হল আল্লাহ্‌র কালামের সাথে এসব গবেষণার মিল আছে।

এসব আবিষ্কার এবং আধুনিক আণবিক জীব-বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য আবিষ্কার দীর্ঘ সময় ধরে বলা পাক-কিতাবের কথা নিশ্চিত করেছে। আর সেই কথাটি হল আমরা সকল মানুষ একজন অন্যজনের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

১ আপাতঃবিরোধী কিন্তু সত্য

২ গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া

৩ ইদ্রিস নবী

৪ নূহ নবী

৫ ব্যাবিল

১ আপাতঃবিরোধী কিন্তু সত্য

এই বইয়ের প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে আমরা আল্লাহ্‌র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুটা শিখেছি। কিন্তু আমরা তাঁকে আরও বেশী করে জানতে চাই। সেজন্য প্রথমে আমাদের ভিত্তি শক্তিশালী করা এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের ছবি মেলানোর ধাঁধার সাথে আরো বেশী করে টুকরা যোগ করা দরকার। এতে আমরা শীঘ্রই তাঁর সম্বন্ধে আরও জানতে পারব।

আল্লাহ্ ঠিক যেভাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়েছেন সেভাবে তাঁর ও মানুষের মধ্যেকার সম্পর্ককে পরিচালনা করার জন্য তিনি কিছু রূহানী নিয়ম দিয়েছেন। ঠিক যেভাবে এই দুনিয়া সম্বন্ধে বুঝার জন্য জীব-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করে, সেভাবে আল্লাহ্‌র রূহানী নিয়ম জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে। এসব রূহানী নিয়ম বোঝা কঠিন কিছু নয়। কিন্তু প্রথমে চলুন, আমরা মানুষের অবস্থা চিন্তা করি।

মানুষের সমস্যা

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার পছন্দের কারণে মানুষ এখন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এই সমস্যাটির দু'টি দিক আছে, যেমনটি একই মুদ্রার দু'টি পিঠ আছে।

- ❖ আমাদের এমন কিছু আছে যা আমরা চাই না। আর তা হল- ***গুনাহের ঋণ***
- ❖ আমাদের এমন কিছু প্রয়োজন যা আমাদের নাই। আর তা হল- ***নিখুঁততা***

আমাকে এ বিষয়গুলো আরো গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করতে দিন।

১। আমাদের একটি গুনাহ্ ঋণ আছে।

কোন লোক মহাজন থেকে টাকা ধার করলে মহাজন সেই ঋণগ্রহীতার জন্য একটি ঋণ-পত্র লিখেন যাতে উভয়ে ধার করা টাকার পরিমাণের কথা ভুলে না যায়। যারা ঋণের টাকা শোধ করে না, তারা আইনগত ভাবে পুরোপুরি অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত হয়। একই ভাবে পাক-কিতাব শিক্ষা দেয়, আমাদের নৈতিক "হিসাব খাতায়" আমাদের গুনাহের একটি ঋণ পড়ে আছে, যা আমাদের অবশ্যই শোধ করতে হবে। আমরা সবাই গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়মের অধীন *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৮:২ আয়াত)*। এই নিয়মটি বলেঃ *যে গুনাহ্ করবে সে-ই মরবে (নবীদের কিতাব, হেজকিল ১৮:২০ আয়াত)*।

আল্লাহ্ হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে এই নিয়মটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন যখন তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন যদি তাঁরা তাঁর কথার অবাধ্য হন, তাহলে তাদের মৃত্যু হবে। এই নিয়মটি বলে গুনাহ্-ঋণ কেবল (দেহ, মন ও রূহের) মৃত্যু দ্বারাই পরিশোধ করা যেতে পারে।

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়ঃ *আমরা কি সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারি?* এর উত্তর আংশিক ভাবে *"হ্যাঁ।"* যখন আমরা দোষ, লজ্জা, দুঃখ, ক্ষতি ও ব্যথার অভিজ্ঞতা লাভ করি, তখন আমরা গুনাহের পরিণতি ভোগ করি। কিছু লোক খুব ভালভাবে এসব পরিণতি সহ্য করতে শিখেছে। সময়ের সাথে সাথে তারা দোষ ও ব্যথা অতিক্রম করে যায়। কিন্তু মৃত্যুর পরে তারা গুনাহের ফল এড়িয়ে যেতে পারবে না। দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া চিরদিন ধরে চলতে থাকবে। বরং এই ঋণ সম্পূর্ণভাবে শোধ করা সম্ভব নয়। এই ঋণ কখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় না। এই ঋণটি সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করার জন্য গুনাহ্‌গার হিসাবে আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর সম্পূর্ণ পরিণাম বহন করতে হবে। কেউ এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে গেলে সে বুঝবে এই ঋণ শোধ করা খুবই কঠিন। আর এটাই হল সমস্যা। আমাদেরকেই এই ঋণ শোধ করতে হবে, কারণ এটা *আমাদেরই* ঋণ। কী এক উভয় সংকট!

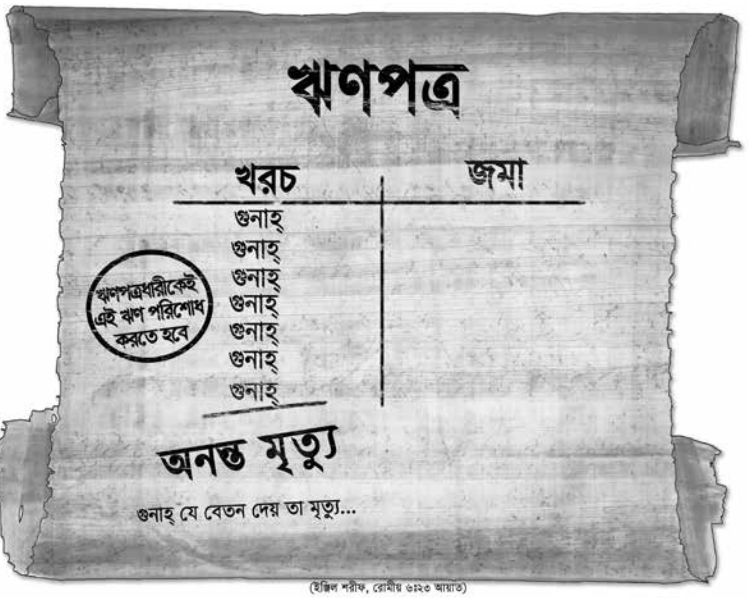

(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)

কোন একভাবে গুনাহের ভয়ানক পরিণতি দূর করা হলে কিংবা গুনাহের দেনা মুছে ফেলা হলেও আমরা প্রভুর সাথে বাস করতে পারব না, কারণ এর জন্য আমাদের এমন বিশেষ কিছু প্রয়োজন, যা আমাদের নেই।

২। আমাদের দরকার নিখুঁততা

শুধুমাত্র নিখুঁত লোকেরাই নিখুঁত বেহেশতে নিখুঁত আল্লাহ্‌র সঙ্গে বাস করতে পারবে। তাই আমাদেরকে কোন একভাবে নিখুঁততার এমন একটি স্তর অর্জন

করতে হবে, যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পবিত্র উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য করবে। কিতাবুল মোকাদ্দসের ইঞ্জিল শরীফ বলে-

পবিত্র না হলে কেউ প্রভুকে দেখতে পাবে না। *(ইবরানী ১২ঃ১৪ আয়াত)*

এই ভাল-স্বভাব বা পবিত্রতা অবশ্যই মাবুদ আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সমান হবে। যেহেতু কেউ সেই ধরনের পবিত্রতার কাছাকাছি আসতে পারে না, তাই আমাদের জন্য একটি সমস্যা থেকে যায়।

সারাংশ

তাই অবশ্যই দু'টি প্রশ্ন আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করব। প্রথমতঃ কিভাবে আমরা আমাদের গুনাহ্ ঋণ এবং গুনাহের পরিণামের হাত থেকে মুক্ত হতে পারি? দ্বিতীয়তঃ কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র মত পবিত্রতা লাভ করতে পারি যাতে আমরা তাঁর উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারি?

আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ তাঁর সাথে বাস করার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করল তখন মানুষের পুরো স্বভাব পরিবর্তন হয়ে গেল। যে নিষ্পাপ স্বভাব তাকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য করেছে, সে সেই স্বভাব হারিয়ে ফেলেছে। *তাহলে মানুষ যাতে আবার নিখুঁত আল্লাহ্‌র সাথে বাস করতে পারে সেজন্য কিভাবে সে সেই নিখুঁততা বা পবিত্রতা ফিরে পেতে পারে?*

যাহোক আমরা মানুষের উভয় সংকট সনাক্ত করেছি। এখন আসুন আমরা দেখি কিভাবে আমাদের সমস্যা মাবুদ আল্লাহ্‌কে প্রভাবিত করেছে।

আল্লাহ্‌র অবস্থা

মাবুদের অবস্থা বুঝার জন্য আল্লাহ্‌র এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের বিবেচনা করা দরকার।

১। সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচারক

আমরা জানি মাবুদই নিখুঁত এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ। গুনাহের লেশমাত্রও না থাকার অর্থ হল আল্লাহ্ সৎ, ন্যায়বান এবং পক্ষপাতহীন।

তিনিই আশ্রয়-পাহাড়, তাঁর কাজ নিখুঁত; তাঁর সমস্ত পথ ন্যায়ের পথ। তিনি নির্ভরযোগ্য আল্লাহ্, তিনি কোন অন্যায় করেন না; তিনি ন্যায়বান ও সৎ। *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪ আয়াত)*

আল্লাহ্ একজন ভাল ন্যায়বিচারক, কারণ তিনি একজনের সাথে একভাবে এবং অন্যজনের সাথে অন্য ভাবে আচরণ করেন না। তিনি প্রত্যেককেই সমানভাবে দেখেন।

তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্ সব দেব-দেবীর উপরে এবং তিনি মালিকদের মালিক। তিনি মহান, শক্তিশালী এবং ভয় জাগানো আল্লাহ্। তিনি কারও পক্ষ নেন না এবং ঘুষও খান না। *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৭ আয়াত)*

রাজপুত্র বা গরীব, প্রত্যেকের বেলাতেই মাবুদ তাঁর নিয়ম সম ও পক্ষপাতহীনভাবে প্রয়োগ করেন। এই দুনিয়াতে একজন লোক নিজের অন্যায় লুকাতে পারে, অন্যায় করে মিথ্যা কথা বলতে পারে, বিচারককে ঘুষ দিতে পারে বা ধরা না পড়তে পারে। কিন্তু গুনাহ্ করে কোন লোকই আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের হাত থেকে বাঁচতে পারে না।

আল্লাহ্ প্রত্যেকটি কাজের, এমন কি, প্রত্যেকটি গোপন ব্যাপারের বিচার করবেন, তা ভাল হোক বা খারাপ হোক (নবীদের কিতাব,। হেদায়েতকারী ১২:১৪ আয়াত)

সততা ও পক্ষপাতহীনতা আল্লাহ্র নিখুঁত স্বভাবের মৌলিক দিক।

সততা ও ন্যায়বিচারের উপর তোমার সিংহাসন দাঁড়িয়ে আছে।
(জবুর শরীফ ৮৯:১৪ আয়াত)

মাবুদ ন্যায়বান বলেই ন্যায়ের কাজ তিনি ভালবাসেন।
(জবুর শরীফ ১১ঃ৭ আয়াত)

আল্লাহ্ নিখুঁত ও সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতহীন হওয়ায় আমরা তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি। আর এই সত্যটা আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু দুঃসংবাদ হল নিখুঁত ন্যায়বিচারক চান গুনাহের যাতে শাস্তি হয়। এই শাস্তি যেন অপরাধের সমপরিমাণ হয়। আল্লাহ্ গুনাহ্কে খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখেন। পাক-কিতাবে আছে আমাদের দৈহিক এবং রূহানী মৃত্যুর দ্বারাই কেবল মাত্র আমাদের গুনাহ্ের ঋণ শোধ হতে পারে।

আমাদের জন্য এটা সুসংবাদ নয়। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হল আল্লাহ্র চরিত্রের অন্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

২। সম্পূর্ণরূপে প্রেমময়

আল্লাহ্ যে কেবল সম্পূর্ণরূপে ন্যায়বিচারক তা নয়, তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রেমময়ও বটে।

আল্লাহ্ নিজেই মহব্বত *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ ইউহোন্না ৪ঃ৮ আয়াত)*।

❖ আল্লাহ্ যখন এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছিলেন তখন তাঁর এক ধরনের মহব্বত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সৃষ্টির জন্য তাঁর যত্ন ও চিন্তা থেকে আমরা এই মহব্বত দেখতে পাই। এছাড়াও আমরা দেখতে পাই কিভাবে--

"তিনিই ভোগের জন্য সব জিনিস খোলা হাতে আমাদের দান করেন।"
(ইঞ্জিল শরীফ, ১ তীমথিয় ৬:১৭ আয়াত)

❖ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে দেখা যাবে আল্লাহ্ উপরে বর্ণিত এই মহব্বতের চেয়েও গভীরতর মহব্বত প্রকাশ করেছেন। আমরা এই মহব্বত পাওয়ার যোগ্য নই। এই মহব্বতকে বুঝানোর জন্য প্রায়ই *রহমত, রহম ও করুণা* শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ্, যিনি সব দেবতার চেয়েও মহান তাঁর শুকরিয়া আদায় কর; তাঁর মহব্বত চিরকাল স্থায়ী-

> *মালিক, যিনি সব মালিকদের চেয়েও মহান তাঁর শুকরিয়া আদায় কর;*
> *তাঁর মহব্বত চিরকাল স্থায়ী।* *(জবুর শরীফ ১৩৬ঃ২-৩ আয়াত)*

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আল্লাহ্‌র সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ পরিবর্তিত হয়ে যান নি। মাবুদ আল্লাহ্ তারপরও তাঁদেরকে মহব্বত করেছিলেন।

আপাতঃবিরোধী, কিন্তু সত্য

এখন আমরা একটি আপাতঃবিরোধী সত্য দেখতে পাব। আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারের দরুন তিনি অবশ্যই তাঁর নিয়ম কার্যকর করবেন। এতে কোন ব্যতিক্রম হবে না। এর মানে আমাদের সবাইকে অবশ্যই নিজেদের গুনাহ্ ঋণের জন্য মূল্য দিতে হবে। গুনাহের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মরতে হবে। কিন্তু তাঁর মহব্বতের দরুন তিনি চান না আমরা ধ্বংস হয়ে যাই। তিনি চান আমরা যেন চিরদিন তাঁর সাথে বাস করতে পারি।

আল্লাহ্‌র চরিত্রের মধ্যে এই উভয় গুণই সমভাবে আছে। আল্লাহ্ একদিকে মহব্বতপূর্ণ, অন্যদিকে তিনি ন্যায়বিচারকও বটে। এই উভয় বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে সক্ষম হতে হয়, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ এমন এক উপায়ে কাজ করেন, যা তাঁর নিখুঁত স্বভাবের সাথে মিলে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলঃ *কিভাবে আল্লাহ্ ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারেন, আবার একই সময়ে মহব্বতপূর্ণ বা করুণাময় থাকতে পারেন?* বইটি পড়ে যেতে থাকলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে পাব।

গুনাহ্‌কে কখনও উপেক্ষা করা যায় না

আমরা গুনাহ্ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র অনুভূতির বিষয়ে জানি। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্ অবশ্যই আমাদের গুনাহ্ ঋণের বিষয়ে কিছু একটা করবেন। তিনি এই গুনাহ্ এড়িয়ে যেতে পারেন না। তিনি তাঁর পবিত্র স্বভাবের বিপক্ষে কাজ করবেন না। তাই এই দুনিয়াতে হোক কিংবা মৃত্যুর পরে হোক, আল্লাহ্ অবশ্যই সব গুনাহের বিচার করবেন। এই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে অটল। আমরা যে সবাই অবশ্যই মারা যাব, এর কোন ব্যতিক্রম নেই।

> *মাটিতে পানি ঢাললে যেমন তা আর তুলে নেওয়া যায় না সেইভাবেই তো আমরা মরব।* *(নবীদের কিতাব, ২ শামূয়েল ১৪:১৪ক আয়াত)*

কিন্তু এই আয়াতটি সেখানেই থেমে থাকে না। আমরা আল্লাহ্‌র স্বভাবের অন্য বৈশিষ্ট্যও দেখতে পাই। তিনি তাঁর স্বভাবে মহব্বতপূর্ণ। পাক-কিতাবে লেখা আছে-

> *তিনি এমন ব্যবস্থা করেন যাতে দূর করে দেওয়া লোক তাঁর কাছ থেকে দূরে না থাকে।* *(নবীদের কিতাব, ২ শামূয়েল ১৪:১৪খ আয়াত)*

এই আয়াতটি বলছে আল্লাহ্‌ আমাদের দেহকে মৃত্যুর অধীন করলেও, তিনি মহব্বত করে আমাদের জন্য একটা উপায় দান করেছেন যাতে আমাদের আর মৃত্যুর শাস্তির অনন্ত পরিণাম ভোগ করতে না হয়। একই সময়ে আমরা যাতে আবার তাঁর সাথে থাকতে পারি, তার পথও তিনি আমাদের জন্য সম্ভবপর করেছেন। কিভাবে আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহের বিচার করতে পারেন, আবার একই সময়ে আমাদের মুক্ত করতে পারেন? ব্যক্তিকে শাস্তি না দিয়ে কিভাবে তিনি গুনাহ্‌কে শাস্তি দিতে পারেন? এই বইটির পরবর্তী অধ্যায় সমূহে আমরা এই বিষয়ে দেখতে পাব।

অহংকার

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে যাওয়ার আগে শেষ আরেকটি বিষয় আছে। পাক-কিতাব বলে শয়তান অহংকারের বশে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমরা প্রায়ই গর্ব করাকে ভাল বিষয় হিসাবে দেখি। কিন্তু কিতাব বলে একজন লোকের অন্তরে গর্ব থাকার দরুন সে সাহায্যের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে যায় না। আল্লাহ্‌ চান আমরা যাতে নম্র ভাবে শুধুমাত্র তাঁর উপরেই নির্ভর করি। পাক-কিতাব আমাদের এই বলে সতর্ক করে-

> *আল্লাহ্‌ অহংকারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান, কিন্তু নম্রদের রহমত করেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ পিতর ৫:৫ আয়াত)*

আমরা যাতে নিজেদের অহংকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হই এবং আমাদের সম্বন্ধে অন্যদের মতামত নিয়ে উদ্বিগ্ন না হই, সেজন্য কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌ বলেছেন-

> *জ্ঞানী লোকেরা তাদের জ্ঞানের গর্ব না করুক, কিংবা শক্তিশালীরা তাদের শক্তির গর্ব না করুক কিংবা ধনীরা তাদের ধনের গর্ব না করুক কিন্তু যে গর্ব করতে চায় সে এই নিয়ে গর্ব করুক যে, সে আমাকে বোঝে ও জানে, অর্থাৎ সে জানে যে, আমিই মাবুদ; আমার মহব্বত অটল আর দুনিয়াতে আমার কাজ ন্যায়ে ও সততায় পূর্ণ। এই সমস্ত বিষয়েই আমি আনন্দ পাই। আমি মাবুদ এই কথা বলছি।*
> *(ইয়ারমিয়া ৯ঃ২৩,২৪ আয়াত)*

২ গুনাহ্ ঢাকা দেওয়া

বাগানের সেই ফল খাওয়ার পর হযরত আদম ও বিবি হাওয়া ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের জন্য পোশাক বানিয়েছিলেন। যদিও তাঁরা নিজেদের ঢেকে রেখেছিলেন তবুও হযরত আদম আল্লাহ্‌কে বলেছিলেন তাঁর নিজেকে উলংগ মনে হচ্ছে। এর একটি কারণ আছে। পাক-কিতাব বলে-

> *মানুষ যা দেখে তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ মানুষ দেখে বাইরের চেহারা কিন্তু মাবুদ দেখেন অন্তর।* *(নবীদের কিতাব, ১ শামুয়েল ১৬:৭ আয়াত)*

যদিও হযরত আদম ও বিবি হাওয়া নিজেদের অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন, আল্লাহ্ কিন্তু তাঁদের দিলের বিষয়ে জানতেন।

পাক-কিতাব বলে নিজেদেরকে ঢাকার বিষয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার ব্যক্তিগত পদ্ধতি আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ডুমুর পাতা তাঁদের উলংগতা ঢেকেছিল, কিন্তু তাঁদের দিল গুনাহে পূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, মানুষ নিজে নিজে তার গুনাহের সমস্যা দূর করতে পারবে না। তাই তাদের *ডুমুর পাতার* পোশাককে তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

একটি ঢাকনা

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই উপযুক্ত পোষাক যুগিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্ নিজেই পশু হত্যা করলেন এবং...

> *পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২১ আয়াত)*

গুনাহ্ যে মৃত্যু বয়ে আনে এই ঘটনাটি তার ছবি। গুনাহের দরুন পশুর মৃত্যু হল। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া আগে কখনও মৃত্যু দেখেন নি। কিন্তু সেই মৃত্যু দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের ভীষণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রক্ত মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কিভাবে সেই পশুটির মৃত্যু হয়েছিল তা তাঁরা দেখেছিলেন। মৃত্যুর চরম পরিণতি তাঁরা নিজের চোখে দেখেছিলেন। আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদেরকে মৃত্যুর ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝিয়েছিলেন। তাঁদের গুনাহ্ ঢাকার জন্যই পশুর মৃত্যু হয়েছিল।

বের করে দেওয়া

গুনাহ্ করার পরও মানুষ বাগানে বাস করছিল এবং তার জীবন-গাছের ফল খাওয়ার সুযোগ ছিল। এই গাছের ফল খেলে হযরত আদম বা বিবি হাওয়া চিরকাল ধরে বেঁচে থাকতেন। শেষে আল্লাহ্ তাঁদেরকে সেই বাগান থেকে বের করে দিলেন।

তারপর মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "দেখ, নেকী-বদী জ্ঞান পেয়ে মানুষ আমাদের একজনের মত হয়ে উঠেছে। এবার তারা যেন জীবন-গাছের ফল পেড়ে খেয়ে চিরকাল বেঁচে না থাকে সেইজন্য আমাদের কিছু করা দরকার।"*

এই বলে মাবুদ আল্লাহ্ মাটির তৈরী মানুষকে মাটি চাষ করবার জন্য আদন বাগান থেকে বের করে দিলেন।

এইভাবে তিনি তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি জীবন-গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেবার জন্য আদন বাগানের পূর্ব দিকে কারুবীদের রাখলেন, আর সেই সংগে সেখানে একখানা জ্বলন্ত তলোয়ারও রাখলেন যা অনবরত ঘুরতে থাকল।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২২-২৪ আয়াত)

*"*আমাদের*" শব্দটি লক্ষ্য করুন। যেহেতু কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্ মাত্র একজনই আছেন। তাই আমাদের নিজেদেরকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করা যুক্তি সম্মত "*... মানুষ* **আমাদের** *একজনের মত হয়ে উঠেছে,*" তখন এই কথাটি দ্বারা আল্লাহ্ কার সঙ্গে কথা বলছেন? পাক-কিতাবের বিভিন্ন আয়াত পড়বার সময় আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে যাব।

আসলে সেই বাগান থেকে তাঁদেরকে বের করে দিয়ে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি রহম করলেন। তিনি চান নি মানুষ চিরকাল ধরে গুনাহের মধ্যে বাস করুক। ভেবে দেখুন যদি অতীত কালের সব খারাপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা এখন অবাধে বেঁচে থাকত, তাহলে এই দুনিয়াটা বসবাসের জন্য কেমন ভয়ানক জায়গা হয়ে উঠত। বাগান থেকে মানুষকে বের করে দেওয়ার দ্বারা আল্লাহ্ গুনাহের একটি পরিণতি দেখালেন। আর সেই পরিণাম ছিল দৈহিক মৃত্যু। আবার এই দৈহিক মৃত্যুর বাইরে রয়েছে আরেকটি মৃত্যু। সেই মৃত্যুকে বলা হয় দ্বিতীয় মৃত্যু, অর্থাৎ চিরকালের জন্য আগুনের হ্রদে জ্বলতে থাকা। আর সেই অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষার পরিকল্পনার কথা আল্লাহ্ চিন্তা করছিলেন।

কাবিল এবং হাবিল [১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া সময়রেখা দেখুন]

আদম তাঁর স্ত্রী হাওয়ার কাছে গেলে পর হাওয়া গর্ভবতী হলেন, আর কাবিল নামে তাঁর একটি ছেলে হল। তখন হাওয়া বললেন, "মাবুদ আমাকে একটি পুরুষ সন্তান দিয়েছেন।" পরে তাঁর গর্ভে কাবিলের ভাই হাবিলের জন্ম হল। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:১,২ আয়াত)*

কাবিল ও হাবিল দু'জনেরই জন্ম হয়েছিল আদন বাগানের বাইরে। হযরত আদম ও বিবি হাওয়া গুনাহ্ করার পরে তারা মায়ের গর্ভে এসেছিল। তাই তাদের দু'জনের মধ্যেই আদমের গুনাহ্ স্বভাব ছিল এবং দু'জনই ছিল আল্লাহ্র কাছ থেকে আলাদা। যেহেতু তিনি *ন্যায়বান,* তাই আল্লাহ্কে তাঁর নিয়ম প্রয়োগ করতে হয়েছিল। কাবিল ও হাবিলকেও তাদের গুনাহের জন্য মারা যেতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মহব্বত করতেন। তাঁর রহমতের দরুন তিনি এমন একটি উপায়ের ব্যবস্থা করলেন যাতে তারা তাঁর বিচার থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ্র এই পরিকল্পনার দুটি দিক ছিল।

প্রথমতঃ ভিতরগত দিক- আল্লাহ্‌র উপর ঈমান

কাবিল ও হাবিলকে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখতে এবং তাঁর কথা যে সত্য, তার উপরে বিশ্বাস করতে হয়েছিল। যেমন হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাছে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন যে, সেই *নাজাতদাতা* শয়তানের মাথা পিষে দেবে এবং তাঁদেরকে ও তাঁদের বংশধরদের গুনাহের পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন। *সেটা কি সম্ভবপর ছিল? সেটা কি সত্য ছিল? আল্লাহ্ কি সত্যি সত্যি তা বুঝিয়েছিলেন?* আল্লাহ্‌র উপর তারা ঈমান আনবে কিনা, সে বিষয়ে কাবিল ও হাবিলকেই ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ বাইরের দিক- ছবি দিয়ে সাহায্য করা

এছাড়াও আল্লাহ্ তাদেরকে দেখাতে চেয়েছিলেন গুনাহ্ দূর করার জন্য *কি লাগবে।* তা যাতে তারা ছবির সাহায্যে বুঝতে পারে এজন্য তিনি একটি পরিকল্পনা করলেন। মনোযোগ দিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারব আল্লাহ্ কাবিল ও হাবিলকে পশু হত্যা করে তার রক্ত একটি গাহ্‌র* উপর ছিটিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেন আল্লাহ্ এই ধরনের কোরবানী ব্যবহার করেছিলেন? পাক-কিতাব বলে-

* গাহ্ হল পাথর বা মাটির তৈরী এমন সমান জায়গা, যার উপরে কোরবানী করা হত।

> *...রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।* (*ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৯:২২ আয়াত*)

উক্ত আয়াতের মধ্যে ব্যাখ্যা ঢুকিয়ে আমরা এই ধারণাটা আরও বেশী করে বুঝতে পারি। যেমন- *(মৃত্যুর মধ্য দিয়ে) রক্তপাত না হলে গুনাহের (ঋণের) মাফ হয় না।*

আল্লাহ্ বলছিলেন যে, কেবল মৃত্যুর দ্বারাই মানুষের গুনাহ্-ঋণের শোধ হতে পারে বা মানুষ মাফ পেতে পারে। কিন্তু রক্তের দরকার কেন?

> *কারণ রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেইজন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্ ঢাকা দেয়।*
> (*তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১৭ঃ১১ আয়াত*)

এই রক্ত কোরবানীর দু'টি দিক আছেঃ

১। **বদলীঃ** সাধারণতঃ মানুষ তার নিজের গুনাহের জন্য মারা যাবে। কিন্তু সেসময় আল্লাহ্ বলছিলেন যে, তিনি মানুষের মৃত্যুর বদলী হিসাবে একটি নিষ্পাপ পশুর মৃত্যুকে গ্রহণ করবেন। এটা ছিল প্রাণের বদলে প্রাণ, দোষীর জায়গায় নির্দোষীর মৃত্যু। রক্ত-কোরবানীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচারকে পরিপূর্ণ করার জন্য *গুনাহ্ ও মৃত্যুর* নিয়মটি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলঃ "রক্তপাত না করে কি কোন পশুকে হত্যা করা সম্ভব ছিল? যেমন সেটিকে কি ডুবিয়ে হত্যা করা সম্ভব ছিল?"

২। **গুনাহ্ ঢাকা দেওয়াঃ** আল্লাহ্ বলেছিলেন সেই রক্ত গুনাহের জন্য ঢাকনা দেওয়ার কাজ করবে। এই গুনাহ্ ঢাকা দেওয়াকে *'কাফফারা'* দেওয়াও বলা হয়। সেই রক্তপাত মানুষের গুনাহ্ *ঢাকা* দেবে। সেইজন্যই, আল্লাহ্ যখন মানুষের দিকে তাকাবেন তখন তিনি মানুষের সেই গুনাহ্কে আর দেখবেন না। এতে মানুষ আল্লাহ্র সংগে তার সম্পর্ক আবার ফিরে পাবে। মানুষের দৈহিক মৃত্যু হলেও কিন্তু তার উপর অনন্ত শাস্তি (আগুনের হ্রদে আল্লাহ্র কাছ থেকে চিরদিনের জন্য আলাদা হয়ে থাকা) আর প্রযোজ্য হবে না।

গুনাহ্‌ের জন্য ঢাকনা (কাফফারা)

কাফফারা গুনাহ্কে ঢেকে দেয়। এতে *পবিত্র, ন্যায়বান ও ধার্মিক* আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্র আইন গুনাহের শাস্তি হিসেবে মৃত্যু দাবী করে। আল্লাহ্ যখন নিষ্পাপ পশুর মৃত্যু দেখতে পান তখন তিনি এজন্য সন্তুষ্ট হতেন যে, তাঁর আইন বা শরীয়তের দাবী-দাওয়া পূরণ করা হয়েছে।

কোরবান-গাহের উপরে পশু কোরবানীর দ্বারা গুনাহ্ দূর হয়ে যেত না। মানুষের মধ্যে গুনাহ্ থেকেই যেত। গুনাহের মাফ পাওয়ার জন্য যে মৃত্যু এবং রক্তপাতের প্রয়োজন আছে, কোরবানী ছিল কেবল তারই ছবি। সেই রক্তে গুনাহ্ *ঢাকা* পড়ত। সত্যিকার অর্থে, আল্লাহ্ যেভাবে গ্রহণযোগ্য পোষাক দিয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার উলংগতা ঢেকেছিলেন, ঠিক সেইভাবেই মানুষের গুনাহ্কেও রক্ত দ্বারা ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্যই মানুষ আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। তাই এই কথা বললে ভুল বলা হবে না যে, মাবুদ আল্লাহ্ এমনভাবে মানুষের গুনাহ্কে কিছুদিনের জন্য উপেক্ষা করেছিলেন যেন তা "নিশ্চিহ্ন" হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ্র উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়ে মানুষ গুনাহ্‌ের মাফ এবং আল্লাহ্র সাথে একটি নতুন সম্পর্ক পাবে। বদলী মৃত্যু ও কাফফারা হিসাবে গাহ্-এর উপরে রক্ত দেওয়ার দ্বারা তা দেখানো হয়েছে।

আমাদের মনে আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ পরিষ্কার হওয়ায় এখন আমরা আবার হাবিল ও কাবিলের গল্পে ফিরে যাব।

দু'টি কোরবানী

হাবিল ভেড়ার পাল চরাত আর কাবিল জমি চাষ করত। পরে এক সময়ে কাবিল মাবুদের কাছে তার জমির ফসল এনে কোরবানী করল। হাবিলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:২-৪ আয়াত)

কাবিল ও হাবিল উভয়ে মাবুদের সামনে তাদের কোরবানী এনেছিল। আল্লাহ্ চেয়েছিলেন তারা যেন তাদের কাজ দিয়ে তাঁকে দেখায় যে, তারা তাঁর কালামকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু একটা সমস্যা হয়েছিল। যদিও তারা উভয়ে নিজ নিজ কোরবানী এনেছিল, তবুও তাদের কোরবানীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ফুটে উঠেছিল।

কোরবানীর জন্য হাবিল এনেছিল একটি পশু, যেটিকে হত্যা করে রক্তপাত করা সম্ভবপর ছিল। আল্লাহ্ ঠিক এই কাজটিই করতে বলেছিলেন। অন্যদিকে কাবিল কোরবানীর জন্য তার জমির ফল ও শাক-সব্জি এনেছিল। শাক-সব্জি থেকে কোন রক্তপাত হয় না। যদিও কাবিল তা "কোরবানী" করেছিল কিন্তু সেই কোরবানী ছিল ভুল।[১] তার মা-বাবা যেভাবে ডুমুর গাছের পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জা ও গুনাহ্ ঢেকেছিলেন, সেভাবে সেও নিজের বুদ্ধিতে জমির ফসল দিয়ে কোরবানী করেছিল।

প্রত্যাখ্যান

> *মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:৪,৫ আয়াত)*

আল্লাহ্ কাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেন নি। কাবিল দু'টি ভুল করেছিল-

প্রথমতঃ তার কাজে প্রকাশ পেয়েছিল সে সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে নি।

দ্বিতীয়তঃ কাবিল তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করেছিল। কিভাবে তাঁর চোখে সঠিক হওয়া যাবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ্ কারও ব্যক্তিগত ধারণা গ্রহণ করেন না। এ ব্যাপারে হয়ত মানুষের সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্য থাকতে পারে বা মানুষ খুবই আন্তরিক হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র ও মানুষের মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক ফিরে আসে না।

প্রায় সময়ই আমরা মনে করি স্বাধীন চিন্তা ভাল। কিন্তু আমাদের সতর্ক হওয়া দরকার। যে লোকের স্বাধীন মনোভাব আছে, সে একজন আত্মকেন্দ্রিক লোকও হতে পারে। একজন লোক যখন চিন্তা করে, *"আমি নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নেব"* তখন সেই চিন্তাটি সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলে। লোকেরা প্রশ্ন করতে পারে, "কে সঠিক এবং কে বেঠিক? কে পাবে এবং কে পাবে না? কিভাবে আমরা দেশ পরিচালনা করব?" আসলে এ ধরনের মনোভাবের দরুন অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

কাবিল নিজেই নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সেও তার মা-বাবার মত একই ভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশের অবাধ্য হয়েছিল। সে মনে করেছিল সে আল্লাহ্‌র চেয়েও জ্ঞানী।

গ্রহণীয়তা

কিন্তু যে ধরনের কোরবানী দিতে আল্লাহ্ হুকুম দিয়েছিলেন, হাবিল সে ধরনের কোরবানী দান করেছিল। সে একটি পশু কোরবানী করেছিল, অর্থাৎ একটি পশুর রক্তপাত করেছিল। হাবিল জানত তার গুনাহের জন্য তারই মরা উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ রহম করে একটি বদলী হিসাবে তার জায়গায় সেই পশুটিকে মরতে দিয়েছিলেন। হাবিল তার কোরবানীটি আল্লাহ্‌র সামনে রেখেছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল "একজন নাজাতদাতা" পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন এবং গুনাহের ভীষণ শাস্তি থেকে কোন এক ভাবে তাকে রক্ষা করবেন। কিভাবে সেই নাজাতদাতা এসে সেই দায়িত্ব পালন করবেন, সে ব্যাপারে হাবিল জানত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে, গুনাহ্ সমস্যা সমাধানের জন্য সে আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করছিল।

> *ঈমানের জন্য (দরুন) কাবিলের চেয়ে হাবিলের কোরবানী আল্লাহ্‌র চোখে আরও ভাল ছিল। তাঁর ঈমানের জন্যই আল্লাহ্ তাঁর কোরবানী কবুল করে তাঁর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি ধার্মিক।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১১:৪ আয়াত)*

যেহেতু হাবিল ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে এসেছিলেন, তাই তার কোরবানীটি গুনাহের কাফফারা/ঢাকনা হয়েছিল। আল্লাহ্ যখন হাবিলের দিকে তাকালেন তখন তিনি আর তার গুনাহ্ দেখেন নি। এক অর্থে তিনি তা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এখন হাবিলের পক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে আসা সম্ভবপর হল।

আল্লাহ্‌র নরম স্বভাব

কিন্তু কাবিল আল্লাহ্‌তে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

> *...এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল।*
>
> *এই অবস্থা দেখে মাবুদ কাবিলকে বললেন, "কেন তুমি রাগ করেছ আর কেনই বা মুখ কালো করে আছ? যদি তুমি ভাল কাজ কর*

তাহলে কি তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না? কিন্তু যদি ভাল কাজ না কর তবে তো গুনাহ্ তোমাকে পাবার জন্য তোমার দরজায় এসে বসে থাকবে; কিন্তু তাকে তোমার বশে আনতে হবে।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:৫-৭ আয়াত)

আল্লাহ্ শান্তভাবে কাবিলকে এই শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন যে, তার গুনাহ্ স্বভাবই তাকে ধ্বংস করবে। তিনি কাবিলের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, কাবিল যদি হাবিলের মত করে তাঁর কাছে কোরবানী দিত, তাহলে তার কোরবানীও তিনি গ্রহণ করতেন। কাবিল আল্লাহ্কে কি জবাব দিয়েছিল তা পাক-কিতাবে উল্লেখ নেই। কিন্তু লেখা আছে সে তার মুখ কালো করে রইল।

প্রশ্ন আর প্রশ্ন

এর পর একদিন মাঠে থাকবার সময় কাবিল তার ভাই হাবিলের সংগে কথা বলছিল, আর তখন সে হাবিলকে হামলা করে হত্যা করল।

তখন মাবুদ কাবিলকে বললেন, "তোমার ভাই হাবিল কোথায়?।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:৮,৯ আয়াত)

আদন বাগানে আল্লাহ্ যেভাবে হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে প্রশ্ন করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তিনি কাবিলকেও প্রশ্ন করেছিলেন। কাবিলকে আল্লাহ্র এসব প্রশ্ন করার দরকার ছিল না। তিনি জানতেন কি ঘটেছিল। তিনি সব কিছুই জানেন। আসলে তিনি কাবিলকে তার গুনাহ্ স্বীকার করার একটা সুযোগ দিচ্ছিলেন। কিন্তু হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার মত কাবিলের কথা তার অন্তরের গুনাহ্ প্রকাশ করেছিল। তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ ৪ঃ৯,১০ আয়াতে দেওয়া আল্লাহ্ ও কাবিলের মধ্যেকার কথাবার্তা লক্ষ্য করুন।

মাবুদঃ *'তোমার ভাই হাবিল কোথায়?'*

কাবিলঃ *'আমি জানি না। আমার ভাইয়ের দেখাশোনার ভার কি আমার উপর?'*

মাবুদঃ *'এ তুমি কি করেছ?' দেখ, জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমার কাছে কাঁদছে।"*

গুনাহ্ লুকানো সম্ভব নয়। কাবিল তার ভাইকে খুন করেছিল। তারপর সে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে যে খুন করেছে, আল্লাহ্ সেই প্রমাণ দিয়েছিলেন। পাক-কিতাবে উল্লেখ নেই খুন করার পর কাবিল অনুশোচনা করেছিল কিনা। আল্লাহ্ কাবিলকে ধ্বংস করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার উপর রহম করলেন। তিনি তাকে একটি নতুন জায়গায় সরিয়ে নিলেন। শুরু থেকেই মানুষের অবাধ্যতা ও গুনাহ্ চলছিল।

শিস [১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া সময়রেখা দেখুন]

> *পরে আদম আবার তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর একটি ছেলে হল। তাঁর স্ত্রী তার নাম রাখলেন শিস। হাওয়া বললেন, "কাবিল হাবিলকে খুন করেছে বলে আল্লাহ্ হাবিলের জায়গায় আমাকে আর একটি সন্তান দিলেন।"*
>
> *পরে শিসের একটি ছেলে হল। তিনি তার নাম রাখলেন আনুশ। সেই সময় থেকে লোকেরা মাবুদের এবাদত করতে শুরু করল।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৪:২৫,২৬ আয়াত)*

শিস *গুনাহ্ স্বভাব* নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও হাবিলের মত তাঁর আল্লাহ্র উপর ঈমান ছিল। শিস এবং তাঁর বংশধরদের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ সেই ***নাজাতদাতাকে*** পাঠাবেন। আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য তাঁর ওয়াদা রক্ষা করে চলছিলেন।

মৃত্যু

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে হযরত আদমের পরিবারটি ছিল বড়। অনেক বছর পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করে মানুষ তখন সূর্যের প্রবল রশ্মির হাত থেকে সুরক্ষিত ছিল। আর তাই বর্তমান দুনিয়ার লোকের চেয়ে তখনকার লোকেরা বেশী দিন বাঁচত। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে একজন লোকের আয়ু নির্ধারিত হয় তার জীন (বংশগত কাঠামো) দ্বারা। প্রাথমিক অবস্থায় সেই জীনের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। এই পরিবর্তনের একটি কারণ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, কারণ যা-ই হোক না কেন, পাক-কিতাব বলে শেষে হযরত আদম মারা গেলেন।

> *"শিসের জন্মের পর আদম আরও আটশো বছর বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর আরও ছেলেমেয়ের জন্ম হয়েছিল। মোট ন'শো ত্রিশ বছর বেঁচে থাকবার পর আদম ইন্তেকাল করলেন।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৫:৪,৫ আয়াত)*

গুনশিস এবং কাবিল কাকে বিয়ে করেছিল?

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার আরও ছেলে ও মেয়ে ছিল। অনুমান করা হয় ইতিহাসের সেই সময়টায় ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ হত। ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহে তখন তেমন ক্ষতিকর প্রভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে কিতাবুল মোকাদ্দসে এই ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মৃত্যুর পর হাবিলের অবস্থা কি হয়েছিল?

মারা যাওয়ার পরে হাবিলের রূহ্ কোথায় গিয়েছিল সে বিষয়ে পাক-কিতাব সুনির্দিষ্ট ভাবে আমাদের কিছু বলে না। তবে কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয় যে, মারা যাওয়ার পরে সব ঈমানদাররা *বেহেশতে* যায়। ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য আল্লাহ্ এই স্থানটি প্রস্তুত করেছেন।

বেহেশত সম্পর্কে পাক-কিতাবে বেশি কিছু বলা হয় নি, কারণ আমরা মানুষেরা হয়ত সে বিষয়ে ভালভাবে বুঝতে পারব না। আল্লাহ্ একজন নবীকে বেহেশতের বিষয়ে একটি দর্শন দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। তারপরে এই নবী তাঁর-দেখা বেহেশতকে ছবির মত করে বর্ণনা করেছেন। যখন আপনি ছয় দিনে সৃষ্টি করা আল্লাহ্‌র এই সুন্দর দুনিয়ার কথা চিন্তা করবেন তখন বেহেশতে তাঁর লোকদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করছেন, সে বিষয়ে কল্পনা করাটা আরও কঠিন হবে। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে বেহেশত হল এমন বাস্তব স্থান, যেখানে বাস্তব লোকেরা বাস করেন। এটি আদন বাগানের মত হলেও তার চেয়েও আরও ভাল জায়গা।

সেখানে মানুষের গুনাহ্-স্বভাব আর দেখা যাবে না।

> *নাপাক কোন কিছু কিম্বা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন-কিতাবে লেখা আছে তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:২৭ আয়াত)*

মানুষ নির্দোষ হবে আর তাতে আল্লাহ্‌র কাছে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। নবী দাউদ তাঁর মাবুদকে কি অবস্থায় দেখবেন সে সম্পর্কে তাঁর চিন্তার কথা লিখেছিলেন এভাবে-

> *কিন্তু আমি যেন নির্দোষ হয়ে তোমার সামনে থাকতে পারি, যাতে মৃত্যু থেকে জেগে উঠে তোমাকে দেখে আমি আনন্দ পাই।*
>
> *(জবুর শরীফ ১৭:১৫ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের যে অনন্য সম্পর্ক ছিল, তা আবার ফিরে আসবে।

> *এখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা হয়েছে। তিনি মানুষের সংগেই থাকবেন এবং তারা তাঁরই বান্দা হবে। তিনি নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের আল্লাহ্ হবেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:৩ আয়াত)*

জীবনের সব কিছুই হবে সুন্দর ও নিখুঁত।

> *তিনি [আল্লাহ্] তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু*

শেষ হয়ে গেছে। যিনি সেই সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, “দেখ, আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরী করছি।”
(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:৪,৫ আয়াত)

সেখানে কোন মৃত্যু থাকবে না, কারও মধ্যেকার সম্পর্ক ভেঙ্গে যাবে না বা ব্যথা ভরা অন্তরে কাউকে বিদায় জানাতে হবে না। কোন হাসপাতাল থাকবে না বা কেউ গৃহহীন হবে না, কোন পঙ্গুত্ব, কোন রোগ-পীড়া থাকবে না, কাউকে ক্রাচে কিংবা লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হবে না। বরং বেহেশত হবে সীমাহীন সুখ ও আনন্দের স্থান।

তোমার দরবারে থাকায় আছে পরিপূর্ণ আনন্দ আর তোমার ডান পাশে রয়েছে চিরকালের সুখ। *(জবুর শরীফ ১৬:১১ আয়াত)*

সময় ও স্থানে আমাদের দেহকে সীমাবদ্ধ করা হবে না। মুহূর্তের মধ্যে আমরা যেকোন স্থানে চলে যেতে পারব। এই দুনিয়াতে থাকবার সময় আমরা যাদেরকে চিনতাম এবং যাদের কথা শুনতাম, আমরা তাদেরকে চিনতে পারব।

বেহেশতের একটি অংশ জুড়ে থাকবে একটি বিরাট শহর। কেউ কেউ হিসাব করেছেন যে, সেই শহরের কেবলমাত্র ২৫% জায়গা ব্যবহার করলেই তাতে ২০০০ কোটি লোক স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবে। এই শহরকেই বলা হয় নতুন জেরুজালেম।

...পবিত্র শহর জেরুজালেম... তিনি আমাকে তা দেখালেন। সেই শহরের উজ্জ্বলতা খুব দামী পাথরের উজ্জ্বলতার মত, স্ফটিকের মত পরিষ্কার হীরার মত। সেই শহরের একটা বড় উঁচু দেয়াল ছিল ও তাতে বারোটা দরজা ছিল, আর সেই দরজাগুলোতে বারোজন ফেরেশতা ছিলেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:১০-১২ আয়াত)*

দিনের বেলা শহরের দরজাগুলো কখনও বন্ধ থাকবে না; আর সেখানে রাতও হবে না। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১:২৫ আয়াত)*

শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনায় তৈরী ছিল।
(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২১ঃ২১ আয়াত)

তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে জীবন পানির নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চক্‌চকে ছিল এবং আল্লাহ্‌র ও মেষ-শাবকের সিংহাসনের কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২২:১ আয়াত)*

এরকম শহর আমরা আগে কখনও দেখি নি। সেখানে কোন কিছুই দূষিত হবে না, কোন মরিচা ধরবে না, কোন কিছু ক্ষয় হবে না। সেখানে কোন চোর-ডাকাত থাকবে না এবং কোন অপরাধ কাজ সংঘটিত হবে না। এই শহরটি

হবে সম্পূর্ণ রূপে সুন্দর। বেহেশতবাসী প্রত্যেক লোকই সেখানে অনন্ত কাল ধরে বাস করবে।

> *রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ২২:৫ আয়াত)*

> *...আমি চিরকাল মাবুদের ঘরে বাস করব।* *(জবুর শরীফ ২৩:৬ আয়াত)*

নীচের দেওয়া কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াতটি দিয়ে আমরা এই পাঠ শেষ করব। এই আয়াতে লেখা আছে যে, ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ পরিকল্পনা আছে।

> *আল্লাহ্‌কে যারা মহব্বত করে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ২:৯ আয়াত)*

৩ ইদ্রিস নবী

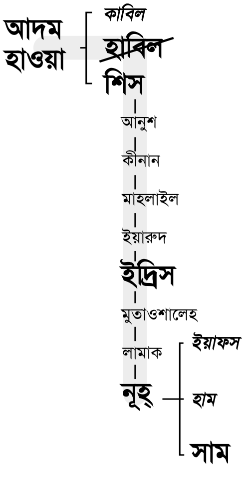

কিতাবুল মোকাদ্দসে শিসের পরে তাঁর বংশধরদের সম্পর্কে বেশী উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু একজন ব্যক্তির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর নাম হল *ইদ্রিস*। ইদ্রিস ছিলেন একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র আল্লাহ্‌ই তাঁকে গুনাহের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেন। কিতাবুল মোকাদ্দসে তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে-

> *আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল বলে আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছেই নিয়ে গিয়েছিলেন।*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৫:২৪ আয়াত)*

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে ইদ্রিস নবীর ঈমান এত গভীর ছিল যে, আল্লাহ্ তাঁকে সরাসরি বেহেশতে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইদ্রিস নবী কখনও মরেন নি। কিতাবুল মোকাদ্দসের আরেকটি জায়গায় আরেকজন লোকের কাহিনী আছে। তিনিও মারা যান নি কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে সরাসরি চলে গিয়েছিলেন। পরে আমরা ঈমান সম্পর্কে এবং আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কেন এই ঈমান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সে সম্পর্কে আরও শিখব।

> *ঈমানের জন্যই ইদ্রিস মারা যান নি; তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। ইদ্রিসকে নিয়ে যাবার আগে আল্লাহ্ এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ইদ্রিস তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। ঈমান ছাড়া আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ আল্লাহ্র কাছে যে যায়, তাকে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন এবং যারা তাঁর ইচ্ছামত চলে তারা তাঁর হাত থেকে তাদের পাওনা পায়।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইব্রানী ১১:৫,৬ আয়াত)*

উপরের আয়াত দু'টির শেষের বাক্যটি একটি ভাল সারাংশ। আল্লাহ্র কাছে আসার জন্য একজন লোককে অবশ্যই ঈমান আনতে হবে আল্লাহ্ আছেন, আর আল্লাহ্ নিজেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করার পথ পরিষ্কার করবেন।

৪ নূহ নবী

অনেক লোক চিন্তা করে কিতাবুল মোকাদ্দসে একটার পর একটা অলৌকিক কাজের উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই নেই। আসলে কিতাবুল মোকাদ্দসের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এসব অলৌকিক কাজের কথা কেবল সামান্য একটি অংশ জুড়ে রয়েছে। কোন একটি অলৌকিক কাজ বা বিশেষ ঘটনা ঘটার পূর্বে শত শত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যেত। যেমন আমরা যখন নূহ নবীর কাহিনীতে আসি, তখন দেখতে পাই ১০টি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি প্রজন্মের লোকই কয়েক শত বছর বেঁচে ছিল। সেই সময় পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শত শত বছর পার হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তাঁর *ওয়াদা-করা নাজাতদাতা* পাঠানোর বিষয়টি ভুলে যান নি। প্রতিটি প্রজন্মেই এমন কিছু লোক ছিল যারা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত। দুর্ভাগ্যবশত দুনিয়ার লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, আল্লাহ্র উপর বিশ্বাসকারী লোকের সংখ্যা কিন্তু সে হারে বৃদ্ধি পায় নি। কিতাবুল মোকাদ্দসে উল্লেখ আছে যে, খুব কম লোকই ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত।

সহিংসতা

মানুষ কেবল আল্লাহ্কেই অস্বীকার করে নি কিন্তু নিজেদের সমস্ত ইচ্ছা ও শক্তি দিয়ে শয়তানকে অনুসরণ করেছে। পাক-কিতাব বলে-

> *মাবুদ দেখলেন দুনিয়াতে মানুষের নাফরমানী খুবই বেড়ে গেছে, আর তার দিলের সব চিন্তা-ভাবনা সব সময়ই কেবল খারাপীর দিকে ঝুঁকে আছে।*

সেই সময় আল্লাহ্‌র কাছে সারা দুনিয়াটাই গুনাহের দুর্গন্ধে এবং জোর-জুলুমে ভরে উঠেছিল। আল্লাহ্‌ দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ দুনিয়ার মানুষের স্বভাবে পচন ধরেছে।"
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:৫,১১,১২ আয়াত)

বর্তমানে মানুষ টেলিভিশনে যুদ্ধ, সহিংসতা, খুনোখুনি, নৈরাজ্য ও ধর্ষণের খবরগুলো দেখে। নূহের সময়েও ঠিক এই রকম অবস্থা ছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে মানুষ সব সময় শুধু খারাপীর বিষয়ে চিন্তা করত। অস্বাভাবিকতার প্রতি প্রবণতা ও বিশৃংখলাই সেই সময় মানুষের জীবন-রীতি হয়ে উঠেছিল। দুনিয়াটা বসবাসের অনুপযোগী ও বিপদজনক হয়ে পড়েছিল।

এছাড়াও সেই সময়কার সমাজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল।[২] মানুষ আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নিজের ইচ্ছামত চলার একটা রাস্তা বের করেছিল। এতে তাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ্‌কে অনুসরণ ও খোঁজ করার আকাংখা চলে গিয়েছিল। মানুষের মন থেকে ধার্মিকতা অনেক দূরে ছিল। তাদের চিন্তাগুলো ছিল গুনাহ্‌পূর্ণ।

"মানুষ তাঁর সম্বন্ধে জানবার পরেও আল্লাহ্‌ হিসাবে তাঁর প্রশংসাও করে নি, তাঁকে কৃতজ্ঞতাও জানায় নি। তাদের চিন্তাশক্তি অসার হয়ে গেছে এবং তাদের বুদ্ধিহীন দিল অন্ধকারে পূর্ণ হয়েছে। যদিও তারা নিজেদের জ্ঞানী বলে দাবি করেছে তবুও আসলে তারা মুর্খই হয়েছে। চিরস্থায়ী, মহিমাপূর্ণ আল্লাহ্‌র এবাদত ছেড়ে দিয়ে তারা অস্থায়ী মানুষ, পাখী, পশু ও বুকে-হাঁটা প্রাণীর মূর্তির পূজা করেছে।

এইজন্য আল্লাহ্‌ মানুষকে তার দিলের কামনা-বাসনা অনুসারে জঘন্য কাজ করতে ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা একে অন্যের সংগে জঘন্য কাজ করে নিজেদের শরীরের অসম্মান করেছে। আল্লাহ্‌র সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই। আমিন।

মানুষ এই সব করেছে বলে আল্লাহ্‌ লজ্জাপূর্ণ কামনার হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। স্ত্রীলোকেরা পর্যন্ত পুরুষদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহারের বদলে অন্য স্ত্রীলোকদের সংগে অস্বাভাবিক ভাবে খারাপ কাজ করেছে। পুরুষেরাও ঠিক তেমনি করে স্ত্রীলোকদের সংগে তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে পুরুষদের সংগে কামনায় জ্বলে উঠেছে; পুরুষ পুরুষের সংগে লজ্জাপূর্ণ খারাপ কাজ করেছে।

ফলে তারা প্রত্যেকেই তার অন্যায় কাজের পাওনা শাস্তি নিজের মধ্যেই পেয়েছে। এইভাবে মানুষ আল্লাহ্‌কে মানতে চায় নি বলে আল্লাহ্‌ও

গুনাহ্‌পূর্ণ মনের হাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছেন, আর সেইজন্যই মানুষ অনুচিত কাজ করতে থাকে।

সব রকম অন্যায়, খারাপী, লোভ, নীচতা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা ও অন্যের ক্ষতি করবার ইচ্ছায় তারা পরিপূর্ণ। তারা অন্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, অন্যের নিন্দা করে এবং আল্লাহ্‌কে ঘৃণা করে। তারা বদমেজাজী, অহংকারী ও গর্বিত। অন্যায় কাজ করবার জন্য তারা নতুন নতুন উপায় বের করে। তারা মা-বাবার অবাধ্য, ভাল-মন্দের জ্ঞান তাদের নেই, আর তারা বেঈমান। পরিবারের প্রতি তাদের ভালবাসা নেই এবং তাদের দিলে দয়ামায়া নেই। আল্লাহ্‌র এই বিচারের কথা তারা ভাল করেই জানে যে, এই রকম কাজ যারা করে তারা মৃত্যুর শাস্তির উপযুক্ত। এই কথা জেনেও তারা যে কেবল এই সব কাজ করতে থাকে তা নয়, কিন্তু অন্য যারা তা করে তাদের সায়ও দেয়।"[৩] *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ১:২১-৩২ আয়াত)*

পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় ইতিহাসের সেই সময়ে মানুষ অনেক গুনাহ্‌পূর্ণ কাজ করেছিল। মানুষ তাদের নিজেদের রূহ্‌কে গুনাহ্‌পূর্ণ জীবনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা পড়েছি গুনাহের পরিণতি আছে। সব সময়ই গুনাহের পরিণতি থাকে। আমরা যখন মধ্যাকর্ষণ নিয়মকে অমান্য করি তখন আমাদের শরীরে আঘাত লাগে, ঝাঁকুনী খেয়ে আমরা নীচে পড়ে যাই এবং আমাদের হাড়গোড়ও ভেঙ্গে যায়। একই ভাবে আমরা যখন আল্লাহ্‌র নিয়মকে অমান্য করি, তখন তার মারাত্মক পরিণতি হয়। আল্লাহ্ গুনাহ্‌কে সায় দিয়ে থাকতে পারেন নি। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে গুনাহের দরুন আল্লাহ্ মনে কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন-

"আমার সৃষ্ট মানুষকে আমি দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেলব ...।"
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:৭ আয়াত)

তখন মানুষ হয়ত তাদের জীবন দর্শন থেকে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়েছিল, তথাপি আল্লাহ্ মানুষকে তার গুনাহ্‌পূর্ণ আচরণের জন্য দায়ী করেছিলেন।

নূহ নবী [১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া সময়রেখা দেখুন]
কিন্তু একজন লোক ও তাঁর পরিবার ছিল অন্য রকমের। পাক-কিতাব বলে...

নূহের উপরে মাবুদ সন্তুষ্ট রইলেন। ...নূহ একজন সৎ লোক ছিলেন। তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন খাঁটি। আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর যোগাযোগ-সম্বন্ধ ছিল। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:৮,৯ আয়াত)*

নূহ নবী সৎ জীবনযাপন করলেও আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেয় তিনি ছিলেন গুনাহ্‌গার। *গুনাহ্ ও মৃত্যুর আইন* অনুসারে নূহ নবীকে সেই গুনাহের কারণে

মরতে হবে। কিন্তু পাক-কিতাব এও বলে যে, তিনি একটি পশু কোরবানী করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এনেছিলেন। এ থেকে প্রমাণ হয় তাঁর গুনাহের শাস্তির মূল্য দেওয়ার জন্য একটি নিষ্পাপ বদলীর প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। নূহ নবী বিশ্বাস করতেন কোন না কোন ভাবে মাবুদ তাঁকে গুনাহের পরিণতি থেকে রক্ষা করবেন। পাক-কিতাব বলে নূহ নবী আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন বলেই আল্লাহ্ তাঁকে ধার্মিক বলে ধরেছিলেন। মাবুদের সংগে তাঁর সঠিক সম্পর্ক ছিল। পাক-কিতাব এটাকে ব্যাখ্যা করেছে এইভাবে- *"আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর যোগাযোগ সম্বন্ধ ছিল।"*

> *এই অবস্থা দেখে আল্লাহ্ নূহকে বললেন, "গোটা মানুষ জাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোর-জুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সংগে দুনিয়ার সব কিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরী কর। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভিতরে আল্‌কাত্‌রা দিয়ে লেপে দেবে।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:১৩,১৪ আয়াত)*

মুক্তির উপায়

আল্লাহ্ নূহ নবীকে জাহাজের মত বড় আকৃতির একটি নৌকা তৈরী করতে বলেছিলেন। বর্তমানের জাহাজের মত সেই জাহাজে কয়েকটি তলা ছিল। এর ভিতরে বাতাস চলাচল করতে পারত। আর সেটির দরজা ছিল মাত্র একটি। সেটি ছিল কাঠ দিয়ে তৈরী, ফুটো বা ফাঁক বন্ধ করার জন্য তাতে আলকাত্‌রা লেপে দেওয়া হয়েছিল।[৪] ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত নূহের জাহাজটিই ছিল মানুষের বানানো সবচেয়ে বড় জাহাজ। ১৮৪৪ সালে 'গ্রেট ব্রিটেন' নামে প্রায় নূহের জাহাজের মত একই আকৃতির একটি জাহাজ তৈরী করা হয়েছিল। এখন পর্যন্ত নূহের জাহাজকেই নিশ্চল জাহাজের উৎকৃষ্ট উদাহরণ রূপে বিবেচনা করা হয়। দ্রুত গতিতে চলার জন্য নূহের জাহাজ তৈরী করা হয় নি। এটি তৈরী করা হয়েছিল জীবন্ত প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য। আল্লাহ্ হযরত নূহকে বলেছিলেন-

> *"আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব যাতে আসমানের নীচে যে সব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে।*
>
> *কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা* স্থাপন করব।*
>
> *তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সংগে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেদের স্ত্রীরা।*
>
> *তোমার সংগে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক*

* একটি চুক্তি বা ওয়াদা

জাতের পাখী, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পার; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিষ জোগাড় করে মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার ও তাদের খাবার। নূহ তা-ই করলেন।

আল্লাহ্‌র হুকুম মত তিনি সব কিছুই করলেন।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:১৭-২২ আয়াত)

বাধ্যতা

আল্লাহ্‌র কথা বিশ্বাস করতেন বলেই নূহ নবী আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও জাহাজ বানানোর বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ সহজতর ছিল না। এর আগে নূহ নবী কখনও কোন জাহাজই তৈরী করেন নি, এত বড় জাহাজ তৈরী তো দূরের কথা।

আল্লাহ্ নূহ নবীকে বলেছিলেন বন্যা আরম্ভ হতে আরও ১২০ বছর বাকী।[৫] সেই ১২০ বছর ধরে নূহ নবী শুধু সেই জাহাজ নির্মাণের কাজই তদারকি করেন নি, কিন্তু যারা তাঁর কথা শুনতে আসত, তাদের সবাইকে সেই আসন্ন বিচারের বিষয়ে সতর্কও করেছিলেন।[৬]

"এর পরে মাবুদ নূহকে আবার বললেন, তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে উঠবে। আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনকার লোকদের মধ্যে কেবল তুমিই সৎ আছ।"

মাবুদের হুকুম মতই নূহ সব কাজ করলেন। ...যেদিন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল সেই দিন নূহ, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলে সাম, হাম ও ইয়াফস এবং তাঁর তিন ছেলের স্ত্রীরা গিয়ে জাহাজে উঠেছিলেন।

তাঁদের সংগে প্রত্যেক জাতের এক এক জোড়া করে বন্য ও গৃহপালিত পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী আর সব রকম পাখীও উঠেছিল। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা সব প্রাণীই জোড়ায় জোড়ায় নূহের কাছে জাহাজে গিয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্ নূহকে হুকুম দেবার সময় যা বলেছিলেন সেই অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ মিলেই তারা উঠেছিল। এর পর মাবুদ জাহাজের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৭:১,৫,১৩-১৬)*

এক দরজা

জীবজন্তুর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, সেগুলোকে জাহাজে তুলতেই ৭দিন লেগেছিল। কয়েকটি ব্যতিক্রম* ছাড়া, প্রত্যেকটি জাতের পশু বা পাখিদের মধ্য থেকে নূহ নবী কেবল এক জোড়া করে পশু বা পাখি জাহাজে ভরে ছিলেন। এসবের মধ্যে ছিল এমন সব

* আল্লাহ্ নূহ নবীকে সব "পাক জীবজন্তু" (যেগুলো কোরবানীর জন্য উপযুক্ত) থেকে সাত জোড়া করে জাহাজে উঠাতে বলেছিলেন। দেখুন তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৭ঃ২,৩ এবং ৮ঃ২০ আয়াত।

পশু-পাখি যেগুলো এখন বিলুপ্ত, কিন্তু সব পশু-পাখির জন্য সে জাহাজটি ছিল যথেষ্ট বড়। কিতাবুল মোকাদ্দসের বিবরণগুলো দেখে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন তবুও সেই জাহাজের মাত্র ৬০% জায়গা ছিল জীবজন্তুতে পূর্ণ। সম্ভবতঃ জাহাজের বাদবাকী স্থান ছিল খাদ্যে বোঝাই। জায়গার সদ্ব্যবহার করার জন্য হয়ত বাচ্চা জীব-জন্তু ঢুকানো হয়েছিল। হতে পারে, কিছু কিছু প্রাণী শীতকালের মত নির্জীব অবস্থায় ছিল। অবশ্যই আল্লাহ্ নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনভাবেই পশু-পাখিদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম ছিলেন।

পশু-পাখিরা ঢোকার পরে আল্লাহ্ সবাইকে জাহাজের ভিতরে বন্ধ করলেন। যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসল এবং পানি বাড়তে আরম্ভ করল, তখন নূহ নবী কারও কাকুতি-মিনতিতে সেই দরজাটি খুললেন না। এমনকি তাঁর পক্ষে সেটা খোলা সম্ভবও ছিল না। তাঁর বা তাঁর পরিবারের লোকদের কারো ভয় ছিল না যে, পানির চাপে দরজা খুলে গিয়ে জাহাজের ভিতরে পানি ঢুকে যাবে। তারা সবাই সম্পূর্ণভাবে নিরাপদে ছিল, কারণ আল্লাহ্ নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেটিই ছিল সুরক্ষার একমাত্র দরজা। যারা তাঁর কথায় ঈমান এনেছিল তাদের তিনি সেই দরজার মধ্যে সুরক্ষিত করে রাখলেন। কিন্তু যারা ঈমান আনে নি তাদের তিনি দরজার বাইরে রাখলেন যাতে তারা সুরক্ষা না পায়।

আল্লাহ্ দয়াবান। তিনি গুনাহ্ থেকে মন ফেরাতে এবং তাঁর রহমতের সুযোগ গ্রহণ করতে মানুষকে ১২০ বছর সময় দিয়েছিলেন। এরপরে শাস্তি নেমে এসেছিল। আল্লাহ্ বলেছিলেন এই রকম শাস্তি আসবে। আল্লাহ্ সব সময়ই তাঁর কথা রক্ষা করেন।

> *"নূহের বয়স যখন ছ'শো বছর চলছিল, সেই বছরের দ্বিতীয় মাসের সতেরো দিনের দিন মাটির নীচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগল আর আকাশেও যেন ফাটল ধরল। চল্লিশ দিন আর চল্লিশ রাত ধরে দুনিয়ার উপরে বৃষ্টি পড়তে থাকল।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৭:১১-১২ আয়াত)*

পানির ঝর্ণা ও আকাশের ফাটল

প্রথমতঃ, ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে গিয়ে মাটির নীচস্থিত বিশাল পরিমাণ পানি বের করে দিল। পাক-কিতাব বলে, *"মাটির নীচের সমস্ত পানি হঠাৎ বের হয়ে আসতে লাগল।"* কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন সেই নীচের পানিগুলো প্রচুর চাপের ফলে বাষ্পাকারে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল। তারপরে তা বায়ুমণ্ডলের পানির সাথে মিশে আবার এমন ভাবে নীচে নেমে এসেছিল যেন *"আকাশে ফাটল ধরল।"*

এই ঘটনাকে বর্ণনা করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে হল *ধ্বংসকারী বন্যা*। কিতাবুল মোকাদ্দসে এই শব্দটি শুধুমাত্র নূহ নবীর সময়কার এই বন্যা বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এই বন্যায় সারা দুনিয়া ব্যাপী

ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হয়েছিল। এই রকম বন্যা আগে আর কখনও হয় নি। যদিও বন্যার সময়কার অনেক ঘটনা প্রকৃতি বিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই কোন রকম বাধা-নিষেধ ব্যতীত এরকম বন্যা পরিস্থিতি এবং এর আকস্মিক ফলাফল সৃষ্টি করতে পারেন।

৪০ দিন ধরে সেই বৃষ্টিপাত হয়েছিল। কিন্তু নীচের আয়াত থেকে মনে হয় ১৫০ দিন ধরে মাটির নীচে থেকে অবিরত পানি উঠেছিল।

> *তারপর থেকে চল্লিশ দিন ধরে দুনিয়াতে বন্যার পানি বেড়েই চলল। পানি বেড়ে যাওয়াতে জাহাজটা মাটি ছেড়ে উপরে ভেসে উঠল। পরে দুনিয়ার উপরে পানি আরও বেড়ে গেল এবং জাহাজটা পানির উপরে ভাসতে লাগল। দুনিয়ার উপরে পানি কেবল বেড়েই চলল; ফলে যেখানে যত বড় বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল।*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৭:১৭-১৯ আয়াত)*

> *শুকনা মাটির উপর যে সব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা সবাই মরে গেল। আল্লাহ্‌ এইভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী দুনিয়ার উপর থেকে মুছে ফেললেন। তাতে মানুষ, পশু, বুকে-হাঁটা প্রাণী এবং আকাশের পাখী দুনিয়ার উপর থেকে মুছে গেল। কেবল নূহ এবং তাঁর সংগে যাঁরা জাহাজে ছিলেন তাঁরাই বেঁচে রইলেন। দুনিয়া একশো পঞ্চাশ দিন পানিতে ডুবে রইল। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৭:২২-২৪ আয়াত)*

> *জাহাজে নূহ এবং তাঁর সংগে যে সব গৃহপালিত ও বন্য পশু ছিল আল্লাহ্‌ তাদের কথা ভুলে যান নি। তিনি দুনিয়ার উপরে বাতাস বহালেন, তাতে পানি কমতে লাগল। এর আগেই মাটির নীচের সমস্ত পানি বের হওয়া এবং আকাশের সব ফাটলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ*

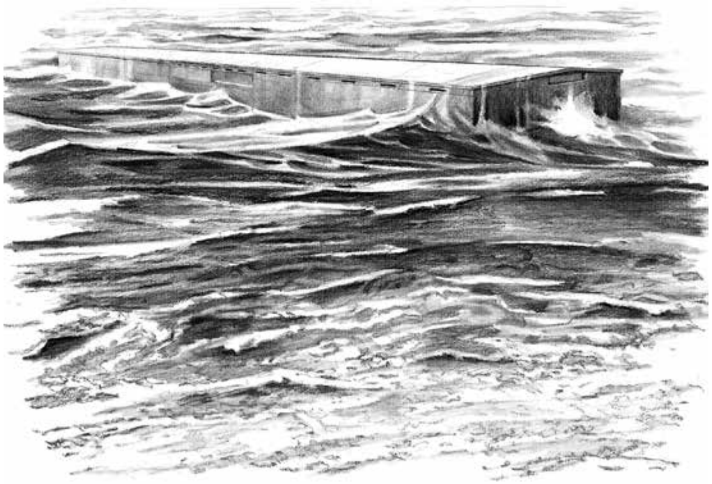

থেকে বৃষ্টি পড়াও থেমে গিয়েছিল। তাতে মাটির উপরকার পানি সরে যেতে থাকল, আর বন্যা শুরু হওয়ার একশো পঞ্চাশ দিন পরে দেখা গেল পানি অনেক কমে গেছে। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৮:১-৩ আয়াত)*

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন বর্তমান কালে যেরকম সুউচ্চ পাহাড়-পর্বত আছে, সেই বন্যার আগে তা ছিল না। বর্তমানে আমরা যদি পৃথিবীর উপরিভাগকে সমান করতে পারতাম তাহলে এখানে স্থিত পানির পরিমাণ এই দুনিয়াকে এমন ভাবে ঢেকে ফেলবে যে, সেই পানির গভীরতা হবে প্রায়ই ২ মাইল বা ৩ কি.মি.। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে বন্যার পরে বর্তমানে আমরা যে পাহাড়গুলো দেখতে পাই, সেগুলো *জেগে উঠেছিল* এবং *সম্ভবতঃ উপত্যকাগুলো নীচু হয়ে গিয়ে* সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল।

তুমি দুনিয়াকে কাপড় দিয়ে ঢাকার মত করে সাগরের পানি দিয়ে ঢেকেছিলে... কিন্তু সেই পানি তোমার হুকুমে চলে গেল... পাহাড়-পর্বত আরও উঁচু হয়ে উঠল, সব উপত্যকা আরও নীচু হয়ে গেল; তুমি যে জায়গা ঠিক করে রেখেছিলে সেগুলো সেই পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাল। এইভাবে তুমি পানির সীমানা ঠিক করে দিয়েছ, যাতে পানি আর কখনও সীমানা ডিংগিয়ে দুনিয়াকে ঢেকে না ফেলে।

(জবুর শরীফ ১০৪:৬-৯ আয়াত)

একটি ভিন্ন দুনিয়া

হযরত নূহ তাঁর পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে জাহাজে ৩৭১ দিন ছিলেন। তারপর আল্লাহ্ সেই জাহাজের দরজা খুলে দিলেন এবং তাদেরকে জাহাজ থেকে বের হতে দিলেন। তার আগেই পানি কমে গিয়েছিল। সেই জাহাজ একটি পাহাড়ী জায়গায় গিয়ে থেমেছিল। নূহ নবী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা যখন জাহাজ থেকে নামলেন তখন ভূমি শুধু শুকনাই ছিল না, কিন্তু গাছে ফুল-ফলও ধরেছিল। এটাকে বন্যার আগের দুনিয়ার চেয়ে ভিন্ন দেখাল। বন্যার পরের সেই দুনিয়া হল আমাদের এই বর্তমান দুনিয়া।

আল্লাহ্ নূহকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীকে আর তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে এস, আর সেই সংগে সমস্ত পশু-পাখী এবং বুকে-হাঁটা প্রাণী, অর্থাৎ যত জীবজন্তু আছে তাদের সকলকেই বের করে নিয়ে এস। আমি চাই যেন দুনিয়াতে তাদের বংশ অনেক বেড়ে যায় এবং বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা তারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠে।"

তখন নূহ তাঁর স্ত্রীকে আর তাঁর ছেলেদের ও তাঁদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বের হয়ে আসলেন।

তারপর নূহ মাবুদের উদ্দেশ্যে একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক জাতের পাক পশু ও পাখী থেকে কয়েকটা নিয়ে সেই কোরবানগাহের উপরে পোড়ানো-কোরবানী দিলেন।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৮:১৫-১৮,২০ আয়াত)

একটি ওয়াদা

জাহাজ থেকে নামার পরে নূহ নবী একটি কোরবান-গাহ্‌ তৈরী করলেন। এটিই ছিল তাঁর প্রথম কাজ। তিনি কয়েকটা নিষ্পাপ পশু নিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পোড়ানো-কোরবানী করলেন। সেই কোরবানীগুলো নূহ নবী বা তাঁর পরিবারের লোকদের গুনাহ্‌ মোচন করে নি, কিন্তু এর দ্বারা দেখানো হয়েছিল গুনাহের শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মৃত্যু এবং রক্তপাত করা দরকার। হযরত নূহের যে আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় ঈমান ছিল, এগুলো ছিল তারই প্রমাণ। নূহ নবী বিশ্বাস করতেন যেকোন ভাবেই আল্লাহ্‌ তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে গুনাহের হাত থেকে রক্ষা করে তাঁর বলা কথা রাখবেন। সেই কোরবানীতে আল্লাহ্‌ খুশী হয়েছিলেন।

আল্লাহ্‌ নূহ আর তাঁর ছেলেদের দোয়া করে বললেন, "তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং দুনিয়া ভরে তোলো।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৯:১ আয়াত)

তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের জন্য ... আমি এখন আমার এই ব্যবস্থা স্থাপন করছি। সেই ব্যবস্থা হল এই যে, "বন্যার পানি দিয়ে আর কখনও সমস্ত প্রাণীকে মেরে ফেলা হবে না এবং গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেবার মত বন্যাও আর হবে না।"

আল্লাহ্‌ আরও বললেন, "যে ব্যবস্থা আমি তোমাদের ও তোমাদের সংগের সমস্ত প্রাণীর জন্য স্থাপন করলাম তা বংশের পর বংশ ধরেই চলবে। সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হিসাবে মেঘের মধ্যে আমি আমার রংধনু দেখাব। এটাই হবে দুনিয়ার জন্য আমার সেই ব্যবস্থার চিহ্ন।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৯:৯,১১-১৩ আয়াত)

আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছিলেন তিনি ভবিষ্যতে আর কখনও দুনিয়াকে বন্যার দ্বারা ধ্বংস করবেন না। যখন বৃষ্টি হবে তখন রংধনুটি সেই ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দেবে। সেই মহাবন্যার পর হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলেও আল্লাহ্‌ তাঁর কথা রেখেছেন।

জাহাজ থেকে নূহের ছেলে সাম, হাম আর ইয়াফস বের হয়ে এসেছিলেন। ...নূহের এই তিন ছেলের বংশধরেরাই সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৯:১৮,১৯ আয়াত)

মানুষ এই সময় নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিল।

মোট সাড়ে ন'শো বছর বেঁচে থাকবার পর তিনি (নূহ) ইন্তেকাল করলেন। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৯:২৯ আয়াত)

ডাইনোসর, জীবাশ্ম, কয়লা ও তেল

কিতাবুল মোকাদ্দসে আমরা *'ডাইনোসর'* শব্দটি দেখতে পাই না। এটি সাম্প্রতিক কালে ব্যবহৃত একটি শব্দ। ১৮৪১ সালে একজন ইংরেজ শরীর বিজ্ঞানী ডাইনোসর আবিষ্কার করেন। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রথম কিতাবগুলোতে বর্তমানে জীবিত নেই এমন বিশাল প্রাণীর উল্লেখ আছে। পাক-কিতাবে দু'টি বিশালাকার প্রাণীর কথা লেখা আছে যাকে ডাইনোসরের জীবাশ্মরূপে বিবেচনা করা হয়।[৭]

কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনা থেকে আমরা বুঝতে পারি আল্লাহ্ ডাইনোসর-গুলোকেও সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষের সাথে বাস করছিল। ডাইনোসরগুলো ছিল দেখতে সরীসৃপের মত। বেশীর ভাগ সরীসৃপই তাদের সারা জীবন ধরে বাড়তে থাকত। যদি তারা বন্যার* আগে মানুষের মত দীর্ঘদিন বাঁচত, তাহলে তাদের আকৃতিও খুবই বিশাল হওয়া সম্ভবপর ছিল।

*অনেক লোক ৯০০ বছরের বেশী বেঁচেছিল

কিতাবুল মোকাদ্দসে লেখা আছে প্রত্যেক জাতের পশু-পাখির মধ্য থেকে দু'টি করে জাহাজে তোলা হয়েছিল। খুব সম্ভব কেবল কম বয়সী জীব-জন্তুদেরই সেই জাহাজে নেওয়া হয়েছিল। এটি করা হয়েছিল প্রথমতঃ জায়গা বাঁচানোর জন্য, দ্বিতীয়তঃ প্রজনন ক্ষমতাকে বন্যা পরবর্তী সময় পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য। একটি ডাইনোসরের গড় আকৃতি ছিল একটি ছোট ঘোড়ার মত এবং জন্মের সময় সবচেয়ে বড় ডাইনোসরের আকৃতি একটি ফুটবলের চেয়ে বড় ছিল না। এই হিসাব আমাদেরকে দেখায় যে, জাহাজে ডাইনোসরদের জন্যও যথেষ্ট জায়গা ছিল।

কেন সব ডাইনোসররা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, আমরা কেবল তার কারণ অনুমান করতে পারি। গত কয়েক দশকে অনেক প্রজাতির প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। এই সাম্প্রতিক সময়েও আমরা এর প্রকৃত কারণ জানি না। আর হাজার হাজার বছর আগের প্রাণীদের বিলুপ্তির কারণ চিন্তা করা তো আরও কঠিন বিষয়। যেহেতু সেই বন্যার পর জলবায়ুর চরম পরিবর্তন হয়েছিল, সেইজন্যই হয়ত ডাইনোসরদের পক্ষে জীবিত থাকাটা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

সেই বন্যার ফলাফল বর্তমানে এই প্রকৃতি জগতের মধ্যে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সেই বন্যার কারণে প্রচুর কাদামাটি ও পলিমাটি হয়েছিল। যে সমস্ত তেল, কয়লা ও জীবাশ্ম আমরা আজকে দেখতে পাই, সেগুলো সেই বন্যার পানি ও মাটির চাপের কারণেও হতে পারে। অনেক জীবাশ্ম থেকে এই চিহ্ন পাওয়া যায় যে, সেই বস্তুগুলো অতি দ্রুত ও আকস্মিকভাবে বড় *কবরস্থানে* সমাধিস্থ হয়েছে। একটি ভালভাবে সংরক্ষিত মাছের

জীবাশ্ম শুধুমাত্র তখনই সম্ভব ছিল যদি সেটিকে দ্রুত কবর দেওয়া হত যাতে অন্য মাছ, ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষয় এটাকে ধ্বংস করতে না পারে। এছাড়াও সেই বন্যাটি যে হয়েছিল তার আরেকটি বড় প্রমাণ আছে। সামুদ্রিক জীবাশ্মগুলোকে পৃথিবীর সব বড় বড় মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণীতে পাওয়া গেছে।

অনেক ভাল ভাল বইয়ে সৃষ্টি-বন্যা বিষয়ক আলোচনার কথা আছে। আমাদের চারপাশে আজকে আমরা যা দেখি, সেই বইগুলোতে সেসব বিষয়ে সুন্দর যুক্তি ও কারণ দেখানো হয়েছে। আপনি যদি এসব বিষয় সম্পর্কে আরও ভালভাবে অধ্যয়ন করতে চান, তাহলে তা করতে পারেন। এই বইয়ের শেষে ‘পরিশিষ্ট’ অংশের ‘গ্রন্থ-তালিকায়’ এমন কিছু বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে।

৫ ব্যাবিল

তৌরাত শরীফের পয়দায়েশ কিতাবের ১০ম রুকুকে প্রায়ই *‘জাতিদের তালিকা’* বলা হয়। এই তালিকা আমাদেরকে বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে বলে। বিভিন্ন জাতি কোথা থেকে এসেছিল, এই রুকুতে সেই সব প্রধান নৃ-গোষ্ঠীগুলো (জাতি) দেখা যায়। এই নৃ-গোষ্ঠীগুলো আরম্ভ হয়েছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন ছেলে সাম, হাম ও ইয়াফসের মধ্য দিয়ে। নীচের আয়াতটি দিয়ে শেষ হয়েছে এই রুকুটি।

> *এরাই হল বংশ এবং জাতি হিসাবে নূহের ছেলেদের বিভিন্ন পরিবার। বন্যার পরে এদের বংশের লোকেরাই বিভিন্ন জাতি হয়ে সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১০:৩২ আয়াত)*

আবারও কয়েকশ’ বছর কেটে গিয়েছিল এবং পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিতাবুল মোকাদ্দসের কাহিনী এবার প্রাচীন মেসোপতেমিয়া (বর্তমান ইরাক) নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এখানেই সভ্যতা শুরু হয়েছিল।

> *তখনকার দিনে সারা দুনিয়ার মানুষ কেবল একটি ভাষাতেই কথা বলত এবং তাদের শব্দগুলোও ছিল একই। পরে তারা পূর্ব দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ব্যাবিলন দেশে একটা সমভূমি পেয়ে সেখানেই বাস করতে লাগল।*
>
> *তারা একে অন্যকে বলল, “চল, আমরা ইট তৈরী করে আগুনে পুড়িয়ে নিই।” এই বলে তারা পাথরের বদলে ইট এবং চুন-সুরকির বদলে*

আল্‌কাত্‌রা ব্যবহার করতে লাগল।" তারা বলল, "এস, আমরা নিজেদের জন্য একটা শহর তৈরী করি এবং এমন একটা উঁচু ঘর তৈরী করি যার চূড়া গিয়ে আকাশে ঠেকবে। এতে আমাদের সুনামও হবে আর আমরা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়েও পড়ব না।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:১-৪ আয়াত)

মানুষের কর্মসূচী

বন্যার পরে আল্লাহ্‌ মানুষকে বলেছিলেন...

তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং দুনিয়া ভরে তোলো। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৯:১ আয়াত)*

মানুষ যে তখন কেবল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা পরিবর্তন করার চেষ্টা করছিল তা নয়, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু যোগও করতে চেয়েছিল।

প্রথমতঃ মানুষের চিন্তা ছিল সব মানুষ একই জায়গায় থাকবে এবং একটি বড় শহর বানাবে। তাদের এরকম চিন্তা ছিল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিপরীতে। আর একবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, মানুষের চিন্তা ছিল সে আল্লাহ্‌র চেয়ে আরও ভাল জানে ঠিক পথ কোনটা।

আমরা বুঝতে পারি অবাধ্যতাই ছিল মানুষের একটা বড় সমস্যা। ছেলেমেয়েরা অবাধ্য হয় কেন? তারা কি এই কাজটি তাদের মা-বাবার কাছ থেকে শিখে? না! অবাধ্যতা মানুষের স্বভাব থেকেই আসে, এমনকি ছোট ছেলেমেয়েদেরও। মানুষ চায় না অন্য কেউ তাকে হুকুম দিক বা বলুক তার কি করা উচিত। আমরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ীই আমাদের জীবনকে চালাতে চাই। ব্যাবিলের লোকেরাও এভাবেই জীবন কাটিয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ শহর বানানোর সাথে সাথে মানুষ নিজের গৌরবের জন্য একটি সুউচ্চ দালানও তৈরী করতে চেয়েছিল। লোকেরা বলছিল-

এতে আমাদের সুনামও হবে...। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৪ আয়াত)*

নিশ্চয়ই শয়তান মানুষকে এরকম বুদ্ধি দিচ্ছিল। শয়তানের উদ্দেশ্যও ছিল এটি।

ব্যাবিলের লোকেরা আল্লাহ্‌কে অবহেলা করেছিল। মানুষ যখন গুরুত্বপূর্ণ হতে এবং নিজের সুনাম বাড়াতে চেষ্টা করে, তখন স্পষ্ট বুঝা যায় এর সাথে *অহংকার* জড়িত। সেই পরিকল্পনার মধ্যে আল্লাহ্‌ বাদ পড়ে যান।

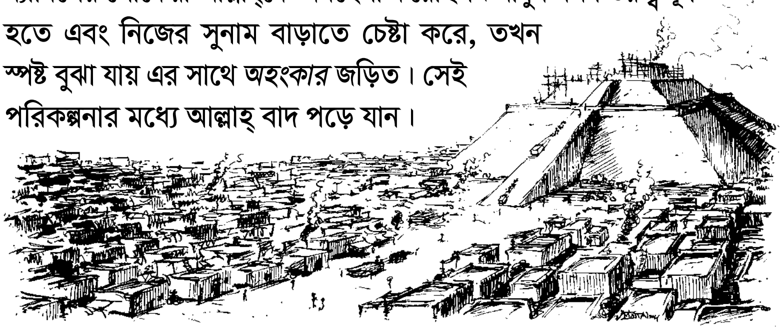

একজন মানুষকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর গৌরব, সম্মান এবং ক্ষমতার সাথে তুলনা করা হয়, তখন মানুষ কিভাবে নিজেকে গৌরব দান করার চেষ্টা করতে পারে? আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন মানুষকে তুলনা করা বোকামি। পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় আল্লাহ্‌ই একমাত্র গৌরব পাওয়ার অধিকারী।

সুতরাং মানুষের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহের সাথে মিলে নি। আবার আমরা দেখতে পাই, মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরে এসে স্বাধীন ভাবে চলছিল। ব্যাবিলই হল কিতাবুল মোকাদ্দসে লিখিত একটি সংগঠিত ধর্মের সর্বপ্রথম ঘটনা। মানুষের ধর্মীয় প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ হিসেবে কিতাবুল মোকাদ্দসে প্রায় সময়ই ব্যাবিলের ঘটনা ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাবিলের লোকেরা একটি আকাশ-ছোঁয়া ঘর বানিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার একটা নিজস্ব উপায় খোঁজার চেষ্টা করছিল। তারা যে প্রচণ্ড গরমে কঠোর পরিশ্রম করেছিল, আমরা সে কথা চিন্তা করতে পারি। তারা মাটি সংগ্রহ করে তা দিয়ে ইট বানিয়ে ছিল এবং সেই ইট একটির সাথে আরেকটি লাগিয়েছিল। এটি অবশ্য খুব কঠিন কাজ ছিল। তারা আকাশে পৌঁছতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার কেবল মাত্র একটিই পথ আছে। আল্লাহ্ জানেন সেই পথটি কি এবং তিনি তা আমাদের জানাতে চান।

"ধর্ম" শব্দটির একটা ভাল ব্যাখ্যা হলঃ ***"ধর্ম আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা।"*** স্বভাবতঃ মানুষ খুবই ধর্মপ্রেমী। আল্লাহ্‌কে খুঁজতে সে অবিরাম নতুন নতুন পথের অন্বেষণ করছে। এই অন্বেষণটা নিষ্ফল। পাক-কিতাব বলে রূহানী ভাবে মানুষ অন্ধকারে বাস করছে, কারণ সে গুনাহে হারিয়ে গেছে। সে নিজের চেষ্টায় আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসার পথ খুঁজে পায় না। সে যেন আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেজন্য সে নিজে নিজে গুনাহের সমাধান বা ধার্মিকতার পথ পেতে পারে না।

ধর্মের মত শিক্ষা না দিয়ে পাক-কালাম শিক্ষা দেয় আল্লাহ্‌র কাছে যাবার একমাত্র সত্য পথ তিনি নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি মানুষের মধ্যে নেমে আসলেন। এই কাজটি করার মধ্য দিয়ে তিনি গুনাহের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষকে একটি উপায় করে দিলেন। এই আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে মুক্ত করেছেন। তিনিই নাজাতদাতা। পাক-কিতাব আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার করেছে যে, তিনিই সেই মাবুদ, যিনি...

> *এমন ব্যবস্থা করেন যাতে দূর করে দেওয়া লোক তাঁর কাছ থেকে দূরে না থাকে।* *(নবীদের কিতাব, ২ শামূয়েল ১৪:১৪ আয়াত)*

এই সত্যটি ব্যাবিলের লোকেরা অবহেলা করেছিল। নিশ্চয়ই তাদের নির্মাণ কাজটি আল্লাহ্‌র চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। ঠিক কি চলছিল তা তিনি পুরোপুরি জানতেন।

মানুষ যে শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করছিল তা দেখবার জন্য মাবুদ নেমে আসলেন। [৮] তিনি বলেছিলেন, এরা একই জাতির লোক এবং এদের ভাষাও এক; সেইজন্যই এই কাজে তারা হাত দিয়েছে। নিজেদের মতলব হাসিল করবার জন্য এর পর এরা আর কোন বাধাই মানবে না।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৫,৬ আয়াত)

ইতিহাস যা সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, তা আল্লাহ্ জানতেন। যখন লোকেরা একই ভাষায় কথা বলে তখন প্রযুক্তি আরও দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। এটিকে নমুনার মতই মনে হয়। মানুষের জীবন যাত্রার মান যখন উন্নত এবং আরামপূর্ণ হয় তখন তারা চিন্তা করতে পারে তাদের আল্লাহ্‌র দরকার নেই। আল্লাহ্ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিলেও তিনি চান না মানুষ তাঁর কাছ থেকে পৃথক জীবন-যাপন করুক।

ছড়িয়ে পড়া

এই কাহিনীটি স্পষ্ট। আল্লাহ্ মানুষের অবাধ্যতাকে থামানোর পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন-

"কাজেই এস, আমরা নীচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে। তারপর মাবুদ সেই জায়গা থেকে তাদের সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন। এতে তাদের সেই শহর তৈরীর কাজও বন্ধ হয়ে গেল।*
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৭,৮ আয়াত)

*আরেকবার "আমরা" শব্দটি লক্ষ্য করুন। কিতাবুল মোকাদ্দস পরিষ্কার ভাবে বলে যে, কেবল একজন মাত্র আল্লাহ্ আছেন। তাই যখন তিনি বলেন *'আমাদের'* তখন তিনি ঠিক কার সাথে কথা বলছেন? আমরা তা পরে অধ্যয়ন করব।

নতুন নতুন ভাষা দেওয়ার দ্বারা আল্লাহ্ মানুষকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। একে অন্যের কথা না বুঝতে পেরে তারা নতুন নতুন দেশে সরে পড়েছিল। এই আলাদা হয়ে যাওয়াটা ছিল একটি পরিপূর্ণ কাজ, কারণ প্রত্যেকটি ভাষা ছিল জটিল। আপনি নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন একটি নতুন ভাষা শেখা কতটা কঠিন। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এসব ভাষার কিছু কিছু এতটাই জটিল ছিল যে, সেগুলো রপ্ত করতে অভিজ্ঞ ভাষাবিদ্‌দের বছরের পর বছর লাগতে পারে, এমনকি তারপরেও তারা সেগুলো সম্পূর্ণরূপে বুঝেন না।

লোকেরা যে শহরটি তৈরী করছিল, সেটি অদৃশ্য হয়ে যায় নি। কিন্তু সেটি একটি বিশেষ নাম পেয়েছিল, যে নামের অর্থ *"গোলমাল।"*

এইজন্য সেই জায়গার নাম হল ব্যাবিল, কারণ সেখানেই মাবুদ সারা দুনিয়াতে ভাষার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন।

সেখান থেকেই তিনি তাদের দুনিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৯ আয়াত)

ষষ্ঠ অধ্যায়

১ আইয়ুব নব

২ ইব্রাহিম নবী

৩ খাঁটি ঈমান

৪ বিবি হাজেরা ও ইসমাইল

৫ ইসমাইল ও ইসহাক

৬ যোগানদাতা

১ আইয়ুব নব

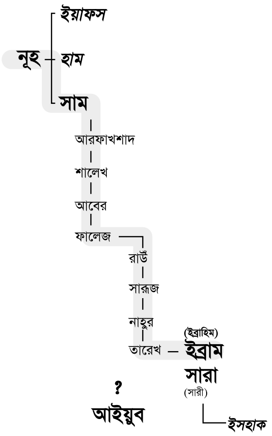

ব্যাবিলের ভাষা-বিভেদের ঘটনার পরে অনেক প্রজন্ম পার হয়ে গেল। এত সব বছর পরও মাবুদ আল্লাহ্ একজন নাজাতদাতা পাঠানোর বিষয়ে নিজের ওয়াদার কথা ভুলে যান নি। যদিও বেশীর ভাগ লোক আল্লাহ্‌র বিষয়ে বেশী চিন্তা করে নি, তবুও প্রত্যেক প্রজন্মের এমন কিছু কিছু লোক ছিল যারা তখনও আল্লাহ্‌র ওয়াদা সমূহে বিশ্বাস করতেন। এরকম একজন ঈমানদার লোকের নাম ছিল *আইয়ুব*।

আইয়ুব নবী একজন আল্লাহ্-ভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রচণ্ড আবেগগত ও শারীরিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। তাঁকে ও সব মানুষকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর ধন-সম্পদ, পরিবার ও স্বাস্থ্য কেড়ে নিতে। কিন্তু সব ধরনের বিপদের মধ্যেও আইয়ুব নবী জানতেন যে, গুনাহ্ই তাঁর সবচেয়ে খারাপ সমস্যা। তিনি জানতেন গুনাহ্-স্বভাব নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই একটি মুনাজাতের মধ্যে তিনি আল্লাহ্‌কে বলেছেন...

> *"আমি যদি সাবান দিয়ে নিজেকে ধুয়ে ফেলি আর ক্ষার দিয়েও হাত পরিষ্কার করি, তবুও তুমি কাদার গর্তে আমাকে ডুবিয়ে দেবে; তাতে আমার কাপড়-চোপড়ও আমাকে ঘৃণা করবে।" (নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৯:৩০,৩১ আয়াত)*

হযরত আইয়ুব জানতেন শরীর ধুয়ে ফেললেও তিনি পবিত্র ও নিষ্পাপ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিজেকে নিখুঁত করতে পারবেন না। এমনকি বাইরের দিকে ঘঁষে-মেজে নিজেকে পরিষ্কার করলেও তাঁর অন্তর তখনও নাপাক থাকবে। গুনাহ্‌গার হিসাবে তাঁর পাওনা আল্লাহ্‌র শাস্তি। নিজের গুনাহের দরুন আল্লাহ্‌র শাস্তির বিষয়ে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। তিনি এমন কেউ একজনকে তাঁর মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পেতে চেয়েছিলেন, যিনি তাঁর পরিবর্তে আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারবেন এবং তিনি যেন রহমত পেতে পারেন, সে ব্যাপারে তাঁর পক্ষে মধ্যস্থতা করতে পারবেন।

> *"আহা, যদি এমন কেউ থাকতেন যিনি আমাদের মধ্যে সালিশ করে দিতে পারেন এবং যাঁর কথা আমরা দু'জনেই মেনে নিতে পারি; যদি এমন কেউ থাকতেন যিনি আল্লাহ্‌র শাস্তি আমার উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারেন, যাতে তার ভয়ংকরতা আমাকে আর ভয় দেখাতে না পারে।"*
> *(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৯:৩৩,৩৪ আয়াত)*

যদিও আইয়ুব নবী নিয়মিত পশু কোরবানী দিতেন, তবুও মনে হয় তিনি বুঝেছিলেন যে, পশু কোরবানী তাঁর গুনাহের ঋণ শোধ করতে পারে না। এই পশু কোরবানী ছিল শুধুমাত্র একটি অস্থায়ী ঢাকনা। সম্ভবতঃ তাঁর সেই জ্ঞান এবং আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও অটল পবিত্রতার ভক্তিপূর্ণ ভয়ের দরুন তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটি ছিল-

"...কিন্তু আল্লাহ্‌র চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে?।"
(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৯:২ আয়াত)

নবী আইয়ুব চিন্তা করেছিলেন কিভাবে তিনি তাঁর গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত হতে ও ধার্মিকতা লাভ করতে পারেন। তিনি আল্লাহ্‌র পবিত্র উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য হতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেনঃ *"আইয়ুব, তুমি কেবল আমার উপর ঈমান আন, তাহলেই আমি তোমার গুনাহ্‌ সমস্যার সমাধান করব। আমার পবিত্র উপস্থিতিতে থাকার জন্য দরকারী ধার্মিকতা আমি তোমাকে দেব। শুধু আমার উপরে ঈমান আন।"*

আর আইয়ুব নবী ঠিক তা-ই করেছিলেন। তিনি সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতার দুনিয়াতে আগমনের বিষয়ে বলেছিলেন, যিনি কোন একভাবে মানুষকে গুনাহের ভীষণ পরিণতি থেকে রক্ষা করার বিষয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাছে করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা পরিপূর্ণ করবেন। তিনি সেই ***নাজাতদাতাকে*** তাঁর *মুক্তিদাতা বলে ডেকেছেন*।

"আমি জানি আমার মুক্তিদাতা জীবিত আছেন; শেষে তিনি দুনিয়ার উপরে এসে দাঁড়াবেন। আমার চামড়া ধ্বংস হয়ে যাবার পরেও আমি জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌কে দেখতে পাব। আমি নিজেই তাঁকে দেখব; অন্যে নয়, কিন্তু আমি আমার নিজের চোখেই তাঁকে দেখব। আমার অন্তর আকুলভাবে তা চাইছে।" *(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ১৯:২৫-২৭ আয়াত)*

হযরত আইয়ুব জানতেন তিনি মৃত্যুর পরে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবেন। তিনি এটাই চেয়েছিলেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন এবং আল্লাহ্‌র সংগে তাঁর সঠিক সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীতে আমরা দেখব কেন আইয়ুব নবী সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতাকে*** তাঁর *মুক্তিদাতা* বলে ডেকেছেন।

২ ইব্রাহিম নবী

হযরত আইয়ুবের জীবনকালে ইব্রাম ও সারী নামে একটি দম্পতি বেঁচেছিল।[১] কিন্তু-

সারী বন্ধ্যা ছিলেন; তাঁর কোন ছেলেমেয়ে হয় নি।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৩০ আয়াত)

বর্তমানে যে দেশটিকে ইরাক বলা হয় ইব্রাম সেই দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাড়ী ছিল ব্যাবিলের দক্ষিণে উর শহরে। আল্লাহ্ ইব্রামের সাথে কথা বলেছিলেন। মাবুদের নির্দেশনা সমূহ অনুসরণ করে ইব্রাম তাঁর বাড়ী ছেড়ে হারণ নামক শহরে চলে গিয়েছিলেন। এই হারণ শহরেই আল্লাহ্ আবার ইব্রামের সাথে কথা বলেন।

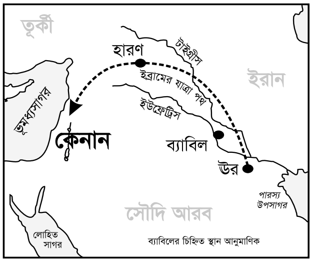

পরে মাবুদ ইব্রামকে বললেন, "তুমি তোমার নিজের দেশ, তোমার আত্মীয়-স্বজন এবং তোমার পিতার বাড়ী-ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যে দেশ দেখাব সেই দেশে যাও।" ...মাবুদের কথামতই ইব্রাম তখন বেরিয়ে পড়লেন... হারণ শহর ছেড়ে যাবার সময় ইব্রামের বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১২:১-৪ আয়াত)*

ইব্রামের জন্য এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। সেই এলাকার কোন মানচিত্র ছিল না। আমাদের বর্তমান সময়ের মত যাত্রা সম্বন্ধে ইন্টারনেটে দেখা বা কোন ট্রাভেল এজেন্টের সাথে কথা বলার সুযোগ তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আল্লাহ্ তাঁকে এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। ইব্রাম তাঁর যাত্রার সময় প্রত্যেকদিনই আল্লাহ্‌র পরিচালনার উপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর গন্তব্য স্থানটি ছিল কেনান দেশ, যে দেশকে এখন 'ইসরাইল' ও 'ফিলিস্তিন' বলা হয়।

...তিনি কেনান দেশের দিকে যাত্রা করে সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। যিনি তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, সেই মাবুদের প্রতি ইব্রাম তখন সেখানে একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করলেন *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১২:৫,৭ আয়াত)*

ইব্রাম বিশ্বাস করতেন আল্লাহ্‌ই তাঁকে গুনাহের পরিণাম থেকে মুক্ত করতে পারেন। সেই জন্যই ইব্রাম তাঁর গুনাহের জন্য *কাফফারা/ঢাকনা* হিসেবে একটি পশু কোরবানী করেছিলেন। যদিও পশু কোরবানী ছিল গুনাহ্ ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শুধুমাত্র একটি ছবি, কিন্তু ইব্রামের কোরবানী ছিল একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর গুনাহের মূল্য পরিশোধ করার জন্য একজন বদলী দরকার। যেভাবে হাবিল, নূহ নবী এবং অন্যান্য ধার্মিক লোকেরা অতীতে করেছেন, সেই একই ভাবে ইব্রামও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেছিলেন।

ইব্রাম অনেক উট ও ভেড়ার মালিক হলেও যাযাবরের মত জীবনযাপন করতেন। স্থানীয় লোকেরা ইব্রামকে নাম দিয়েছিল *'ইবরানী'*। এই নামের অর্থ *দীর্ঘপথ ভ্রমণকারী, যিনি অনেক দূর থেকে ভ্রমণ করে এসেছেন*। সেই সময় থেকেই ইব্রাম এবং তাঁর বংশধরেরা ইবরানী নামে পরিচিত হয়েছিল।

চারটি ওয়াদা

আল্লাহ্ ইব্রামের কাছে চারটি সুনির্দিষ্ট ওয়াদা দান করেছিলেনঃ

১) *তোমার মধ্য থেকে আমি একটি মহা জাতি সৃষ্টি করব...*[২]

২) *আমি তোমার সুনাম ছড়িয়ে দেব...*[৩]

৩) *যারা তোমাকে দোয়া* করবে আমি তাদের দোয়া করব; আর যারা তোমাকে বদদোয়া* দেবে আমি তাদের বদদোয়া দেব।*

৪) *"তোমার মধ্য দিয়েই দুনিয়ার প্রত্যেকটি জাতি দোয়া পাবে।"*

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১২:২,৩ আয়াত)

*যখন আল্লাহ্ দোয়া করেন তখন তিনি সাহায্য ও সুখ দান করেন। যখন তিনি বদদোয়া দেন তখন সমস্যা ও কষ্ট নিয়ে আসেন।

আল্লাহ্‌র প্রথম ওয়াদাটি ইব্রামের কাছে একটি সুসংবাদ ছিল। সেই সুসংবাদ হল তিনি ইব্রাম থেকে একটি মহান জাতি সৃষ্টি করবেন। আর এজন্য তো ইব্রামকে অবশ্যই সন্তানের পিতা হতে হবে। কিন্তু ইব্রামের কোন সন্তান ছিল না। অনেক বছর ধরে ইব্রাম ও সারী সন্তান লাভ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন তাঁরা খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তারপরও ইব্রাম বিশ্বাস করতেন যেহেতু আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, সেহেতু তিনি তাঁর সেই ওয়াদা পরিপূর্ণ করবেন।

ইব্রামের কাছে করা আল্লাহ্‌র শেষ ওয়াদাটি প্রথম ওয়াদার উপরেই নির্ভরশীল। অর্থাৎ সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা ইব্রামের মধ্য দিয়েই আসবেন এবং দুনিয়ার লোকদের দোয়া করবেন। পাক-কিতাব বলে ইব্রাম আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই নাজাতদাতার আগমনের দিনটি *"দেখবার আশায়"* আনন্দ করেছিলেন।[৪]

এর পর মাবুদ ইব্রামকে দর্শনের মধ্য দিয়ে বললেন, "ইব্রাম, ভয় কোরো না। ঢালের মত করে আমিই তোমাকে রক্ষা করব, আর তোমার পুরস্কার হবে মহান।"

ইব্রাম বললেন, "হে মাবুদ, আমার মালিক, তুমি আমাকে কি দেবে? আমার তো কোন ছেলেমেয়ে নেই।...

পরে মাবুদ ইব্রামকে বাইরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আসমানের দিকে তাকাও এবং যদি পার ঐ তারাগুলো গুণে শেষ কর। তোমার বংশের লোকেরা ঐ তারার মতই অসংখ্য হবে।"

ইব্রাম মাবুদের কথার উপর ঈমান আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৫:১,২,৫,৬ আয়াত)*

এই শেষের আয়াতটির কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমরা এই ৩টি শব্দ দেখতে পাই- *ধার্মিক, গ্রহণ করা* এবং *ঈমান*। *'ঈমান'* শব্দটি এতই গুরুত্বপূর্ণ

যে, এই বইটিতে এই শব্দটি সম্পর্কে আমরা একটি সম্পূর্ণ ভাগ দেখতে পাব।

ধার্মিক

আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা জেনেছি *'ধার্মিক'* শব্দটি আল্লাহ্‌র নিখুঁততার কথাই নির্দেশ করে। এর অর্থ আল্লাহ্‌ খুঁতহীন, পবিত্র, খাঁটি, পরিষ্কার ও সম্পূর্ণভাবে নিষ্কলংক। মানুষের পক্ষে এই নিখুঁততা অর্জন অসম্ভব। কিছু কিছু লোক হয়ত ভাল জীবনযাপন করে, কিন্তু কেউই সাহসের সাথে দাবী করতে পারে না তারা নিখুঁত।

মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে বাস করার জন্য মানুষকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র মত সম্পূর্ণ ভাবে ধার্মিক হতে হবে। এটা অসম্ভব। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস বলে পরিশেষে হযরত ইব্রাম এই ধার্মিকতা পেয়েছিলেন। তিনি নিজে নিজে এটা অর্জন করেন নি, কিন্তু আল্লাহ্‌ই তাঁকে *"ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।"*

গ্রহণ করা

'গ্রহণ করা' শব্দটির অর্থ কোন কিছুকে সত্য বলে গণনা করা বা ধরা। যদি কেউ আমাদের ব্যাংক একাউন্টে টাকা জমা দেয়, তাহলে এর মানে দাঁড়ায় আমাদের ব্যাংক হিসাবে টাকা এসেছে। যদি একজন বন্ধু আপনাকে বলে সে আপনার ব্যাংক একাউন্টে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়েছে, তাহলে মানে দাঁড়ায় আপনার ব্যাংক হিসাবটি এক লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছে। যেহেতু লেনদেনটি আপনার হিসাবের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে, তাই আপনি এখন এক লক্ষ টাকার মালিক হলেন। এটা কোন অনুমানের ব্যাপার নয়, কিন্তু এটা বাস্তব।

পাক-কিতাব বলে ***মাবুদ*** আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রামকে *ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন*। অর্থাৎ তাঁর জীবনের হিসাবে মাবুদই ধার্মিকতা জমা করেছেন। হযরত ইব্রাম নিজে এই ধার্মিকতা জমা করেন নি। তিনি হঠাৎ করে নিখুঁত জীবনযাপন শুরু করেন নি, বরং আল্লাহ্‌ ইব্রামের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন তিনি ধার্মিক এবং তাঁর সাথে তাঁর সম্পর্ক আছে। এই ধার্মিক বলে গ্রহণ করার কাজটি হয়ে গেছে। আর কোন প্রশ্ন করার দরকার নেই। আল্লাহ্‌ই এই কাজটি সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের জন্য দরকারী সব কিছুই আল্লাহ্‌ ইব্রামের জন্য করেছিলেন।

তারপরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়ঃ কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ্‌ ইব্রামকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন? নীচের আয়াতটি থেকে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর পাব।

> *"ইব্রাম মাবুদের কথার উপর ঈমান আনলেন আর মাবুদ সেইজন্য তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৫:৬ আয়াত)*

হযরত ইব্রাম মাবুদের উপর ঈমান এনেছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র কালামকে আক্ষরিক ভাবে নিয়েছিলেন।

৩ খাঁটি ঈমান

‘ধার্মিক’ ও ‘গ্রহণ করা’ বিষয়ে আলোচনার পর মানুষ হয়ত তৃতীয় শব্দ ‘ঈমান’ এর বিষয়ে সহজেই ভুল বুঝতে পারে। কিতাবুল মোকাদ্দসে ‘ঈমান’ শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিতাবুল মোকাদ্দসে *বিশ্বাস, ঈমান, নির্ভরতা ও আস্থা* শব্দগুলোর অর্থ একই।

ইব্রাম মাবুদের উপর **ঈমান** আনলেন। এর অর্থ
আল্লাহ্‌র বলা কথায় ইব্রাম **ঈমান** আনলেন।

ইব্রাম মাবুদের উপর **বিশ্বাস** রাখলেন। এর অর্থ
আল্লাহ্‌র কালামের উপরে ইব্রামের **বিশ্বাস** ছিল।

ইব্রাম মাবুদের উপর **নির্ভর** করেছিলেন। এর অর্থ
ইব্রাম জানতেন আল্লাহ্ **নির্ভরযোগ্য**।

ইব্রাম মাবুদের উপর **আস্থা** রাখলেন। এর অর্থ
একমাত্র মাবুদের মধ্যেই ইব্রামের **আস্থা** ছিল।

❖ সত্যিকারের ঈমান আবেগ-অনুভূতি নয়, কিন্তু বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যখন আপনি একটি চেয়ারে বসেন, আপনি প্রথমে সেটার দিকে তাকান। আপনি দেখেন চেয়ারটি ভালভাবে নির্মিত ও দৃঢ় কিনা। আপনি এটা দেখে বিশ্বাস করেন যে, চেয়ারটি আপনার ভার সইতে পারবে, তাই আপনি বসে যান। একই ভাবে ইব্রামের ঈমান বাস্তবতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সেই বাস্তবতা ছিল আল্লাহ্‌র ওয়াদা আর সেই ওয়াদাটা একটি অংকের সমীকরণের মত এইভাবে বুঝা যায়ঃ

আল্লাহ্ বললেন, “তোমার একটি ছেলে হবে।”
+ আল্লাহ্ মহান তিনি সব করতে পারেন।
= অব্রামের একটি ছেলে হবে।

❖ একজন লোকের কত *পরিমাণ* ঈমান আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু *কার উপর* আপনি ঈমান এনেছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন ভুল জিনিষ বা ব্যক্তির উপর প্রচুর ঈমান থাকলে তা আপনার কোন কাজে আসবে না। মাঝে মাঝে ইব্রামও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন, কিন্তু সেটা তেমন বড় ব্যাপার নয়। একজন লোক কি বা কাকে বিশ্বাস করে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ; তার ঈমান কতটুকু তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

❖ সত্যের প্রতি একজন লোকের মৌখিক সম্মতি পর্যাপ্ত নয়। যদি এটা পর্যাপ্ত হয়, তাহলে তা খাঁটি ঈমান নয়।

এই গল্পটি আমাদেরকে ‘ঈমান’ সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করবে। ধরুন, দু’জন বন্ধু

একবার একটি পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে একটি বাঁশের সেতুর কাছে আসল। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি বিশ্বাস করিস্ সেতুটি মজবুত?" দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল, "হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তা বিশ্বাস করি।" প্রথম বন্ধুটি তখন বলল, "ঠিক আছে, তাহলে চল্ আমরা ওপারে যাই!" এবার যদি দ্বিতীয় বন্ধুটি সেই সেতু পার হতে দ্বিধা প্রকাশ করে বা অজুহাত দেখাতে শুরু করে তাহলে সে সম্ভবতঃ বিশ্বাস করে না সেই সেতুটি নিরাপদ। এর মানে যদিও সে মুখে বলেছে সে বিশ্বাস করে কিন্তু তার মনে সন্দেহ আছে। লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের ঈমান আমাদের কাজকে প্রভাবিত করে।

হযরত ইব্রামের ঈমান মৌখিক সম্মতির চেয়ে বেশী কিছু ছিল। আল্লাহ্‌র ওয়াদায় ঈমান আনার দরুন তাঁর জীবন, সুনাম ও কাজ ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছিল। আল্লাহ্‌র কালামে ঈমান এনেছিলেন বলেই তিনি আল্লাহ্‌র বাধ্য ছিলেন এবং একটি অজানা দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন বলেই গুনাহের পরিণতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে তিনি কোরবানী দিতেন। তিনি আল্লাহ্‌র বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তিনি সত্যি সত্যি আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন। হযরত ইব্রাম যে আল্লাহ্ বা অন্যদের কাছে দেখাতে চেষ্টা করছিলেন তাঁর ঈমান খাঁটি, তা নয়। আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন বলেই তিনি তাঁর বাধ্য ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে আমরা গুনাহ্-ঋণের দু'টি দিক আলোচনা করেছিলাম। "কিভাবে আমরা আমাদের গুনাহ্ ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারি? কিভাবে আমরা নিখুঁত হতে পারি?" দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্য পাক-কিতাবের সমাধানটি সহজ, অর্থাৎ মাবুদের উপরে নির্ভর করুন। তাঁর বিভিন্ন ওয়াদার উপর ঈমান রাখুন। তাহলেই আল্লাহ্ ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন।

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্ যে তাঁর ওয়াদা সমূহ পূর্ণ করবেন সে বিষয়ে ইব্রাম নিশ্চিত ছিলেন।

> *কারণ যে শহর চিরস্থায়ী তিনি সেই শহরের অপেক্ষায় ছিলেন। সেই শহরের নক্‌শা তৈরী ও গেঁথে তুলবার কাজ আল্লাহ্‌ই করেছেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১১:১০ আয়াত)*

বেহেশতের বিষয়ে ইব্রামের প্রত্যাশা ছিল। যদিও অবশেষে তাঁর দেহের মৃত্যু হবে তবুও তিনি জানতেন আল্লাহ্ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছেন যাতে তিনি মাবুদের সাথে চিরকাল ধরে বাস করতে পারেন।

কিন্তু এখনও আমরা একটি প্রশ্নের উত্তর পাই নি। প্রশ্নটি হলঃ যদি গুনাহ্-ঋণই পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে ইব্রাম বেহেশতে থাকতে পারবেন? এই প্রশ্নটিই মুদ্রার অন্য পিঠ। গুনাহ্-ঋণ পরিশোধ এবং ধার্মিকতা অর্জন- এই দু'টা বিষয়কে আলাদা করা সম্ভব নয়। গুনাহের পরিণাম তো ভোগ করতেই

হবে। আর যদি তা-ই হয় তাহলে *ইব্রাম কিভাবে বেহেশতে যেতে পারবেন?* আসলে গুনাহ্-ঋণের সমাধান করার জন্য আল্লাহ্‌র একটি পরিকল্পনা ছিল। ইব্রামের শুধু দরকার ছিল আল্লাহ্ যে তাঁর কথা সময়মত পূর্ণ করবেন তা বিশ্বাস করা। তিনিই নাজাত দানকারী।

৪ বিবি হাজেরা ও ইসমাইল

অনেক বছর পার হয়ে গেলেও ইব্রাম ও বিবি সারীর কোন ছেলেমেয়ে হল না। সেইজন্য তাঁরা নিজেরাই সমস্যাটি সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সময়কার প্রথা অনুসারে বিবি সারী হাজেরা নামে তাঁর এক বান্দীকে ইব্রামের কাছে দিয়েছিলেন। বিবি হাজেরাকে বিয়ে করার পরে তাঁর গর্ভে *ইসমাইল* নামে ইব্রামের একটি সন্তান হয়েছিল। আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূরণ করার মত হযরত ইব্রামের এখন একজন বংশধর হল। কিন্তু এতে কেবল একটাই সমস্যা ছিল। সেই সমস্যা ছিল এই যে, ইব্রাম ও বিবি সারী আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা মত নয় বরং নিজেদের পরিকল্পনামত কাজ করেছিলেন।

> *ইব্রামের বয়স যখন নিরানব্বই বছর তখন মাবুদ তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "আমিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। তুমি আমার সংগে যোগাযোগ-সম্বন্ধ রাখ এবং আমার ইচ্ছামত চল। ...তোমাকে ইব্রাম (যার মানে 'মহান পিতা') বলে আর ডাকা হবে না, কিন্তু এখন থেকে তোমার নাম হবে ইব্রাহিম (যার মানে 'অনেক লোকের পিতা'); কারণ আমি তোমাকে অনেকগুলো জাতির আদিপিতা করে রেখেছি।"*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৭:১,৫ আয়াত)*

কিতাবের এই জায়গা থেকেই ইব্রামের নাম হয়েছিল ইব্রাহিম। আল্লাহ্ যা বলছিলেন সে ব্যাপারে হযরত ইব্রাহিমের কোন সমস্যা ছিল না। এখন তো তাঁর একজন বংশধর হয়েছে। বিবি হাজেরা ইসমাইল নামে তাঁর একটি ছেলের জন্মদান করেছে!

> *আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে আরও বললেন, "তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলে ডাকবে না। তার নাম হবে সারা। আমি তাকে দোয়া করে তারই মধ্য দিয়ে তোমাকে একটা পুত্র সন্তান দেব। আমি তাকে আরও দোয়া করব যাতে সে অনেক জাতির এবং তাদের বাদশাহ্‌দের আদিমাতা হয়।"*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৭:১৫,১৬ আয়াত)*

এটি হযরত ইব্রাহিমের জন্য সেরকম সুসংবাদ ছিল না। কিতাবের এই জায়গা থেকে বিবি সারীর নাম বিবি সারা হয়ে গিয়েছিল। হয়ত হযরত ইব্রাহিম চিন্তা করেছিলেন কেন আল্লাহ্ শুধু বিবি সারা সম্পর্কে বললেন? তিনি কি বিবি হাজেরা সম্পর্কে জানেন না? সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতার*** আগমন কি বিবি হাজেরার

গর্ভের সন্তান ইসমাইলের মধ্য দিয়ে সম্ভবপর নয়? কেন সেই ***নাজাতদাতার*** বিবি সারার সন্তানের বংশের মধ্য দিয়ে আসা দরকার? আবার বিবি সারাও তো খুব বুড়ী হয়ে গিয়েছেন! তাঁর পক্ষে তো এখন কোন সন্তান জন্ম দেওয়া একেবারে অসম্ভব!

> *"এই কথা শুনে ইব্রাহিম মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং হেসে মনে মনে বললেন, তাহলে সত্যিই একশো বছরের বুড়োর সন্তান হবে, আর তা হবে নব্বই বছরের স্ত্রীর গর্ভে!"*
>
> *পরে ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বললেন, "আহা, ইসমাইলই যেন তোমার রহমতে বেঁচে থাকে!।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৭:১৭,১৮ আয়াত)*

হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌কে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁর সেই ওয়াদা ইসমাইলের মধ্য দিয়েও পূর্ণ হতে পারে।

> *আল্লাহ্ বললেন, "তোমার স্ত্রী সারার সত্যিই ছেলে হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে ইসহাক (যার মানে 'হাসা')। তার ও তার বংশের লোকদের জন্য আমি আমার চিরকালের ব্যবস্থা চালু রাখব। তবে ইসমাইল সম্বন্ধে তুমি যা বললে তা আমি শুনলাম। শোন, আমি তাকেও দোয়া করব... এবং তার মধ্য থেকে আমি একটা মহাজাতি গড়ে তুলব। কিন্তু ইস্‌হাকের জন্যই আমি আমার ব্যবস্থা চালু রাখব। সামনের বছর এই সময়ে সে সারার কোলে আসবে।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৭:১৯-২১ আয়াত)*

এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে করা কাজকেই কেবল তিনি সম্মান দান করবেন। পরের বছরে বিবি সারা সেই ওয়াদা-করা সন্তান লাভ করবেন। আর আল্লাহ্ সেই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন ইসহাক। কিন্তু ইসমাইলের কথাও আল্লাহ্ ভুলে যান নি। পরে আমরা ইসমাইল ও ইস্‌হাকের বিষয়ে আরও জানব।

তিনজন মেহমান

হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা অপেক্ষা করেছিলেন। সেই অপেক্ষার সময় আল্লাহ্ তাঁদের সাথে কথা বলার জন্য দুনিয়াতে এসেছিলেন। তবে এবার তিনি মানুষের রূপ ধরে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি দু'জন ফেরেশতাকেও সংগে নিয়ে এসেছেন। সেই দু'জন ফেরেশতাও দেখতে মানুষের মত ছিলেন।

> **মাবুদঃ** *"আপনার স্ত্রী সারা কোথায়?"*
>
> **ইব্রাহিমঃ** *"তাম্বুর ভিতরে আছেন।"*
>
> **মাবুদঃ** *"সামনের বছর এই সময়ে আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আবার আসব। তখন আপনার স্ত্রী সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।"*

সারা ইব্রাহিমের পিছনে তাম্বুর দরজার কাছ থেকে সব কথা শুনছিলেন। তখন ইব্রাহিম আর সারার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল এবং সারার আর ছেলেমেয়ে হবার বয়স ছিল না। তাই সারা মনে মনে হেসে বললেন, "আমার স্বামী এখন বুড়ো হয়ে গেছেন আর আমিও ক্ষয় হয়ে এসেছি; সহবাসের আনন্দ কি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে?"

মাবুদ (ইব্রাহিমকে বললেন)ঃ *"সারা কেন এই কথা বলে হাসল যে, এই বুড়ো বয়সে সত্যিই কি তার সন্তান হবে? মাবুদের কাছে অসম্ভব বলে কি কিছু আছে? সামনের বছর ঠিক এই সময়ে আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব আর তখন সারার কোলে একটি ছেলে থাকবে।"*

সারাঃ ... *ভয় পেয়ে হাসবার কথা অস্বীকার করে বললেন, "না, আমি তো হাসি নি।"*

মাবুদঃ "তা সত্যি নয়; তুমি হেসেছ বৈকি!।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১৮:৯-১৫ আয়াত)

বিবি সারা সম্ভবতঃ এই ভেবে অবাক হয়েছিলেন যে, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তাঁর চিন্তা সমূহও জানেন। তিনি অস্বীকার করার চেষ্টা করে বলেছিলেন তিনি হাসেন নি। বিবি সারা আল্লাহ্‌র চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ বলেছিলেন, *"হ্যাঁ, তুমি হেসেছ বৈকি!"* তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজের জন্য দায়ী করেন।

হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা বিশ্বাস করতেন আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁদের ঈমান ছিল টলমল। মাঝে মাঝে তাঁদের সন্দেহ থাকলেও আল্লাহ্ সর্ষে দানার ন্যায় ঈমানকেও সম্মান দান করেন *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৭:২০ আয়াত)*। সর্ষে দানা আকারে খুবই ছোট। *একজন লোকের কতটুকু ঈমান আছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কার উপর সেই লোকটি বিশ্বাস করে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।* হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন।

৫ ইসমাইল ও ইসহাক

মাবুদ তাঁর কথামতই সারার দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তিনি তাঁর জন্য যা করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন তা করলেন। এতে সারা গর্ভবতী হলেন। ইব্রাহিমের বুড়ো বয়সে সারার গর্ভে তাঁর ছেলের জন্ম হল। আল্লাহ্ যে সময়ের কথা বলেছিলেন সেই সময়েই তার জন্ম হল। ইব্রাহিম সারার গর্ভের এই সন্তানের নাম রাখলেন ইসহাক।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:১-৩ আয়াত)

হযরত ইব্রাহিম ও বিবি সারা যদিও বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে করা ওয়াদা আল্লাহ্ রেখেছিলেন। তিনি সব সময়ই তাঁর ওয়াদা পরিপূর্ণ করেন। তিনি অসম্ভব কাজকে সম্ভব করতে আনন্দ পান। এখন হযরত ইব্রাহিমের দু'টি ছেলে,

বিবি সারার গর্ভে ইসহাক এবং বিবি হাজেরার গর্ভে ইসমাইল। যদিও তাঁর আরও অনেক ছেলেমেয়ে হবে, কিন্তু পাক-কিতাব এই দুই ছেলে সম্পর্কেই বেশী বলে।

ইসমাইলের ১৬ ও ইস্‌হাকের ২ বছর বয়সের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনা ইসমাইলের জীবন, এমনকি দুনিয়ার ইতিহাসও পাল্টে দিয়েছিল।

সারা দেখলেন, মিসরীয় হাজেরার গর্ভে ইব্রাহিমের যে সন্তানটি জন্মেছে সে ইসহাককে নিয়ে তামাশা করছে। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:৯ আয়াত)

ইসমাইলের বয়স ছিল ১৬ বছর। ইসহাককে একটি মহান জাতির পিতা বানানোর বিষয়ে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার কথা সে বুঝে নি। ইস্‌হাকের মধ্য দিয়ে যে আল্লাহ্‌ অনেক বড় বড় নবী, পাক-কিতাব এবং সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতাকে*** দেবেন, সেকথা সে বুঝে নি। তাই ইসহাককে নিয়ে সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল দেখে বিবি সারা রেগে গিয়েছিলেন।

এই অবস্থা দেখে তিনি ইব্রাহিমকে বললেন, "ছেলে সুদ্ধ ঐ বান্দীকে বের করে দাও, কারণ ঐ ছেলে আমার ইসহাকের সংগে বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিশ হতে পারবে না।"

ছেলে ইসমাইলের এই ব্যাপার নিয়ে ইব্রাহিমের মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:১০,১১ আয়াত)

যদিও আল্লাহ্‌ বলেছিলেন সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*** ইসহাকের মধ্য দিয়েই আসবেন, কিন্তু তবুও ইসমাইল হযরত ইব্রাহিমের পুত্র ছিলেন এবং তিনি তাকে মহব্বত করতেন। হযরত ইব্রাহিম একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন। একদিকে তাঁর স্ত্রী বিবি সারা ইস্‌হাকের বিষয়ে উদ্‌গ্রীব, অন্যদিকে ইসমাইলের প্রতি তাঁর মহব্বত।

কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁকে বললেন, "তোমার বান্দী ও তার ছেলেটির কথা ভেবে তুমি মন খারাপ কোরো না। সারা তোমাকে যা বলছে তুমি তা-ই কর, কারণ ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে। তবে সেই বান্দীর ছেলের মধ্য দিয়েও আমি একটা জাতি গড়ে তুলব, কারণ সে-ও তো তোমার সন্তান।" (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:১২,১৩ আয়াত)

এক অর্থে আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন বিবি হাজেরাকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য।

তখন ইব্রাহিম ফজরে উঠে কিছু খাবার আর পানিতে-ভরা একটা চামড়ার থলি হাজেরার কাঁধে তুলে দিলেন। তারপর ছেলেটিকে তার হাতে দিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। সেখান থেকে বের হয়ে হাজেরা বের্‌-শেবার মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

থলির পানি যখন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি ছেলেটিকে একটা ঝোপের তলায় শুইয়ে রাখলেন।

তারপর একটা তীর ছুঁড়লে যতদূর যায় আনুমানিক ততটা দূরে গিয়ে তিনি বসে রইলেন। "ছেলেটির মৃত্যু যেন আমাকে দেখতে না হয়", মনে মনে এই কথা বলে সেখানে বসেই তিনি জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:১৪-১৬ আয়াত)

বিবি হাজেরার মনের কষ্ট ও হতাশার কথা আপনি কল্পনা করতে পারেন। যদিও তিনি সাধ্যমত তাঁর সন্তানের যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি কোন সাহায্য পান নি এবং এই দুনিয়াতে তাঁর কোন থাকার ঘর ছিল না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভুলে গেলেন আল্লাহ্ তাঁর ও ইসমাইলের জন্য চিন্তা করেন।

ছেলেটির কান্না কিন্তু আল্লাহ্র কানে গিয়ে পৌঁছাল। তখন আল্লাহ্র ফেরেশতা বেহেশত থেকে হাজেরাকে ডেকে বললেন, "হাজেরা, তোমার কি হয়েছে? ভয় কোরো না, কারণ ছেলেটি যেখানে আছে সেখান থেকেই তার কান্না আল্লাহ্র কানে গিয়ে পৌঁছেছে। তুমি উঠে ছেলেটিকে তুলে শান্ত কর, কারণ আমি তার মধ্য দিয়ে একটা মহাজাতি গড়ে তুলব।"

তারপর আল্লাহ্ হাজেরার চোখ খুলে দিলেন, তাতে সে একটা পানিতে-ভরা কূয়া দেখতে পেলেন। সেই কূয়ার কাছে গিয়ে তিনি তার চামড়ার থলিটা ভরে নিয়ে ছেলেটিকে পানি খাওয়ালেন।

আল্লাহ্ সেই ছেলেটির দেখাশোনা করতে থাকলেন, আর সে বড় হয়ে উঠতে লাগল। সে মরুভূমিতে বাস করত আর তীর-ধনুক ব্যবহারে পাকা হয়ে উঠল। *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:১৭-২০ আয়াত)*

পাক-কিতাব বলে ইসমাইল পূর্ণ বয়স্ক মানুষে পরিণত হওয়ার সময় আল্লাহ্ তাঁর সংগে ছিলেন। যদিও ইসহাকের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ ওয়াদা-করা ***নাজাতদাতাকে*** পাঠাবেন, কিন্তু তিনি ইসমাইলকেও দোয়া করতে চেয়েছিলেন। মাবুদ সমস্ত জাতির আল্লাহ্ হতে চেয়েছিলেন। আল্লাহ্র দেখানো পথেই কেবল সব মানুষ তাঁর কাছে আসতে পারে।

আল্লাহ্ ওয়াদা অনুযায়ী ইসমাইল থেকেও একটি মহান জাতি হয়েছিল। আরব জাতিগুলোর মধ্যে অনেক জাতি নিজেদেরকে ইসমাইলের বংশধর হিসেবে দেখায়।

পারণ নামে এক মরুভূমিতে সে (ইসমাইল) বাস করতে লাগল। মিসর দেশের এক মেয়ের সংগে তার মা তার বিয়ে দিল।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২১:২১ আয়াত)

৬ যোগানদাতা

হযরত ইসমাইল চলে যাওয়ার পরে হযরত ইব্রাহিমের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যেটি তিনি কখনও ভুলবেন না।

এই সমস্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে এক পরীক্ষায় ফেললেন। আল্লাহ্ তাঁকে ডাকলেন, "ইব্রাহিম।"

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "এই যে আমি।"

আল্লাহ্ বললেন, "তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলে ইসহাককে, যাকে তুমি এত ভালবাস তাকে নিয়ে তুমি মোরিয়া এলাকায় যাও। সেখানে যে পাহাড়টার কথা আমি তোমাকে বলব তার উপরে তুমি তাকে পোড়ানো-কোরবানী হিসাবে কোরবানী দাও।"

সেইজন্য ইব্রাহিম ফজরে উঠে একটা গাধার পিঠে গদি চাপালেন। তারপর তাঁর ছেলে ইসহাক ও দু'জন গোলামকে সংগে নিলেন, আর পোড়ানো-কোরবানী জন্য কাঠ কেটে নিয়ে যে জায়গার কথা আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন সেই দিকে রওনা হলেন। তিন দিনের দিন ইব্রাহিম চোখ তুলে চাইতেই দূর থেকে সেই জায়গাটা দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর গোলামদের বললেন, "তোমরা গাধাটা নিয়ে এখানেই থাক; আমার ছেলে আর আমি ওখানে যাব। ওখানে আমাদের এবাদত শেষ করে আবার আমরা তোমাদের কাছে ফিরে আসব।"

এই বলে ইব্রাহিম পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠের বোঝাটা তাঁর ছেলে ইসহাকের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিজে আগুনের পাত্র ও ছোরা নিলেন। তারপর তাঁরা দু'জনে একসংগে হাঁটতে লাগলেন। তখন ইসহাক তাঁর পিতা ইব্রাহিমকে ডাকলেন, "বাবা।"

ইব্রাহিম বললেন, "জ্বী আব্বু, কি বলছ?"

ইসহাক বললেন, "পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়?"

ইব্রাহিম বললেন, "আব্বু, পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আল্লাহ্ নিজেই ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন।" এই সব কথা বলতে বলতে তাঁরা এগিয়ে গেলেন।

যে জায়গার কথা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে ইব্রাহিম একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন। পরে ইসহাকের হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই কোরবানগাহের কাঠের উপর রাখলেন। তারপর ইব্রাহিম ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য ছোরা হাতে নিলেন। এমন

সময় মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে তাঁকে ডাকলেন, "ইব্রাহিম, ইব্রাহিম!"

ইব্রাহিম জবাব দিলেন, "এই যে আমি।"

ফেরেশতা বললেন, "ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য হাত তুলো না বা তার প্রতি আর কিছুই কোরো না। তুমি যে আল্লাহ্‌ভক্ত তা এখন বোঝা গেল, কারণ আমার প্রতি তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানী দিতে পিছ্‌পা হও নি।"

ইব্রাহিম তখন চারদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আট্‌কে আছে। তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং ছেলের বদলে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন।

তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌-যিরি (যার মানে 'মাবুদ যোগান')। সেইজন্য আজও লোকে বলে, "মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।"

মাবুদের ফেরেশতা বেহেশত থেকে ইব্রাহিমকে আবার ডেকে বললেন, "তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে পিছ্‌পা হও নি। সেইজন্য আমি মাবুদ নিজের নামেই কসম খেয়ে বলছি যে, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে অনেক দোয়া করব, আর আসমানের তারার মত এবং সমুদ্র-পারের বালুকণার মত তোমার বংশের লোকদের অসংখ্য করব। তোমার বংশের লোকেরা তাদের শত্রুদের শহরগুলো জয় করে নেবে, আর তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া পাবে। তুমি আমার হুকুম পালন করেছ বলেই তা হবে।"

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:১-১৮ আয়াত)

এই ঘটনাটি আমাদেরকে দ্বিধায় ফেলতে পারে। এ থেকে মনে হতে পারে আল্লাহ্‌ শিশু কোরবানীকে সমর্থন করেন। কিন্তু আসুন আমরা এই ঘটনার আরও গভীরে দেখি।

তোমার ছেলেকে সংগে নাও

আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন তাঁর ছেলেকে নিয়ে একটি কোরবান-গাহ্‌র উপরে কোরবানী করতে। এই হুকুমটি পালন সহজ ছিল না। কিতাবুল মোকাদ্দসে যখন হযরত ইব্রাহিমের অদ্বিতীয় ছেলের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়, তার মানে এই নয় যে, তাঁর আর অন্য কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। বরং মাবুদ আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমকে তাঁর সেই ছেলেটির কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, যাঁর বংশের মধ্য দিয়ে/থেকে সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*** আসবেন। আর

এই অদ্বিতীয় ছেলেটি ছিলেন ইসহাক। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা ও হুকুমের বিষয়ে খুবই নির্দিষ্ট ভাবে বলেছেন, যদিও এটা সুস্পষ্ট যে, একজন মৃত ছেলের কোন বংশধর থাকতে পারে না!

আল্লাহ্র অনুরোধটি অবশ্যই হযরত ইব্রাহিমকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছিল। সম্ভবতঃ হযরত ইব্রাহিম তাঁর সময়কালে মানুষ কোরবানী করতে দেখেছিলেন। হয়ত অন্য জাতির লোকেরা তাদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ কোরবানী করত। কিন্তু ছেলেকে কোরবানী দেওয়ার বিষয়ে আল্লাহ্র হুকুমটি সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহিমের সামগ্রিক জ্ঞানের বিপরীত ছিল। আল্লাহ্ তাঁর মহব্বতের দরুন হযরত ইব্রাহিমের কাছে এমন একজন ছেলের ওয়াদা করেছিলেন, যে ছেলেটি অনেক বংশ উৎপন্ন করবেন। এই ওয়াদাটি আল্লাহ্র হুকুমের সাথে খাপ খায় নি। কিন্তু হযরত ইব্রাহিম জানতেন আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য। তাই তিনি আল্লাহ্র কথা শুনলেন। তাঁর ছেলেকে ডেকে তিনি তাঁর গাধা প্রস্তুত করলেন এবং কোরবানী করার জন্য দরকারী সব জিনিষ নিলেন। হযরত ইব্রাহিমের অন্তর অবশ্যই কষ্টে পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্র মহত্ত্বের উপরে যে তাঁর পূর্ণ ঈমান আছে, তাঁর বাধ্যতা তা প্রকাশ করেছে।

এই সময় ইব্রাহিম কি চিন্তা করছিলেন কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের কাছে তা বলে। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র ওয়াদায় ঈমান এনেছিলেন এবং জানতেন তিনি ইসহাককে কোরবানী করলেও আল্লাহ্ তাঁর ছেলেকে মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তুলবেন।

> *ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করবার সময় তিনি আল্লাহ্র উপর ঈমানের জন্যই ইসহাককে কোরবানী দিয়েছিলেন। ...ইব্রাহিম তাঁকে কোরবানী দিতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আর বলতে কি, ইব্রাহিম তো মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১১:১৭,১৯ আয়াত)*

পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের ঈমান পরীক্ষা করছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় আমরা এর কারণ বুঝতে পারব। হযরত ইব্রাহিম তাঁর ছেলে ও দু'জন চাকরকে সংগে নিয়ে মোরিয়া পাহাড়ের দিকে চললেন। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে হযরত ইব্রাহিম ও ইসহাক আলাদা হয়ে গেলেন। হযরত ইব্রাহিম ছোরা ও আগুন, আর তাঁর ছেলে পোড়ানোর জন্য কাঠ বহন করছিলেন। তাঁরা দু'জন যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন ইসহাক তার বাবাকে একটি সহজ, অথচ যৌক্তিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। সম্ভবতঃ ইসহাক অনেক কোরবানী দেখেছিলেন। তিনি জানতেন কোরবানীর জন্য একটি পশু দরকার। কিন্তু সেই ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? ইসহাক বললেন--

"পোড়ানো-কোরবানীর জন্য কাঠ আর আগুন রয়েছে দেখছি, কিন্তু ভেড়ার বাচ্চা কোথায়? ।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:৭ আয়াত)*

সম্ভবতঃ ইসহাক অন্য ধর্মের লোকদের দেওয়া শিশু কোরবানীর কথা চিন্তা করছিলেন। নিশ্চয়ই ইসহাকও মাবুদের উপর নির্ভর করছিলেন! তাঁর বাবা যখন জবাব দিলেন আল্লাহ্ নিজেই একটা ভেড়ার বাচ্চা যুগিয়ে দেবেন, তখন তিনি খুশী মনে তাঁর বাবার সংগে যেতে রাজী হলেন।

মোরিয়া পাহাড়ের ঠিক কোন্ জায়গায় কোরবান-গাহ্‌টি তৈরী করতে হবে, আল্লাহ্ তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক বছর পরে সেই মোরিয়া পাহাড়ের উপরেই ইহুদীদের বায়তুল মোকাদ্দস এবাদতখানা ও তারপরে আল-আক্‌সা মসজিদ নির্মাণ হয়েছিল।

বাঁধা হল

যে জায়গার কথা আল্লাহ্ ইব্রাহিমকে বলে দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে গিয়ে পৌঁছালেন। সেখানে পৌঁছে ইব্রাহিম একটা কোরবানগাহ্ তৈরী করে তার উপর কাঠ সাজালেন। পরে ইস্‌হাকের হাত-পা বেঁধে তাঁকে সেই কোরবানগাহের কাঠের উপর রাখলেন।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:৯ আয়াত)

ইসহাক বয়সে শিশু ছিলেন না, তিনি ছিল যুবক। কোরবানগাহ্‌র সাথে বাঁধার সময় প্রতিরোধ করার সামর্থ তাঁর ছিল। যদিও হযরত ইব্রাহিম বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু পাক-কিতাবে এমন কোন বর্ণনা নেই যে, বাপ-ছেলের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছিল। ইসহাক স্বেচ্ছায় নিজেকে বাবার হাতে সমর্পণ করেছিলেন এবং জানতেন তাঁর বাবা আল্লাহ্‌র কালামের একজন অনুসারী।

ইসহাক্‌কে যখন কোরবান-গাহ্‌র উপর বাঁধা হয়েছিল তখন তিনি ছিলেন অসহায়। তাঁকে হত্যা করার বিষয়ে তিনি আল্লাহ্‌র সরাসরি ও নির্দিষ্ট হুকুমের অধীনে ছিলেন। নিজেকে রক্ষার কোন পথ তাঁর ছিল না। পাক-কিতাবে লেখা আছে হযরত ইব্রাহিম হাত বাড়িয়ে ছোরা হাতে নিয়েছিলেন। আপনি কি নিজের মনে সেই দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছেন? সম্ভবতঃ ইব্রাহিমের হাত কাঁপছিল। তাঁর মুখ নিশ্চয়ই হা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অন্তরও প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল, কারণ যাকে তিনি হত্যা করতে যাচ্ছেন সে তো তাঁরই ছেলে!

এই ঘটনাটির মানসিক চাপ খুবই প্রবল। আস্তে আস্তে হযরত ইব্রাহিম তাঁর কাঁপা হাতটি তুললেন। তাঁর ছোরাটির উপর সূর্যের আলো পড়ে জ্বলজ্বল করছিল, তিনি ছেলেকে মেরে ফেলবেন বলে মনস্থির করে ফেললেন। আর তখন... ঠিক তক্ষুণিই আল্লাহ্‌ হস্তক্ষেপ করলেন। বেহেশত থেকে মাবুদের ফেরেশতা হযরত ইব্রাহিমকে ডেকে বললেন--

> *ছেলেটির উপর তোমার হাত তুলো না বা তার প্রতি আর কিছুই কোরো না। তুমি যে আল্লাহ্‌ভক্ত তা এখন বোঝা গেল, কারণ আমার কাছে তুমি তোমার ছেলেকে, অদ্বিতীয় ছেলেকেও কোরবানী দিতে পিছ্‌পা হও নি।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:১২)*

সেখানে অবশ্যই চোখের পানি গড়িয়ে পড়েছিল। আপনি মনের চোখে দেখতে পারেন কিভাবে বাপ ও ছেলে মনের সুখে কাঁদছিল। আল্লাহ্‌ হস্তক্ষেপ করেছিলেন। মৃত্যুর দণ্ড চলে গিয়েছিল! অন্ততঃ সেই পুত্রের জন্য তা চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সেখানে মৃত্যু ঘটেছিল।

একটা বদলী

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে কোরবানীর জন্য আল্লাহ্‌ একটি পশু যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

> *ইব্রাহিম তখন চারিদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তাঁর পিছনে একটা ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আটকে আছে।*
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:১৩ আয়াত)*

সেই ভেড়াটি এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে, নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সেটি নিজেকে আহত করে নি।

তখন ইব্রাহিম গিয়ে ভেড়াটা নিলেন এবং ছেলের বদলে সেই ভেড়াটাই তিনি পোড়ানো-কোরবানীর জন্য ব্যবহার করলেন।
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২ঃ১৩ আয়াত)

হযরত ইব্রাহিমের ছেলের পরিবর্তে সেই ভেড়াটি মারা গিয়েছিল। আল্লাহ্ একটি বিকল্প কোরবানী যুগিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত ইব্রাহিম জানতে পারলেন আল্লাহ্ সত্যিই একজন...

কষ্টের সময়কার উদ্ধারকর্তা। *(নবীদের কিতাব, ইয়ারমিয়া ১৪:৮ আয়াত)*

তিনি সেই জায়গাটার নাম দিলেন ইয়াহ্ওয়েহ্-যিরি (যার মানে 'মাবুদ যোগান')। সেইজন্য আজও লোকে বলে, "মাবুদের পাহাড়ে মাবুদই যুগিয়ে দেন।" *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:১৪ আয়াত)*

আপনি কি লক্ষ্য করেছেন হযরত ইব্রাহিম সেই পাহাড়ের নাম রেখেছিলেন *"মাবুদই যুগিয়ে দেন।"* আমরা এই মাত্র দেখলাম আল্লাহ্ একটি বদলী কোরবানী যুগিয়ে দিয়েছেন। কেন তিনি সেই পাহাড়ের নাম দেন নি *"মাবুদ যুগিয়েছেন"*? এই বইয়ের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

সবার জন্য একটা শিক্ষা

এই ঘটনাটির শেষে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের কাছে তাঁর ওয়াদার কথা পুনরায় নিশ্চিত করে বলেছেন। হযরত ইসহাকের মধ্য দিয়ে তাঁর বংশধর হবে অনেক, অর্থাৎ সমস্ত ইসরাইল জাতি। সেই *"নাজাতদাতা"* হযরত ইব্রাহিম

ও ইস্‌হাকের বংশেরই অন্যতম লোক হবেন এবং তিনি সব লোকদের কাছে একটি রহমতের বিষয় হবেন।

সেইজন্য আমি মাবুদ নিজের নামেই কসম খেয়ে বলছি যে, "...তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতি দোয়া পাবে। তুমি আমার হুকুম পালন করেছ বলেই তা হবে।" (তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২২:১৬খ,১৮ আয়াত)

ছেলেকে কোরবানী করার জন্য হযরত ইব্রাহিমকে দেওয়া আল্লাহ্‌র হুকুমটা ছিল এমন হুকুম, যে হুকুম তিনি আর কখনও কোন মানুষকে দেবেন না। এই হুকুম দ্বারা আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিম ও আমাদের কাছে কয়েকটি সত্য জানাতে চেয়েছিলেন। সেই সত্যগুলো ছিল বিচার, ঈমান ও একজন বদলীর মধ্য দিয়ে নাজাত দান বিষয়ক।

হযরত ইব্রাহিমের ছেলে যেভাবে মৃত্যুর জন্য আল্লাহ্‌র সরাসরি হুকুমের অধীনে ছিলেন, ঠিক একই ভাবে আমরা সমস্ত মানুষ জাতিও একটা মৃত্যুর রায়ের অধীনে আছি।[৫] হযরত ইব্রাহিমের ছেলে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু মাবুদের উপর নির্ভর করে হযরত ইব্রাহিম বিশ্বাস করতেন তাঁর প্রেমময় আল্লাহ্‌ একটা আলাদা উপায় বের করবেন। আর সত্যিই আল্লাহ্‌ একটা ব্যবস্থাও করেছিলেন। আল্লাহ্‌ একটি বদলীর মধ্য দিয়ে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা উপায় করে দিয়েছিলেন। এটা ছিল প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ-দোষীর জন্য নির্দোষীর মৃত্যু।

যেভাবে হাবিল তাঁর নিজের পরিবর্তে একটি পশু কোরবানী করেছিলেন, ঠিক একই ভাবে হযরত ইব্রাহিমের ছেলের জায়গায় সেই ভেড়াটি প্রাণ দিয়েছিল। যেভাবে আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমের ছেলের জায়গায় গ্রহণযোগ্য কোরবানী হিসাবে একটা ভেড়া যুগিয়ে দিয়েছিলেন। এটা ছিল আল্লাহ্‌রই উপায়। আল্লাহ্‌ যে পথ প্রদর্শন করেছেন, সেই পথ অনুসারেই মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে আসতে হবে। মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ্‌র কালাম সত্য।

সপ্তম অধ্যায়

১ হযরত ইয়াকুব ও এহুদা

২ মূসা নবী

৩ ফেরাউন ও উদ্ধার-ঈদ

১ হযরত ইয়াকুব ও এহুদা

একটি সুন্দর ও সুখী জীবন কাটিয়ে অনেক বয়সে তিনি (ইব্রাহিম) ইন্তেকাল করে তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেলেন। মম্রি শহরের পূর্ব দিকে হিট্টীয় সোহরের ছেলে ইফ্রোণের জমিতে মক্‌পেলার গুহায় তাঁর ছেলে ইসহাক ও ইসমাইল তাঁকে দাফন করলেন। এখানেই তাঁর স্ত্রী সারাকে এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২৫:৮-১০ আয়াত)

যদিও হযরত ইব্রাহিম মারা গিয়েছিলেন তবুও আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা সমূহ ভুলে যান নি। আল্লাহ্‌ যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে ইসমাইলেরও অনেক গোষ্ঠী হয়েছিল। এছাড়া আল্লাহ্‌ নতুন করে ইস্‌হাকের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহ্‌ তাঁকে বলেছিলেন তিনিই সেই জাতির পিতা হবেন, যে জাতির মধ্য দিয়েই ***'সেই নাজাতদাতা'*** আসবেন। ইসমাইল ও ইসহাক উভয়েই অনেক দিন যাবৎ বেঁচে থাকার পর মারা যান।

হযরত ইয়াকুব

ইস্‌ ও ইয়াকুব নামে হযরত ইস্‌হাকের দুটি ছেলে ছিল। ইস্‌ ছিলেন ঠিক কাবিলের মত। তিনি তাঁর নিজের খেয়াল খুশীমত চলতেন। তিনি নিজের বুদ্ধির উপর বেশি নির্ভর করতেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করতেন, আর এজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে ধার্মিক বলে গণনা করলেন। প্রায় সময় তিনি কোরবান-গাহে আল্লাহ্‌র কাছে পশু কোরবানী দিতেন।

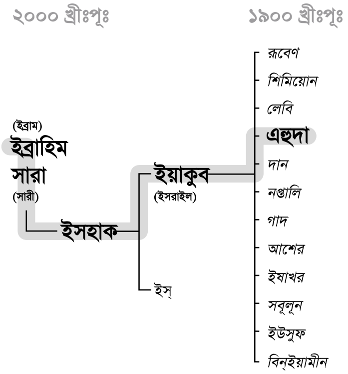

ইয়াকুব... একটা কোরবানগাহ্‌ তৈরী করলেন... কারণ... আল্লাহ্‌ সেখানেই তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩৫:৬,৭ আয়াত)

হযরত ইয়াকুব আল্লাহ্‌র কালামে বিশ্বাস করতেন, যেমন- এই কথাগুলোতে-

...রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না। *(ইবরানী ৯:২২ আয়াত)*

কারণ রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেইজন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্‌ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্‌ ঢাকা দেয়।

(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১৭:১১ আয়াত)

যদিও হযরত ইয়াকুব প্রায় সময়ই বিভিন্ন ভুল ও গুনাহ্‌ করতেন, কিন্তু তিনি সব সময় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ তাঁর নাম

পরিবর্তন করে রেখেছিলেন 'ইসরাইল' যার অর্থ 'আল্লাহ্ বিরাজমান'। আর তিনি হযরত ইয়াকুবের কাছে তাঁর ওয়াদা নতুন করে বললেন। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন-

> *"আমি মাবুদ। আমি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের আল্লাহ্ এবং ইস্হাকেরও আল্লাহ্। ...দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে দোয়া পাবে।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২৮:১৩,১৪ আয়াত)*

আল্লাহ্ বলছিলেন তাঁর বংশধরদের মধ্যে একজন সমস্ত জাতির লোকদের জন্য দোয়া স্বরূপ হবে। সেই ব্যক্তিই হবেন সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা***।

হযরত ইয়াকুবের (অর্থাৎ ইসরাইলের) ১২টি ছেলে ছিল। সেই ১২জনই ইসরাইলের ১২ গোষ্ঠীর পিতা হয়েছিলেন।[১] মৃত্যুর আগে হযরত ইয়াকুব ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন যে, তাঁর ছেলে এহুদার গোষ্ঠীর মধ্য দিয়েই সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*** আসবেন।

হযরত ইব্রাহিম, ইস্হাক ও ইয়াকুব কেনান দেশে যাযাবর হিসাবে বাস করতেন। হযরত ইয়াকুবের জীবনের শেষের কয়েকটি বছর কেনান দেশে এক দুর্ভিক্ষ হয়। তিনি তাঁর ছেলে এবং পরিবারের লোকদের সঙ্গে মিসরে চলে যান। সেই সময় তাদের যৌথ পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ৭০জন। মিসরের সরকার হযরত ইয়াকুবের পরিবারকে গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের সাথে ভাল ব্যবহার করেছিলেন। এর কয়েক বছর আগে হযরত ইয়াকুবের ছেলে ইউসুফকে কেনা-গোলাম হিসেবে মিসরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ হযরত ইউসুফকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে দোয়া করেছিলেন, আর তিনি মিসরের বাদশাহ্ ফেরাউনের একজন গুরুত্বপূর্ণ সহকারী হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণে বাদশাহ্ ফেরাউন হযরত ইউসুফের পরিবারকে নীলনদীর কাছে ভাল জমি দিয়েছিলেন। আর গোশন নামে একটি এলাকায় হযরত ইয়াকুবের পরিবার বসতি স্থাপন করেছিল এবং দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল।

৩৫০ বছর পরেও হযরত ইয়াকুবের পরিবার মিসরে ছিলেন। এখন তাদের লোকসংখ্যা ৭০ জন থেকে বেড়ে ২৫ লক্ষ হয়ে গিয়েছে। হযরত ইব্রাহিম, ইস্হাক ও ইয়াকুবের বংশধরেরা একটা বড় জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের দেশে বাস করছিল না। আল্লাহ্ তাঁদেরকে মিসর দেশের গোশন নয় কিন্তু কেনান দেশ দেবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াদার কথা ভুলে যান নি। হযরত ইয়াকুব মিসরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার পূর্বে আল্লাহ্ তাঁকে বলেছিলেন...

> *"আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি; তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব। এই দেশেই আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমি তোমাকে যা বলেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ২৮:১৫ আয়াত)*

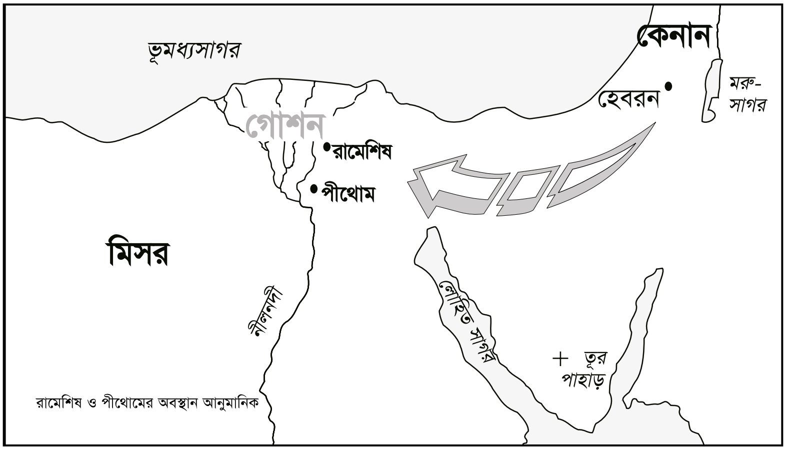

২ মূসা নবী

পঁচিশ লক্ষ বনি-ইসরাইলকে অবহেলা করার কোন উপায় ছিল না। মিসরের বাদশাহ্ (বা ফেরাউন) একটি সিদ্ধান্ত নিলেন।

> *এক সময় মিসর দেশের সমস্ত ক্ষমতা এমন একজন নতুন বাদশাহ্‌র হাতে গেল যিনি ইউসুফের বিষয় কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁর প্রজাদের বললেন, "দেখ, বনি-ইসরাইলরা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় এবং শক্তিতে বেড়ে উঠেছে। তাদের সংখ্যা যেন আর বাড়তে না পারে সেইজন্য এস, আমরা তাদের সংগে কৌশল খাটিয়ে চলি; তা না হলে যুদ্ধের সময়ে তারা হয়তো আমাদের শত্রুদের সংগে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং পরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে।"*
>
> *তাই কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বনি-ইসরাইলদের উপর জুলুম করবার উদ্দেশ্যে মিসরীয়রা তাদের উপর সর্দার নিযুক্ত করল। ফেরাউনের শস্য মজুদ করবার জন্য বনি-ইসরাইলরা পিথোম ও রামিষেষ নামে দু'টা শহর তৈরী করল।*
>
> *কিন্তু তাদের উপর যতই জুলুম করা হল ততই তারা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে দেশের সব দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে বনি-ইসরাইলদের দরুন মিসরীয়দের মনে খুব ভয় হল। তারা তাদের আরও কঠিন পরিশ্রম করতে বাধ্য করল। ক্ষেতের অন্য সব কাজের সংগে তারা তাদের উপর চুনসুরকি আর ইটের কাজের কঠিন পরিশ্রমও চাপিয়ে দিল এবং তাদের জীবন তেতো করে তুলল...।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১:৮–১৪ আয়াত)*

যদিও অবস্থা ভয়ানক ছিল, আল্লাহ্ কিন্তু তাঁর ওয়াদার কথা ভুলে যান নি।

পাক-কিতাবে লেখা আছে-

আল্লাহ্ তাদের কাতর স্বর শুনলেন এবং ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের জন্য যে ব্যবস্থা তিনি স্থাপন করেছিলেন সেই কথা ভাবলেন। তিনি বনি-ইসরাইলদের দিকে চেয়ে দেখলেন এবং তাদের দিকে মনোযোগ দিলেন। *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২:২৪,২৫ আয়াত)*

আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের গোলামীর হাত থেকে বাঁচানোর পরিকল্পনা করলেন। এজন্য তিনি মূসা নবীকে বেছে নিলেন। এই মূসার জন্ম হয়েছিল মিসর দেশে। তাঁর মা-বাবা ছিলেন হযরত ইব্রাহিম, ইস্‌হাক ও ইয়াকুবের বংশধর। হযরত মূসার জন্মের আগে ফেরাউন হুকুম দিলেন দুই বছরের কম বয়সী সব ইসরাইলী শিশুকে মেরে ফেলার জন্য। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা মতে ফেরাউনের মেয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন এবং রাজপ্রাসাদে রেখে মানুষ করেছিলেন। তিনি মিসরের সবচেয়ে ভাল শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

হযরত মূসা যখন বড় হলেন তখন তিনি অন্য এক ইসরাইল ভাইকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। আর তা করতে গিয়ে তিনি একজন মিসরীয়কে খুন করলেন এবং তারপরে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি ভেড়ার রাখালের কাজ নিলেন, আর পরবর্তী ৪০ বছর তিনি ভেড়া চরানো শিখলেন। আল্লাহ্ তাঁর জন্য এই শিক্ষার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।

একদিন মূসা তাঁর শ্বশুর শোয়াইব, অর্থাৎ রূয়েলের ছাগল-ভেড়ার পাল চরাচ্ছিলেন। শোয়াইব ছিলেন মাদিয়ানীয়দের একজন ইমাম। ছাগল-ভেড়ার পাল চরাতে চরাতে মূসা মরুভূমির অন্য ধারে আল্লাহ্‌র পাহাড় তুর পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছালেন।

সেখানে একটা ঝোপের মাঝখানে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে মাবুদের ফেরেশতারা তাঁকে দেখা দিলেন। মূসা দেখলেন যে, ঝোপটাতে আগুন জ্বললেও সেটা পুড়ে যাচ্ছে না।

এই ব্যাপার দেখে তিনি মনে মনে বললেন, "আমি এক পাশে গিয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটা দেখব, দেখব ঝোপটা পুড়ে যাচ্ছে না কেন।" ঝোপটা দেখবার জন্য মূসা একপাশে যাচ্ছেন দেখে মাবুদ আল্লাহ্ ঝোপের মধ্য থেকে ডাকলেন, "মূসা, মূসা।"

মূসা বললেন, "এই যে আমি।"

মাবুদ বললেন, "আর কাছে এসো না। তুমি পবিত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ। তোমার পায়ের জুতা খুলে ফেল। আমি তোমার আব্বার আল্লাহ্; আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের আল্লাহ্।"

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩:১-৬ আয়াত)

সেই ঘটনায় হযরত মূসা অবশ্যই ভয়ে কেঁপেছিলেন। তিনি সেই সর্বশক্তিমান অনন্ত আল্লাহ্ সম্পর্কে জানতেন। তিনি জানতেন আল্লাহ্ই সমস্ত জীবিত প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা-মালিক। তিনি জানতেন মাবুদ এমন একজন পবিত্র আল্লাহ্, যিনি মানুষের গুনাহের দরুন নিজেকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করেছেন। হযরত মূসা নিজেই ছিলেন একজন গুনাহ্গার ও খুনী।

তখন মূসা তাঁর মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ আল্লাহ্র দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হল।

মাবুদ বললেন, "মিসর দেশে আমার লোকদের উপরে যে জুলুম হচ্ছে তা আমার নজর এড়ায় নি। মিসরীয় সর্দারদের জুলুমে বনি-ইসরাইলরা যে হাহাকার করছে তা আমি শুনেছি। তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা আমি জানি...

কাজেই তুমি এখন যাও। আমি তোমাকে ফেরাউনের কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি গিয়ে আমার বান্দাদের, অর্থাৎ বনি-ইসরাইলদের মিসর থেকে বের করে আনবে।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩:৬,৭,১০ আয়াত)*

হযরত মূসা অবশ্যই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁর গুনাহের বিচার করার জন্য আল্লাহ্ আসেন নি, বরং তাঁকে একটা কাজ দিতে এসেছিলেন। হযরত মূসা ছিলেন একজন রাখাল আর সেই কাজকে মনে হয়েছিল খুবই কঠিন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন লোকেরা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে না। যখন তিনি বলবেন একটি জ্বলন্ত ঝোপ তাঁর সাথে কথা বলেছে তখন লোকেরা কি বলবে? তাই হযরত মূসা আল্লাহ্কে বললেন--

"কিন্তু আমি গিয়ে বনি-ইসরাইলদের যখন বলব তাদের পূর্বপুরুষদের আল্লাহ্ আমাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছেন, তখন তারা হয়তো আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তাঁর নাম কি?' সেই সময়ে আমি তাদের কি জবাব দেব?"

*আল্লাহ্ মূসাকে বললেন, **"যিনি 'আমি আছি'** আমিই তিনি। তুমি বনি-ইসরাইলদের বলবে যে, **'আমি আছি'** তাদের কাছে তোমাকে পাঠিয়েছেন'।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩:১৩,১৪ আয়াত)*

'আমি আছি' শব্দের অর্থ সেই আল্লাহ্ যিনি তাঁর নিজের শক্তিতে অস্তিত্ববান।

"আমার চিরকালের নাম মাবুদ। বংশের পর বংশ ধরে আমাকে এই নামেই লোকে মনে রাখবে।

তুমি গিয়ে ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতাদের একসংগে জমায়েত করে তাদের বলবে যে, তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের মাবুদ আল্লাহ্ই তোমাকে দেখা দিয়ে বলেছেন, 'তোমাদের দিকে এবং মিসরে তোমাদের

প্রতি যা করা হচ্ছে তার দিকে আমার খেয়াল আছে। সেইজন্যই আমি বলছি, মিসরের জুলুম থেকে বের করে আমি তোমাদের কেনানীয়, হিট্টীয়, আমোরীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় ও যিবূষীয়দের দেশে নিয়ে যাব। সেখানে দুধ, মধু আর কোন কিছুর অভাব নেই।'"

ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতারা তোমার কথায় কান দেবে।

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩:১৫-১৮ আয়াত)

যদিও অনেক বিষয়ে হযরত মূসার মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু তিনি জানতেন আল্লাহ্ একটি ওয়াদা করলে পর তিনি সব সময় তা পূর্ণও করেন। তাই তিনি ফেরাউন ও বনি-ইসরাইলদের কাছে মিসরে ফিরে এলেন। পথে তিনি তাঁর ভাই হযরত হারুন (আঃ)-এর দেখা পেলেন। তাঁর মুখপাত্র হবার জন্য আল্লাহ্ হযরত হারুনকে পাঠিয়েছিলেন।

এর পরে মূসা ও হারুন মিসরে গিয়ে সমস্ত ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতাদের একসংগে জমায়েত করলেন। মাবুদ মূসাকে যে সব কথা বলেছিলেন তা সবই হারুন তাঁদের জানালেন এবং লোকদের সামনে সেই কেরামতীগুলো দেখালেন।

...তাতে লোকেরা বিশ্বাস করল। তারা যখন শুনল যে, মাবুদ বনি-ইসরাইলদের দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন এবং তাদের কথা ভেবেছেন তখন তারা মাবুদকে সেজদা করলেন। (তৌরাত শরীফ, হিজরত ৪:২৯-৩১ আয়াত)

আল্লাহ্‌র কথামতই সব ঘটনা ঘটেছিল। লোকেরা তাঁদের কথা বিশ্বাস করেছিল এবং আল্লাহ্‌র এবাদত করেছিল। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করছিলেন।

৩ ফেরাউন ও উদ্ধার-ঈদ

হযরত মূসা বনি-ইসরাইল নেতাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু এখন তাঁকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা সম্বন্ধে ফেরাউনের কাছে বলতে হবে। কিভাবে তা বলবেন, সে ব্যাপারে তাঁর মনে ভয় ছিল।

পরে মূসা ও হারুন গিয়ে ফেরাউনকে বললেন, "আল্লাহ্, যিনি ইসরাইলদের মাবুদ্, তিনি বলছেন, 'আমার বান্দাদের যেতে দাও।'"

কিন্তু ফেরাউন বললেন, "কে আবার এই মাবুদ, যে আমি তার হুকুম মেনে বনি-ইসরাইলদের যেতে দেব- এই মাবুদকেও আমি চিনি না আর ইসরাইলীয়দেরও আমি যেতে দেব না।"

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৫:১,২ আয়াত)

একটি বিষয়ে ফেরাউন সত্যি কথাই বলেছিলেন- তিনি মাবুদের বিষয়ে জানেন

না। মিসরীয়রা অনেক দেব-দেবীর উপাসনা করত, যেমন- তারা সূর্য দেবতা, বজ্রের দেবতা, নীলনদের উপাসনা করত। এমনকি ফেরাউনকেও একজন দেবতা হিসাবে গণ্য করা হত। প্রত্যেক দেবতার আলাদা আলাদা প্রতীক ছিল, যেমন- শকুন, ব্যাঙ, বিছা, ইত্যাদি। সৃষ্টিকর্তার বদলে মিসরীয়রা সৃষ্ট বস্তুর পূজা করত। ফেরাউন যে শুধু একমাত্র সত্য আল্লাহ্ সম্পর্কেই জানতেন না তা নয়, তিনি তাঁর সম্পর্কে জানতেও চাইতেন না। কারণ ফেরাউন যদি একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র এবাদত করেন এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করেন তাহলে তাঁকে অনেক শক্তি ও ক্ষমতা হারাতে হবে। তিনি যদি বনি-ইসরাইলদের চলে যেতে দেন, তাহলে মিসর বিনামূল্যের শ্রম হারাবে। তাই ফেরাউন বনি-ইসরাইলদের যেতে দিবেনই না।

> *মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি দেখে নিয়ো, ফেরাউনের অবস্থা এবার আমি কি করি। ...মিসরীয়দের চাপিয়ে দেওয়া বোঝার তলা থেকে আমি তোমাদের বের করে নিয়ে আসব। তাদের গোলামী থেকে আমি তোমাদের উদ্ধার করব। ...ভীষণ শাস্তি দিয়ে আমি তোমাদের মুক্ত করব।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৬:১,৬ আয়াত)*

আল্লাহ্ মূসা নবীকে বলেছিলেন যে, তিনি মিসর দেশের উপর গজব আকারে শাস্তি বয়ে আনবেন। আর তা না করলে ফেরাউন ইসরাইলদেরকে যেতে দেবেন না। এই পরিকল্পনাটির কথা শুনে হযরত মূসা ভয় পেয়ে গেলেন। এতে ফেরাউন কি পাল্টা দুর্ব্যবহার করবেন? মাবুদ বনি-ইসরাইলদের সাহস দিয়েছিলেন। তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাছে করা তাঁর ওয়াদার কথা তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন। সেই ওয়াদাটি ছিল-

> *"আমার নিজের বান্দা হিসাবে আমি তোমাদের কবুল করব আর তোমাদের আল্লাহ্ হব। ...যে দেশ দেবার কসম আমি ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে খেয়েছিলাম সেই দেশেই আমি তোমাদের নিয়ে যাব এবং সেই দেশের অধিকার আমি তোমাদের দেব। আমিই মাবুদ।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৬:৭,৮ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র লোকেরা

আল্লাহ্ বলেছিলেন বনি-ইসরাইলরা তাঁর নিজের লোক হবে। এর অর্থ এই নয় যে, *কেবলমাত্র* বনি-ইসরাইলরাই একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র এবাদত ও তাঁকে অনুসরণ করতে পারবে। বরং বনি-ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সব জাতিরা জানতে পারবে আল্লাহ্ কেমন। আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে দেখতে পাবে কিভাবে আল্লাহ্ মানুষের সাথে আচরণ করেন। পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব বনি-ইসরাইল জাতি তাদের এই দায়িত্ব কতটুকু পূর্ণ করেছিল।

আল্লাহ্ বলেছিলেন বনি-ইসরাইলদের মুক্ত করার জন্য তিনি মিসর দেশের উপর গজব পাঠাবেন। এভাবে শক্তি দেখানোর সময় মিসরীয় ও বনি ইসরাইল উভয়কে তিনি তাঁর নিজের বিষয়ে কিছু একটা শিক্ষা দেবেন।

ইসরাইলদের জন্য শিক্ষা হবে...

> *"তখন তোমরা জানতে পারবে যে, **আমি আল্লাহ্ই তোমাদের মাবুদ,** আর মিসরীয়দের বোঝার তলা থেকে আমিই তোমাদের বের করে এনেছি।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৬:৭ আয়াত)*

মিসরীয়দের জন্য শিক্ষা হবে...

> *"আমি যখন আমার কুদরত ব্যবহার করে মিসর দেশের মধ্য থেকে বনি-ইসরাইলদের বের করে আনব তখন **মিসরীয়রা বুঝতে পারবে যে, আমি মাবুদ।"*** *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৭:৫ আয়াত)*

আল্লাহ্ উভয় জাতিকেই একই বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। সেই বিষয়টি হল তিনিই একমাত্র আল্লাহ্। কিন্তু হযরত মূসা ও হারুনের কথায় ফেরাউন কান দেবেন না। তাই আল্লাহ্ তাঁদেরকে বলেছেন-

> *"কাল সকালে ফেরাউন যখন বাইরে নদীর ঘাটে যাবে, তখন তুমি তার সংগে দেখা করবার জন্য নীল নদের ধারে দাঁড়িয়ে থেকো। ...তাকে বোলো, 'ইবরানীদের মাবুদ আল্লাহ্ আমাকে এই কথা বলতে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন যে, তাঁর লোকেরা যাতে মরুভূমিতে তাঁর এবাদত করতে পারে সেইজন্য আপনি যেন তাদের যেতে দেন। কিন্তু এই পর্যন্ত আপনি তাঁর কথায় কান দেন নি।"*
>
> *সেইজন্য মাবুদ বলছেন, "তিনিই যে মাবুদ তা আপনি এই চিহ্ন দেখে বুঝতে পারবেন।" তুমি বলবে, "আমি এখন আমার হাতের এই লাঠিটা দিয়ে নীল নদের পানিতে আঘাত করতে যাচ্ছি আর তাতে নদীর পানি রক্ত হয়ে যাবে। এর ফলে সব মাছ মরে যাবে আর এমন পচা দুর্গন্ধ বের হবে যে, পানি খেতে গিয়ে মিসরীয়রা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৭:১৫-১৮ আয়াত)*

সত্যিই তা ঘটেছিল। প্রাচীন মিসরীয় ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে আল্লাহ্ আঘাত করেছিলেন। নীলনদ ছিল মিসরীয়দের অন্যতম দেবতা। আল্লাহ্ সেই নদীর পানিকে রক্তে পরিণত করলেন। এর ফলে মিসরীয়দের কাছে সেই নদীটি ঘৃণ্য হয়ে উঠল! কিন্তু...

> *"ফেরাউনের মন আরও কঠিন হয়ে উঠল। মাবুদ যা বলেছিলেন তা-ই হল; মূসা ও হারুনের কথা ফেরাউন শুনলেন না... তিনি সেই দিকে খেয়ালই করলেন না।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৭:২২,২৩ আয়াত)*

আল্লাহ্ বনাম দেবতাগণ

আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। ইসরাইলদের মুক্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ ফেরাউনকে সতর্ক করে দিলেন। ফেরাউন তাতে 'না' বললেন। মিসরীয়দের দেবতাদের উপর আক্রমণ করার জন্য আল্লাহ্ একটি একটি করে নতুন গজব আনলেন।

প্রথমে নীলনদীর পানি রক্তে পরিণত হল।

এর পরে আল্লাহ্ প্রত্যেকটি জায়গায়, অর্থাৎ খাবারের মধ্যে, বিছানায়, সবখানে ঝাঁকে ঝাঁকে *ব্যাঙ* পাঠালেন।

এরপর আল্লাহ্ *মশার উৎপাত* পাঠালেন।

এর পর পরই পাঠালেন *পোকার* উৎপাত।

এরপর পাঠালেন গৃহপালিত *পশুর* উপর মড়ক। সব পশু মারা গেল।

এরপর সমস্ত লোকের উপর *ফোঁড়ার* ঘা উঠল।

এরপর *শিলাবৃষ্টি* এসে সমস্ত ফসল ধ্বংস করল।

শিলাবৃষ্টিতে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া ফসলগুলো *পংগপাল* খেয়ে ফেলল।

নবম গজবটি মিসরীয়দের মিথ্যা দেবতা সূর্যের উপর আঘাত হানল। এর ফলে *অন্ধকার* নেমে আসল।

সব মিলে আল্লাহ্ দশটি গজব পাঠালেন। এই শেষ গজবটি ছিল সবচেয়ে ভয়ানক। আল্লাহ্ হযরত মূসা ও হারুনের সাথে কথা বললেন।

> *তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "আমি ফেরাউন ও মিসর দেশের উপর আর একটা গজব নাজেল করব। তার পরে ফেরাউন এখান থেকে তোমাদের যেতে দেবে। তবে সে যখন তোমাদের যেতে দেবে তখন এখান থেকে তোমাদের সে একেবারে তাড়িয়েই বিদায় করবে।"*
>
> *মূসা ফেরাউনকে বললেন, "মাবুদ বলছেন, তিনি মাঝরাতে মিসর দেশের মধ্য দিয়ে যাবেন। তাতে মিসর দেশের সব পরিবারের প্রথম ছেলে মারা যাবে। সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে শুরু করে জাঁতা ঘুরানো বান্দীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত কেউ বাদ যাবে না।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১১:১,৪,৫ আয়াত)*

শেষ গজবটি সত্যিই সবচেয়ে খারাপ ছিল। প্রতিটি পরিবার আল্লাহ্র নির্দেশ সমূহ অনুসরণ না করলে এটি মিসরীয় ও বনি-ইসরাইলদের উপর একই ভাবে পড়ত। ন্যায়বান আল্লাহ্ হিসাবে মাবুদ গুনাহের উপরে বিচার বয়ে আনছিলেন। কিন্তু মহব্বতপূর্ণ আল্লাহ্ হিসাবে তিনি দয়া করে এই গজবের হাত থেকে বাঁচার

একটি উপায়ও করে দিচ্ছিলেন। একজন লোক ইসরাইল নাকি মিসরীয় সেটা কোন ব্যাপার ছিল না। তাঁর চোখে সবাই সমান। উভয়েই আল্লাহ্‌র মহব্বতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে *পারলেও* উভয়েই আল্লাহ্‌র বিচারের অভিজ্ঞতা লাভ ***করবে*** যদি তারা আল্লাহ্‌র কথা না শুনে। আল্লাহ্‌ বলেছেন-

একটা ভেড়ার বাচ্চা নাও...

> *"এই মাসের দশ তারিখে প্রত্যেকটি পরিবারের কর্তা নিজের পরিবারের জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা বেছে নেয়। প্রত্যেক বাড়ীর জন্য একটা করে ভেড়ার বাচ্চা নিতে হবে।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:৩ আয়াত)*

একটা খুঁতহীন পুরুষ ভেড়া। কোন ভাবেই সেটিকে খুঁতযুক্ত হওয়া চলবে না। আল্লাহ্‌ একটা নিখুঁত ভেড়ার বাচ্চার কথা বলছিলেন।

> *"সেই বাচ্চাটা হবে ছাগল বা ভেড়ার পাল থেকে বেছে নেওয়া একটা এক বছরের পুরুষ বাচ্চা। তার শরীরে যেন কোথাও কোন খুঁত না থাকে।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২ঃ৫ আয়াত)*

ঠিক সময়ে সেই ভেড়ার বাচ্চাটাকে জবাই কর।

> *"বাচ্চাটা এই মাসের চৌদ্দ তারিখ পর্যন্ত রাখতে হবে। তারপর সেই দিন বেলা ডুবে গেলে পর গোটা ইসরাইল সমাজের প্রত্যেকটি পরিবার নিজের নিজের ভেড়ার বাচ্চা জবাই করবে।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:৬ আয়াত)*

সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু'পাশে এবং উপরে রক্ত লাগাও।

> *"তারপর যে সব ঘরে তারা সেই ভেড়ার গোশ্‌ত খাবে সেই সব ঘরের দরজার চৌকাঠের দু'পাশে এবং উপরে কিছু রক্ত নিয়ে লাগিয়ে দেবে।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:৭ আয়াত)*

সকাল না হওয়া পর্যন্ত ঘরের ভিতরে থাক।

> *"সকাল না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘরের বাইরে যাবে না।"*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:২২ আয়াত)*

সেই ভেড়ার কোন হাড়ই তোমরা ভেঙ্গো না।

> *"যে বাড়ীতে ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হবে সেই বাড়ীতেই তা খেতে হবে। বাড়ীর বাইরে তা নেওয়া চলবে না এবং সেই ভেড়ার একটা হাড়ও ভাংগা চলবে না।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:৪৬ আয়াত)*

আমি তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব।

> *"সেই রাতেই আমি মিসর দেশের ভিতর দিয়ে যাব এবং মানুষের প্রথম ছেলে ও পশুর প্রথম পুরুষ বাচ্চাকে মেরে ফেলব। **আমি মিসরের সব দেব-দেবীদের উপর গজব নাজেল করব;** আমি মাবুদ।*

কিন্তু তোমাদের ঘরে যে রক্ত লাগানো থাকবে সেটাই হবে তোমাদের চিহ্ন। আর আমি সেই রক্ত দেখে তোমাদের বাদ দিয়ে এগিয়ে যাব। তাতে মিসর দেশের উপর আমার গজবের বিপদ থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:১২,১৩ আয়াত)*

সেই রাতে বিচারক হিসাবে আল্লাহ্‌ মানুষ ও পশুর সব প্রথমজাত সন্তানকে হত্যা করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর রহমতে তিনি বনি-ইসরাইল হোক বা মিসরীয় হোক, যেসব ঘরের দরজার উপরে রক্ত লাগানো ছিল সেসব ঘর বাদ দিয়ে এগিয়ে যাবেন। ঘরের চৌকাঠের উপর রক্ত লাগানো দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল সেই ঘরের লোকেরা আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কথা রাখবেন।

চিন্তা করা

কল্পনা করুন যদি কোন লোক বলত, "এটা হাস্যকর। কেন আমাকে আমার সবচেয়ে ভাল ভেড়ার বাচ্চাটি জবাই করতে হবে! আমার একটা খোঁড়া ভেড়ার বাচ্চা আছে। এটা জবাই করলেও তো চলবে।"

তাহলে কি ঘটত? আবার অন্য কেউ একজন যদি তার বন্ধুদের ডেকে বলত, "আজকের রাতটা খুবই সুন্দর। চল না আমরা বাইরে গিয়ে আমোদ-ফূর্তি আর খাওয়া-দাওয়া করি।"

যদি এরকম কিছু ঘটত তাহলে কি আল্লাহ্ তাঁর বিচার কাজ বন্ধ রাখতেন? তিনি কি সেই ঘরগুলো বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতেন? সেই লোকদের উদ্দেশ্য ভাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের করা কাজ দ্বারা আল্লাহ্র কথা অমান্য করা হত। অর্থাৎ এটা হত তাদের নিজেদের ইচ্ছামত করা কাজ। কাবিলও নিজের ইচ্ছামত কাজ করেছিল। আবার নূহ নবীর সময়কার লোকেরাও সেরকমটি করেছিল। আর তাই কাবিল ও হযরত নূহের সময়ের লোকেরা শাস্তি পেয়েছিল। একই ভাবে হযরত মূসার সময়কার অবাধ্য ইসরাইলদেরও মিসরীয়দের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি পেতে হত আর এতে ঈমান না আনার দরুন তারা তাদের যোগ্য শাস্তিই পেত।

কিন্তু একজন মিসরীয় যদি বলত, "আমি জানি আমাদের মিসরীয় দেবতারা মিথ্যা। বনি-ইসরাইলরা একমাত্র সত্য আল্লাহ্র এবাদত করে। আমি আল্লাহ্কেই অনুসরণ করতে চাই। আল্লাহ্ আমার কাছ থেকে কি চান?" এভাবে সে যদি সেই একমাত্র সত্য আল্লাহ্র উপর ঈমান আনত এবং আল্লাহ্র নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করত, তাহলে আল্লাহ্ কি সেই রাতে সেই মিসরীয়কে বাদ দিয়ে এগিয়ে যেতেন? সেই মিসরীয়টি কি সেই শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারত? হ্যাঁ। সেই মিসরীয়টি সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পেত। যদি সে মাবুদের উপর ঈমান আনত ও তাঁর কথা শুনত, তাহলে আল্লাহ্ তার প্রতি রহমত প্রকাশ করতেন।

> *তারপর চৌদ্দ তারিখের মাঝরাতে মাবুদ মিসর দেশের প্রত্যেকটি প্রথম ছেলেকে মেরে ফেললেন। এতে রাজ-সিংহাসনের অধিকারী ফেরাউনের প্রথম ছেলে থেকে জেলখানার কয়েদীর প্রথম ছেলে পর্যন্ত, এমন কি, পশুদেরও প্রথম পুরুষ বাচ্চা মারা পড়ল।*
>
> *সেই রাতে ফেরাউন ও তাঁর সব কর্মচারী এবং মিসরের প্রত্যেকটি লোক ঘুম থেকে জেগে উঠল; আর সারা মিসর দেশে একটা কান্নার রোল পড়ে গেল, কারণ এমন একটাও বাড়ী ছিল না যেখানে কেউ মারা যায় নি।*
>
> *মাবুদ মূসা ও হারুনকে যে হুকুম দিয়েছিলেন বনি-ইসরাইলরা ঠিক তা-ই করেছিল। মাবুদ সেই দিনই সৈন্যদলের মত করে বনি-ইসরাইলদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:২৯-৩২; ৫০-৫১ আয়াত)*

আল্লাহ্ তাঁর কথা রাখেন

আল্লাহ্ রহমত করে মূসা নবীর মধ্য দিয়ে ফেরাউনকে একটা পরিষ্কার বাণী দিয়েছিলেন। ফেরাউন যাতে তাঁর কথা মেনে নিয়ে বনি-ইসরাইলদেরকে

মিসর ছেড়ে যেতে দেন সেজন্য আল্লাহ্ তাঁকে অনেক সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফেরাউন তা করতে অস্বীকার করেছিলেন। তাই আল্লাহ্ যা করবেন বলে বলেছিলেন, সেভাবে তিনি মিসরের বিচার করলেন। তিনি আমাদের মত নন। আমরা ছেলেমেয়েদেরকে শাসন করার ভয় দেখিয়ে পরে আর শাসন করি না। কিন্তু আল্লাহ্ সব সময়ই তাঁর কথা পূর্ণ করেন।

অন্যদিকে ইসরাইলরা আল্লাহ্র রহমত পেয়েছিল, কারণ তারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছিল। আল্লাহ্ যখন শাস্তি দেওয়ার জন্য এসেছিলেন তখন দরজার চৌকাঠের উপরে রক্ত দেখে সেই ঘরকে বাদ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সেই ঘরের প্রথমজাত ছেলেটি বেঁচে গিয়েছিল, কারণ তার পরিবর্তে একটি ভেড়ার বাচ্চা মরেছিল। আর সৃষ্টির শুরু থেকে এ রকমটিই হয়েছে। হাবিলের গুনাহ্ ঋণের মূল্য হিসাবে আল্লাহ্ তাঁর পশু কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন। যখন হযরত ইব্রাহিম তাঁর পুত্রকে কোরবানী হিসেবে দান করেছিলেন তখন তাঁর ছেলের জায়গায় একটি ভেড়া মরেছিল। আর এখন উদ্ধার-ঈদের সময়টাতে বড় ছেলের জায়গায় মারা গিয়েছে ভেড়ার বাচ্চা।

একজন লোক যে নাজাতদাতা হিসাবে আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে, এই বদলী কোরবানী ছিল তার দৃশ্য প্রমাণ। মাবুদের উপর ঈমান এনেছে বলে সে তাঁর বাধ্য ছিল।

আল্লাহ্ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, সেভাবে এই উদ্ধার-ঈদটি বনি-ইসরাইল লোকদের জন্য একটি নিয়মিত ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ্ যে তাঁর লোকদেরকে গোলামীর হাত থেকে মুক্ত করেছেন, সেজন্য প্রত্যেক বছর লোকেরা উদ্ধার-ঈদ উদ্‌যাপন ও স্মরণ করবে।

> *"তোমাদের জন্য সেই দিনটা হবে একটা স্মরণীয় দিন। মাবুদের উদ্দেশে এই ঈদটি একটা চিরকালের নিয়ম হিসাবে তোমরা বংশের পর বংশ ধরে পালন করবে।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১২:১৪ আয়াত)*

এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের অনেক বংশধরেরা খারাপীর হাত থেকে আল্লাহ্র সুরক্ষা পাওয়ার একটা চিহ্ন হিসেবে তাদের ঘরের দরজায় বা দেওয়ালে কোরবানীর পশুর রক্ত লাগিয়ে রাখে। আমরা জানি না এই বংশধরেরা সত্যিকার ভাবে কোরবানী করার কথা বুঝে কিনা। কিন্তু আমরা একথা জানি যে, যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ তাঁর রহমত দেখিয়েছিলেন।

আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদেরকে তাদের গোলামী থেকে মুক্ত করেছিলেন। তাদের মিসরীয় মনিবেরা তাদেরকে মিসর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর কথা রেখেছিলেন। আল্লাহ্ যেভাবে ঘটবে বলেছিলেন, এটা সেভাবেই ঘটেছিল।

অষ্টম অধ্যায়

১ রুটি, বাবুই পাখি ও পানি

২ দশটি বিশেষ হুকুম

৩ আদালত-ঘর

১ রুটি, বারুই পাখি ও পানি

ওয়াদা-করা দেশের উদ্দেশে দীর্ঘ যাত্রার জন্য বনি-ইসরাইল জাতি আনন্দ-উল্লাস করতে করতে মিসর দেশ ছেড়েছিল। নিজেদের উপর নেমে আসা গজবের দরুন মিস-রীয়রা চেয়েছিল ইসরাইলরা যাতে তাড়াতাড়ি তাদের দেশ ছেড়ে চলে যায়। তারা অনেক দামী দামী জিনিষ ইসরাইলদেরকে দিয়েছিল। যাত্রার জন্য ভাল মত প্রস্তুত হতে ইসরাইলদের খুব কম সময়ই ছিল। মিসর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের সংখ্যা ছিল পঁচিশ লক্ষ। তাদের মধ্যে অনেক দ্বিধা কাজ করেছিল। কিন্তু কিভাবে হযরত মূসা ইসরাইলদেরকে নেতৃত্ব দেবেন? কিভাবে সব লোকেরা তাঁর কথা শুনতে পারবে বা এমনকি তাঁকে দেখতে পারবে? আল্লাহ্ এই সমস্যার সমাধান দান করেছিলেন।

> *মাবুদ তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দিনের বেলায় মেঘের থামের মধ্যে আর রাতের বেলায় আলো দেবার জন্য আগুনের থামের মধ্যে উপস্থিত থেকে তাদের আগে আগে যেতেন। এতে তারা দিনে ও রাতে সব সময়েই চলতে পারত।* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৩:২১ আয়াত)*

রাতের বেলায় আগুনের থামের আলোতে ইসরাইলরা সবাই তাড়াতাড়ি নিজেদেরকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। দিনের বেলায় তারা একটি বিশেষ মেঘের থাম অনুসরণ করেছিল এবং তাদেরকে পরিচালনা দানের জন্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করেছিল। এমনকি তারা আল্লাহ্র আগুনের থামের সাহায্যে রাতের বেলায় যাত্রা করতে পারত।

মিসর থেকে ইসরাইল দেশে যাওয়ার সবচেয়ে সরাসরি পথটির আশেপাশে অনেক শক্তিশালী উপজাতি বাস করত। এই উপজাতিদের মধ্যে বেশীর ভাগই যুদ্ধ করে নিজেদেরকে রক্ষার ব্যাপারে খুবই দক্ষ ছিল। আমরা বুঝতে পারি কেন উপজাতির লোকেরা ২৫ লক্ষ ইসরাইলদের বিপরীতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাইত। কিন্তু...

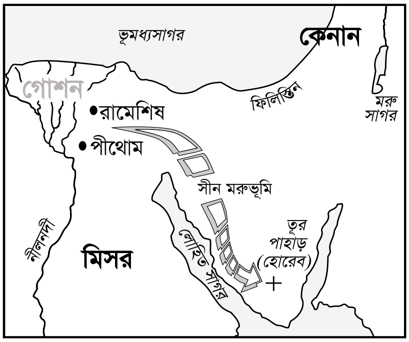

> *আল্লাহ্ তাদের ফিলিস্তিনীদের দেশের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলেন না, যদিও সেটাই ছিল সবচেয়ে সোজা পথ। আল্লাহ্ বলেছিলেন সেই দেশের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে যদি তারা যুদ্ধ করবার অবস্থায় পড়ে তবে হয়তো মন বদলিয়ে তারা আবার মিসর দেশে ফিরে যাবে। সেইজন্য আল্লাহ্ তাদের মরুভূমির মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরের দিকে নিয়ে চললেন...।*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৩:১৭,১৮ আয়াত)*

আল্লাহ্ সেই বনি-ইসরাইলদেরকে রক্ষা করে চলছিলেন। তিনি তাদেরকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে একটি আশ্চর্য উপায়ে তিনি তাদেরকে নিয়ে লোহিত সাগরের[১] মধ্য দিয়ে পার হয়েছিলেন, আর যে মিসরীয়রা তাদের পেছন থেকে তাড়া করছিল, তাদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এরপরে তিনি তাদের সিন মরুভূমির মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানটায় প্রায় খুব কম লোকই ছিল। সেখানটায় তাদের কোন শত্রু না থাকলেও খুব কম খাবার ও পান করার পানি ছিল। আল্লাহ্র উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে লোকেরা রেগে গিয়ে নালিশ করেছিল।

> *সিন মরুভূমিতে বনি-ইসরাইলদের গোটা দলটা মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে নানা কথা বলতে লাগল। তারা তাঁদের বলল, "মিসর দেশে মাবুদের হাতে আমরা কেন মরলাম না। সেখানে আমরা গোশ্তের হাঁড়ি সামনে নিয়ে পেট ভরে রুটি-গোশ্ত খেতাম। আমাদের এই গোটা দলটাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবার জন্যই আপনারা আমাদের এই মরুভূমির মধ্যে এনেছেন।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৬:২,৩ আয়াত)*

লোকেরা যেখানে গোলামী করত, তারা আবার সেই মিসরে ফিরে যেতে চেয়েছিল। এই অবিশ্বস্ত মনোভাব দুঃখজনক আর হতাশার। আল্লাহ্তা'লা আশ্চর্য ভাবে ইসরাইলদের রক্ষা করেছিলেন ও যত্ন নিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে ছেড়ে যান নি। যদি তারা আল্লাহ্র কাছে চাইত তাহলে তিনি তাদেরকে প্রচুর খাবার যুগিয়ে দিতেন, কারণ তিনি তাদের যোগানদাতা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা না করে তারা নালিশ করেছিল!

> *তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "বনি-ইসরাইলরা আমার বিরুদ্ধে যে সব কথা বলেছে তা আমি শুনেছি। তাদের এই কথা বল যে, তারা সন্ধ্যাবেলায় গোশ্ত খাবে আর সকালবেলায় খাবে পেট ভরে রুটি। এতে তারা জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহ্ই তাদের মাবুদ।"*
>
> *সন্ধ্যাবেলায় অনেক ভারুই পাখী এসে তাদের ছাউনি-এলাকাটা ছেয়ে ফেলল। সকালবেলায় দেখা গেল শিবিরের চারপাশটা শিশিরে ঢাকা পড়ে গেছে। যখন সেই শিশির মিলিয়ে গেল তখন মাটিতে মাছের আঁশের মত পাতলা এক রকম জিনিস দেখা গেল। সেগুলো দেখতে ছিল পড়ে থাকা তুষারের মত। তা দেখে বনি-ইসরাইলরা একজন অন্যজনকে বলল, "ওগুলো কি?" ওগুলো যে কি, তা তারা জানত না।*
>
> *তখন মূসা তাদের বললেন, "ওগুলোই সেই রুটি যা মাবুদ তোমাদের খেতে দিয়েছেন।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৬:১১-১৫ আয়াত)*

আল্লাহ্ তাদের সকলের জন্য মাংস ও রুটি যুগিয়ে দিয়েছিলেন। এর জন্য এমনকি তাদের পরিশ্রম করতে হয় নি। প্রতিদিন সেই রুটি পাওয়া যেত এবং

প্রত্যেকদিন তারা জানতে পারত *"আল্লাহ্ই যুগিয়ে দেন।"* নালিশ করা নিয়ে তারা নিশ্চয় লজ্জিত ছিল। আল্লাহ্ তখনও তাদেরকে আরও একটি শিক্ষা দিচ্ছিলেন।

একটি সহজ শিক্ষা

সেই রুটিটির একটি উদ্দেশ্য ছিল যা খাবারের চেয়েও বড় বিষয়। আল্লাহ্ বলেছেন...

> *"তারা আমার নির্দেশ মত চলবে কি না সেই বিষয়ে আমি তাদের পরীক্ষা নেব।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৬:৪ আয়াত)*

আল্লাহ্ হযরত মূসাকে বললেন লোকেরা যাতে শুধুমাত্র একদিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার কুড়িয়ে নেয়। এটা ছিল একটা সহজ নির্দেশ...

> *কিন্তু কেউ কেউ মূসার কথা না শুনে সকালের জন্য কিছু রেখে দিল। তাতে সেগুলোতে পোকা ধরল আর দুর্গন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থা দেখে মূসা তাদের উপর রাগে জ্বলে উঠলেন।* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৬:২০ আয়াত)*

এটা ছিল একটা সহজ শিক্ষা। কেউ এতে কষ্ট পায় নি। কিন্তু তারা শিখেছিল তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্র কথা মানতে হবে। কিন্তু অবাধ্যতা কষ্ট বয়ে এনেছিল।

নালিশ করা

> *পরে মাবুদের হুকুমে বনি-ইসরাইলদের দলটা সিন মরুভূমি থেকে যাত্রা করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এগিয়ে যেতে যেতে শেষে রফীদীমে গিয়ে ছাউনি ফেলল। কিন্তু সেখানে খাবার পানি ছিল না। এইজন্য তারা মূসার সংগে ঝগড়া করে বলল, "আমাদের খাবার পানি দিন। ...আমরা যাতে পানির অভাবে মারা যাই সেইজন্যই কি আপনি আমাদের এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের ও পশুগুলো মিসর থেকে নিয়ে এসেছেন?"*
>
> *এই কথা শুনে মূসা মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে বললেন, "আমি এই লোকদের নিয়ে কি করব? আর একটু হলেই তো তারা আমাকে পাথর মারবে।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৭:১,২,৪ আয়াত)*

বনি-ইসরাইলরা তাদের আগের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি। আবার তারা নালিশ করেছিল। এবার তাদের পানি দরকার হয়েছিল। আল্লাহ্র লোক হলেও তারা সন্তুষ্ট মনে আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করছিল না।

> *তখন মাবুদ মূসাকে বললেন, "বনি-ইসরাইলদের কয়েকজন বৃদ্ধ নেতাকে সংগে নিয়ে তুমি লোকদের আগে চলে যাও। যে লাঠি দিয়ে তুমি নীল নদকে আঘাত করেছিলে সেটাই হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও। তারপর আমি তুর পাহাড়ের কাছে তোমার সামনে একটা পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়াব। তুমি সেই পাথরের গায়ে আঘাত করবে আর তাতে লোকদের খাবার জন্য সেখান থেকে পানি বের হয়ে আসবে।"*

ইসরাইলীয় বৃদ্ধ নেতাদের সামনে মূসা তা-ই করলেন।
(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৭:৫,৬ আয়াত)

পানি

কিছু কিছু চিত্রশিল্পী এই অলৌকিক কাজটির ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ পাহাড়ের পাশে লাঠি হাতে দাঁড়ানো অবস্থায় মূসা নবীর একটা ছবি এঁকেছে। পাথর থেকে একটা ছোট ঝর্ণা থেকে পানি বের হয়ে আসছে। কিন্তু আসলে সেখানে এত লোক আর গবাদি পশু ছিল যে, পানি নিশ্চয়ই খুব দ্রুত বের হয়ে এসেছিল। সব লোক ও পশুরা পর্যাপ্ত পানি পান করেছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে-

তিনি পাথর খুলে দিলেন, তাতে পানি বেরিয়ে আসল; শুক্‌না জায়গার মধ্য দিয়ে তা নদীর মত বয়ে গেল। *(জবুর শরীফ ১০৫:৪১ আয়াত)*

যদিও ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র সাহায্য পাবার অযোগ্য ছিল, তবুও মাবুদ তাদের প্রয়োজন সমূহ যুগিয়ে দিয়েছিলেন। সৃষ্টিকর্তা-মালিক হিসেবে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। গুনাহের অবশ্যই পরিণাম আছে। কিন্তু আল্লাহ্ ছিলেন ধৈর্যশীল ও দয়ালু। তিনি তাদের প্রতি রহম করলেন, যা তারা পাওয়ার অযোগ্য ছিল। গুনাহ্‌গার হিসাবে মানুষ আল্লাহ্‌র রহমতপূর্ণ মহব্বত পাবার অযোগ্য। কিন্তু মানুষের গুনাহ্ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাদের জন্য চিন্তা করেন।

২ দশটি বিশেষ হুকুম

মাবুদ বলেছেন যে, বনি-ইসরাইলদেরকে সারা দুনিয়ার বাকী লোকদের কাছে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্কের বিষয় দেখাতে হবে। কিন্তু ইসরাইলদের আল্লাহ্‌র বিষয়ে অনেক কিছু শেখার ছিল। আল্লাহ্ তাদের কাছে তাঁর চরিত্র প্রকাশ করেই চলেছিলেন।

মিসর দেশ থেকে বের হয়ে আসবার পরে তৃতীয় মাসে বনি-ইসরাইলরা সিনাই মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছাল। তারা রফীদীম ছেড়ে এসে তুর পাহাড়ের সামনে সিনাই মরুভূমিতে ছাউনি ফেলল।

পরে মূসা পাহাড়ের উপরে আল্লাহ্‌র কাছে উঠে গেলেন। সেই সময় মাবুদ পাহাড়ের উপর থেকে তাঁকে ডেকে বললেন, "তুমি... বনি-ইসরাইলদের বল যে, তারা নিজেরাই দেখেছে, মিসরীয়দের দশা আমি কি করেছি। ঈগল পাখীর ডানায় বয়ে নেবার মত করে আমি বনি-ইসরাইলদের নিজের কাছে নিয়ে এসেছি। সেইজন্য যদি তারা আমার সব কথা মেনে চলে এবং আমার ব্যবস্থা পালন করে তবে দুনিয়ার সব জাতির মধ্য থেকে তারাই হবে আমার নিজের বিশেষ

সম্পত্তি, কারণ দুনিয়ার সব লোকই আমার অধিকারে। আমার এই লোকদের দিয়েই গড়া হবে আমার ইমামদের রাজ্য এবং এই জাতিই হবে আমার পবিত্র জাতি। এই কথাগুলো তুমি বনি-ইসরাইলদের জানিয়ে দাও।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৯:১-৬ আয়াত)*

যদি... তবে

আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদেরকে বলেছিলেন, "যদি তোমরা আমার সব কথা মেনে চল তাহলে আমি তোমাদেরকে গ্রহণ করব। তোমরা অন্য জাতিদের কাছে একটা আদর্শ হবে। তোমাদের মধ্য দিয়ে অন্য জাতিরা জানবে আমি কে এবং আমি কেমন।" অর্থাৎ একটাই মাত্র শর্ত- *"যদি তোমরা আমার কথা মেনে চল, তাহলে..."*

এই সময় পর্যন্ত ইসরাইলদের ইতিহাস ছিল দুর্দশাময়। আল্লাহ্ তাদেরকে যতটুকু মান্না সংগ্রহ করতে বলেছিলেন, তারা তার চেয়েও বেশি সংগ্রহ করেছিল। আল্লাহ্র উপর নির্ভর করার বদলে তারা নালিশ করেছিল। যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি আন্তরিক হত, তাহলে তারা বলত, "হে আল্লাহ্, আমরা তোমার কথামত চলছি না। তুমি পবিত্র ও নিষ্পাপ আর আমরা গুনাহে পূর্ণ। যদি তুমি চাও, তোমার কথা মেনে চলবার দ্বারা আমরা তোমার গ্রহণযোগ্য হই, তবে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়!"

কিন্তু মূসা নবী সব লোকদের একত্রিত করে তাদের কাছে আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও তিনি কি কি চান সে বিষয়ে বললেন, তখন--

*সব লোক একসংগে বলল, **"মাবুদ যা বলেছেন আমরা তা সবই করব।"** লোকেরা যা বলল মূসা গিয়ে তা মাবুদকে জানালেন।*
(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৯:৮ আয়াত)

অতি উৎসাহ সহকারে বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্র কথার উত্তর দিয়েছিল। "হ্যাঁ, প্রভু। আপনি যা করতে বলেন, সেটাই আমাদের জন্য ভাল হবে। আমরা আপনার খুব ভাল ইমাম হব। আমাদের জন্য পবিত্রতাও কোন সমস্যাই নয়। আমরাই সবচেয়ে বেশী পবিত্র জাতি হব। আর আপনি নিশ্চয়ই আমাদের কাজে খুশি হবেন। আমরা তা করতে পারব!" কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহ্র পবিত্রতা ও ধার্মিকতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই অল্প ছিল। তাই আল্লাহ্ তাদেরকে আরও অনেক শিক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন।

উদাহরণের মধ্য দিয়ে সাহায্য

আল্লাহ্র শিক্ষা কতগুলো উদাহরণের সাহায্যে শুরু হয়েছিল।

মাবুদ মূসাকে আরও বললেন, "আজ ও কাল এই দু'দিন তুমি লোকদের কাছে গিয়ে তাদের পাক-সাফ করবে। তারা যেন তাদের কাপড়-চোপড় ধুয়ে নেয় এবং তৃতীয় দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে, কারণ এই তৃ

তীয় দিনে আমি মাবুদ সমস্ত লোকের চোখের সামনে তুর পাহাড়ের উপর নেমে আসব।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৯:১০,১১ আয়াত)*

আল্লাহ্ মূসা নবীকে বলেছেন লোকদেরকে পবিত্র হতে হবে। তিনি তাদেরকে তাদের কাপড়-চোপড় ধুতে বলেছেন। যদিও কাপড়-চোপড় ধোওয়ার ফলে গুনাহ্ দূর হয় না, কিন্তু তিনি এই সাহায্যকারী উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন যাতে ইসরাইল লোকদেরকে গুনাহ্ থেকে আলাদা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারেন। ***বাহ্যিক*** পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একজন লোককে ***ভিতরটা*** পরিষ্কার করে না। পরিষ্কার হাত একটি *পরিষ্কার রূহ্* সৃষ্টি করতে পারে না।

যদিও বনি-ইসরাইলদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করার কাজটি ছিল আল্লাহ্র সামনে একজন লোকের পবিত্র ও পাক-সাফ হওয়ার একটা উদাহরণ। কিন্তু শরীর বা কাপড়-চোপড় ধোওয়ার ফলে তাদের গুনাহ্ ধুয়ে যায় নি। এসব কাজ কেবল লোকদের একথা বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, আল্লাহ্ নিখুঁত ও ধার্মিক, আর আমরা শুধু তাঁর নির্ধারিত উপায়ের মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে যেতে পারব।

আল্লাহ্ তাঁর সেই উদাহরণমূলক শিক্ষা শেষ করেন নি। তিনি হযরত মূসাকে বলেছিলেন...

"লোকদের জন্য তুমি পাহাড়ের চারদিকে একটা সীমানা ঠিক করে দেবে এবং তাদের সাবধান করে দিয়ে বলবে, যেন তারা পাহাড়ের উপর না আসে কিংবা পাহাড়ের গায়ে হাত না দেয়। যে ঐ পাহাড় ছোঁবে তাকে নিশ্চয়ই হত্যা করা হবে।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৯:১২ আয়াত)*

হযরত মূসাকে আল্লাহ্ যে সীমানা রেখার কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন তা ছিল আল্লাহ্ ও গুনাহ্পূর্ণ লোকের মধ্যে আলাদাকরণের একটি ছবি। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর সামনা-সামনি হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, কারণ তিনি পবিত্র। আল্লাহ্র পবিত্র উপস্থিতিতে গুনাহ্পূর্ণ মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। সেই সীমানা মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, মৃত্যুই হল গুনাহের একটা পরিণতি।

তৃতীয় দিনের সকালবেলা মেঘের গর্জন হতে লাগল এবং বিদ্যুৎ চম্‌কাতে থাকল আর পাহাড়ের উপরে একখণ্ড ঘন মেঘ দেখা দিল। এছাড়া খুব জোরে জোরে শিংগার আওয়াজ হতে লাগল। এই সব দেখেশুনে ছাউনির মধ্যেকার সমস্ত লোক কেঁপে উঠল।

তখন আল্লাহ্র সামনে যাবার জন্য মূসা ছাউনি থেকে লোকদের বের করে নিয়ে গেলেন। লোকেরা পাহাড়ের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর তুর পাহাড়টা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল, কারণ মাবুদ পাহাড়ের উপর আগুনের মধ্যে নেমে আসলেন। ...তখন মূসা আল্লাহ্র সংগে কথা বললেন আর আল্লাহ্ও জোরে কথা বলে তাঁর জবাব দিলেন।
(তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৯:১৬-১৯ আয়াত)

আল্লাহ্‌র দেওয়া সর্বশেষ সাহায্যকারী উদাহরণগুলো ছিল ভীতিকর ও হৃদয়গ্রাহী। সেগুলো ছিল বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, ঘন মেঘখণ্ড, শিংগার জোর শব্দ, ধোঁয়া ও আগুন। সব লোক ভয়ে কেঁপেছিল! লোকেরা গুনাহ্‌পূর্ণ ছিল বলেই পবিত্র আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে তাদের ভয় পাওয়ার কারণ ছিল। আল্লাহ্‌ লোকদেরকে তাঁর পবিত্রতা ও শক্তি দেখাচ্ছিলেন।

এর পরবর্তী সময়ের মধ্যে মানুষ আল্লাহ্‌র বিষয়ে অনেক শিক্ষা পাবে। আল্লাহ্‌ *পবিত্র ও ধার্মিক* শব্দ দু'টির সংজ্ঞা দিতে যাচ্ছিলেন। তিনি যেন লোকদের বলছিলেন তিনি তাদের জন্য চিন্তা করেন। তিনি তাদের সঙ্গে একটা বিশেষ সম্পর্ক চান। ১০টি বিশেষ হুকুম দিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁর লোকেরা কিভাবে পবিত্র হবে। তারা যদি সেই হুকুমগুলো পালন করে তাহলেই তারা তাঁর বিশেষ লোক হবে এবং তাঁর সঙ্গে তাদের সুন্দর সম্পর্ক থাকবে। আদন বাগানে আল্লাহ্‌ হযরত আদমকে শুধু একটি নিয়ম দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত আদম তা মেনে চলতে পারেন নি। এখন আল্লাহ্‌ মানুষকে দশটি নিয়ম দিতে যাচ্ছেন। তারপরে আল্লাহ্‌ বললেন-

১ম হুকুম

"আমি আল্লাহ্‌ই তোমাদের মাবুদ... আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:২,৩ আয়াত)*

মাবুদ মানুষকে বলছিলেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কারো বা কোন কিছুরই এবাদত করা উচিত নয়। এর আসল কারণটি ছিল পরিষ্কার।

"আমিই আল্লাহ্‌, অন্য আর কেউ নেই; আমি ছাড়া অন্য মাবুদ নেই।"
(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫:৫ আয়াত)

আল্লাহ্‌ মাত্র একজনই আছেন। আমাদের অবশ্যই তাঁকে সম্মান করতে হবে। আল্লাহ্‌ কেবল অনেকগুলো দেব-দেবীর মধ্যে একজন দেবতা নন। তিনিই একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌। যারা ধার্মিক হতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই শুধুমাত্র মাবুদেরই এবাদত করতে হবে, যিনি সৃষ্টিকর্তা, যিনি হযরত ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কাছে ওয়াদা করেছিলেন।

অনেকেই বলে তারা কোন *মূর্তি* বা *দেবতার* এবাদত করে না। সেইজন্যই তারা মনে করে তারা এই হুকুমটি অমান্য করছে না। কিন্তু এই হুকুমের আসল অর্থ হল এইঃ আপনি যদি আল্লাহ্‌র চেয়ে আপনার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, রূহানী পরিচালনাকারী, মান-মর্যাদা, কাজ বা পেশা, চেহারা, টাকা-পয়সা, আমোদ-প্রমোদ এবং অবসর গ্রহণ ইত্যাদির যেকোন একটিকে বা একজনকে আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী প্রাধান্য দেন, তাহলে আপনি এই হুকুম অমান্য করছেন।

২য় হুকুম

"পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না, *তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরকার কোন কিছুর মত হোক কিংবা পানির মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক। তোমরা তাদের পূজাও করবে না, তাদের সেবাও করবে না ...।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:৪,৫ আয়াত)*

প্রথম হুকুমে উল্লেখ ছিল আল্লাহ্‌র পাশাপাশি বা আল্লাহ্‌র জায়গায় অন্য কোন দেবতা বা কোন বস্তর এবাদত করা আমাদের উচিত নয়। দ্বিতীয় হুকুমে আল্লাহ্ মানুষকে *কোন* প্রতিমা, ছবি বা প্রতীকের এবাদত বা পূজা না করতে বলেছেন। তাদের সামনে মাথা নত না করতে বলেছেন। যেহেতু আল্লাহ্ রূহ্, তাই মানুষের দরকার নেই তাঁর কোন চেহারা বা দৈহিক আকার তৈরী করা। মানুষের তৈরী কোন মূর্তিই এবাদত পাবার যোগ্য নয়- কেবল সত্য আল্লাহ্ই এবাদত পাবার যোগ্য।

"আমি মাবুদ, এ-ই আমার নাম। আমি অন্যকে আমার গৌরব কিংবা মূর্তিকে আমার পাওনা প্রশংসা পেতে দেব না।"

(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪২:৮ আয়াত)

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মানুষকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। আর সেজন্য আল্লাহ্‌র অন্যতম দাবী হল আমরা যাতে তাঁর বা তাঁর সৃষ্টির কোন মূর্তি বা ছবির এবাদত না করি।

৩য় হুকুম

"কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র নাম নেবে না। যে তা করবে তাকে মাবুদ শাস্তি দেবেন।"

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:৭ আয়াত)

মানুষ অবশ্যই সব সময় আল্লাহ্‌কে, এমনকি তাঁর নামকেও সম্মান দান করবে। সারা দুনিয়ার বিচারকর্তা হিসেবে আল্লাহ্ই এবাদত পাওয়ার যোগ্য। সার্বভৌম বাদশাহ্ হিসেবে আল্লাহ্ আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান পাবার যোগ্য। তৃতীয় হুকুমটি ছিল সুস্পষ্ট। আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মানুষ অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে সম্মান করবে।

আপনি যদি কখনও অকারণে আল্লাহ্‌র নাম ব্যবহার করে থাকেন, তবে আপনি এই হুকুমটি অমান্য করেছেন। আপনি যদি কখনও বলে থাকেন, ***"ইনশাআল্লাহ্,*** *আমি এই বা ঐ কাজটা করব!"* কিন্তু সেই কাজ করার ইচ্ছা আপনার নেই, তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র নামের অসম্মান দেখিয়েছেন। আপনি এই হুকুমটিও ভেঙ্গেছেন। আপনি যদি কখনও বলে থাকেন, ***"আল্লাহ্‌র কসম বলছি,*** *আমি এই বা ঐ কাজটি করি নি!"* কিন্তু সত্যি সত্যি আপনি দোষী, তাহলে আপনি আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করেছেন।

৪র্থ হুকুম

*“**বিশ্রামবার পবিত্র করে রাখবে এবং তা পালন করবে।** সপ্তার ছয় দিন তোমরা পরিশ্রম করবে এবং তোমাদের সমস্ত কাজ করবে, কিন্তু সপ্তম দিনটা হল তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিশ্রামের দিন। ...কারও কোন কাজ করা চলবে না।” (তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:৮-১০ আয়াত)*

আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, সপ্তম দিনকে তাদের বিশ্রামবার হিসাবে আলাদা করে রাখতে হবে। এই বিশেষ দিনটি বাকী দুনিয়ার লোকদের দেখাবে যে, তাদের সাথে আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে।

তারপর মাবুদ মূসাকে বনি-ইসরাইলদের এই কথা বলতে বললেনঃ “তোমরা আমার প্রত্যেকটি বিশ্রামবার পালন করবে। এই বিশ্রামবার বংশের পর বংশ ধরে তোমাদের ও আমার মধ্যে এমন একটা চিহ্ন হয়ে থাকবে যার দ্বারা তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমিই মাবুদ এবং আমিই তোমাদের আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রেখেছি”

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩১:১৩ আয়াত)।

আল্লাহ্ চেয়েছিলেন বনি-ইসরাইলেরা যেন জানতে পারে পবিত্র হওয়ার জন্য তাদেরকে অবশ্যই বিশ্রামবারকে সম্মান করতে হবে। তারা যে অন্যদের চেয়ে আলাদা, এটা ছিল তার বিশেষ চিহ্ন।

৫ম হুকুম

“তোমাদের পিতা-মাতাকে সম্মান করে চলবে...।”

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১২ আয়াত)

এই হুকুমে আল্লাহ্ বলেছেন ছেলেমেয়েদের উচিত মা-বাবাকে সম্মান করা ও তাঁদের বাধ্য থাকা। এটা তাঁর পবিত্রতার দাবী, আর তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে তা-ই চান। একটা ভাল পরিবারে রাগারাগি বা ঝগড়া-বিবাদ নয়, কিন্তু শান্তি থাকা উচিত। পরিবার হওয়া উচিত শৃঙ্খলা ও সম্মানের স্থান, বিশৃঙ্খলা ও রাগারাগির স্থান নয়। আর অন্যদিকে আল্লাহ্ চান মা-বাবারাও যেন অবশ্যই তাঁদের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন ও ভরণ-পোষণ করেন।

> কথার উপর কথা বলা, ঠোঁট বাঁকিয়ে বা ফুলিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ, তর্কাতর্কি, অবজ্ঞা করা, উত্তর না দেওয়া এবং সমালোচনা করার মানে মা-বাবাদের প্রতি অসম্মানজনক কথাবার্তা বা কাজ।

৬ষ্ঠ হুকুম

“খুন কোরো না।” *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৩ আয়াত)*

আল্লাহ্ মানুষকে প্রাণ দিয়েছিলেন। আর তাই একজন মানুষের পক্ষে অন্য আরেকজনের প্রাণ নেওয়াটা অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র মনে খুন করার কাজের

বিষয়ের চেয়েও বেশী কিছু ছিল। আসলে খুন করার কাজের পেছনে যে ইচ্ছা বা মনোভাব, তিনি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে-

> *"...এই কালাম মানুষের দিল-রূহ্ ও অস্থি-মজ্জার গভীরে কেটে বসে এবং মানুষের দিলের সমস্ত ইচ্ছা ও চিন্তা পরীক্ষা করে দেখে। সৃষ্টির কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে লুকানো নেই। যাঁর কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে তাঁর চোখের সামনে সব কিছুই খোলা এবং প্রকাশিত।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৪:১২,১৩ আয়াত)*

আল্লাহ্ মানুষের দিলের ভিতরটা দেখতে পান। সব মানুষের দিলের বিষয়ে জানেন বলেই তিনি আমাদের চেয়েও খুন সম্বন্ধে আরও ব্যাপক ভাবে জানেন। এমনকি, মাবুদ কিছু কিছু ধরনের রাগকে খুন হিসাবে গণ্য করেন।

> *"তোমরা শুনেছ, আগেকার লোকদের কাছে এই কথা বলা হয়েছে, 'খুন কোরো না; যে খুন করে সে বিচারের দায়ে পড়বে।'*
>
> *কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ তার ভাইয়ের উপর রাগ করে সে বিচারের দায়ে পড়বে। ...আর যে তার ভাইকে বলে, 'তুমি বিবেকহীন,' সে জাহান্নামের আগুনের দায়ে পড়বে"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:২১,২২ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার মানদণ্ড পূর্ণ করার জন্য একজন লোকের উচিত নয় মেজাজ দেখানো কিংবা উপযুক্ত কারণ ছাড়া রাগান্বিত হওয়া।

৭ম হুকুম

"জেনা কোরো না।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৪ আয়াত)*

আল্লাহ্ পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ের উপহার দান করেছিলেন। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক লাভের একমাত্র গ্রহণযোগ্য সময় বিয়ের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী ও স্ত্রী অন্য কোন লোকের সাথে নয়, বরং একে অন্যের সাথে দেহে মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়েই কেবল এই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক উপভোগ করতে পারে।

তারপরে আল্লাহ্ এই চিন্তাটি আরও গভীর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ্ আমাদের দিল দেখেন বলেই তিনি জানেন কারও অন্তরে গুনাহ্‌পূর্ণ চিন্তা আছে কিনা।

> *"তোমরা শুনেছ, এই কথা বলা হয়েছে, 'জেনা কোরো না।' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে কামনার চোখে তাকায় সে তখনই মনে মনে তার সংগে জেনা করল।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:২৭,২৮ আয়াত)*

যদি কোন লোক নিজের বিবাহিত স্বামী/স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন পুরুষ/মহিলার দিকে কামনার চোখে তাকায়, তাহলে সে এই হুকুমটি অমান্য করে। পবিত্র

হওয়ার অর্থ একজন লোকের অবশ্যই খাঁটি কাজের পাশাপাশি খাঁটি মন বা চিন্তা থাকতে হবে।

৮ম হুকুম

"চুরি কোরো না।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৫ আয়াত)*

আল্লাহ্ প্রত্যেককে বিভিন্ন জিনিষের মালিক হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। তিনি চান না কেউই অন্য লোকদের সম্পদ নিক। যদি কেউ চুরি করে, তাহলে সে আল্লাহ্র অবাধ্য হয়। তাই যে লোক চুরি করে, সে ধার্মিক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

চুরির মধ্যে পড়ে পরীক্ষায় নকল করা, কর ফাঁকি দেওয়া, ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ না করা, ইত্যাদি।

৯ম হুকুম

"কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষি দিয়ো না।"

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৬ আয়াত)

মানুষের উচিত সব সময় সৎ থাকা। আল্লাহ্ চাতুরী করাটা পছন্দ করেন না। এর আগে আমরা পড়েছি শয়তান একজন মিথ্যাবাদী। শয়তানের ভিতরগত স্বভাবই হল চাতুরী। শয়তানের স্বভাব থেকে আল্লাহ্র স্বভাব সম্পূর্ণ রূপে আলাদা। আল্লাহ্র স্বভাবের কাছ থেকেই সত্য আসে। তিনিই আল্লাহ্...

"যিনি মিথ্যা বলেন না ...।" *(ইঞ্জিল শরীফ, তীত ১:২ আয়াত)*

আল্লাহ্ যখন আমাদের কোন কিছু বলেন তখন আমরা বিশ্বাস করতে পারি তা সত্য হবে, কারণ তিনি...

"আল্লাহ্, যাঁর পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব নয় ...।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৬:১৮ আয়াত)

যেহেতু আল্লাহ্ সত্য, তাই সব ধরনের মিথ্যাই তাঁর বিরুদ্ধে অবাধ্যতার কাজ। শয়তান *মিথ্যার পিতা* এবং মিথ্যাবাদী লোক শয়তানের পরিকল্পনার মত চলে। মিথ্যা গল্প-গুজব, অপবাদ দেওয়া, কলংক রটানো, নিন্দা করা- এসব কিছুই আল্লাহ্র শরীয়ত অনুযায়ী গুনাহের কাজ।

১০ম হুকুম

"অন্যের ঘর-দুয়ার, স্ত্রী, গোলাম ও বান্দী, গরু-গাধা কিংবা আর কিছুর উপর লোভ কোরো না।" *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৭ আয়াত)*

কারও জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ, সুন্দর চেহারা বা তাদের যা-ই থাকুক না কেন, তা দেখে মানুষের হিংসা করা উচিত নয়।

শয়তান বলেছিল, *“আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র মত হব।”* শয়তানের লোভ হয়েছিল। সে আল্লাহ্‌র পদটি পেতে চেয়েছিল। লোভ মানে লোভী বা হিংসুক হওয়া। এটা গুনাহ্‌ এবং আল্লাহ্‌ তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করেন। এই পথটিই শয়তান অনুসরণ করেছিল।

আমাদের সমাজে আমরা সব সময় এই হুকুমটির অবাধ্য হই। যাদের অনেক আছে আমরা তাদের মত হতে চাই। আমরা আরও ভাল বেতন পেতে চাই, আরও ভাল ঘর চাই এবং আরও ভাল জীবন কাটাতে চাই। টিভির অনেক বিজ্ঞাপণ আমাদের মধ্যে লোভ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞাপণগুলো বলে আমরা বিজ্ঞাপণের *পণ্যগুলো পাওয়ার যোগ্য*। এসব কথা আমাদের মধ্যে অহংকার জাগায়। এটা আরেকটি গুনাহ্‌।

এখন আমি জানি

আল্লাহ্‌ এই দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছেন। তিনি সেগুলো পাথরের উপর লিখেছিলেন যাতে তাঁর লোকেরা বুঝতে পারে তাঁর শরীয়তের পরিবর্তন নেই। উদাহরণ স্বরূপ, যদিও মানুষ বলতে পারে প্রতারণা করাটা ঠিক, কিন্তু শরীয়ত সব সময় বলে এটা অন্যায়।

এখন মানুষ জানতে পারল কোন্‌ কোন্‌ কাজকে আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌ বলে গণ্য করেন। আল্লাহ্‌র শরীয়ত সেগুলো প্রকাশ করেছে।

...বরং এই কথা ঠিক যে, শরীয়ত না থাকলে গুনাহ্‌ কি তা আমি জানতে পারতাম না। “লোভ কোরো না,” শরীয়ত যদি এই কথা না বলত তবে লোভ কি তা আমি জানতাম না।
(তৌরাত শরীফ, রোমীয় ৭:৭ আয়াত)

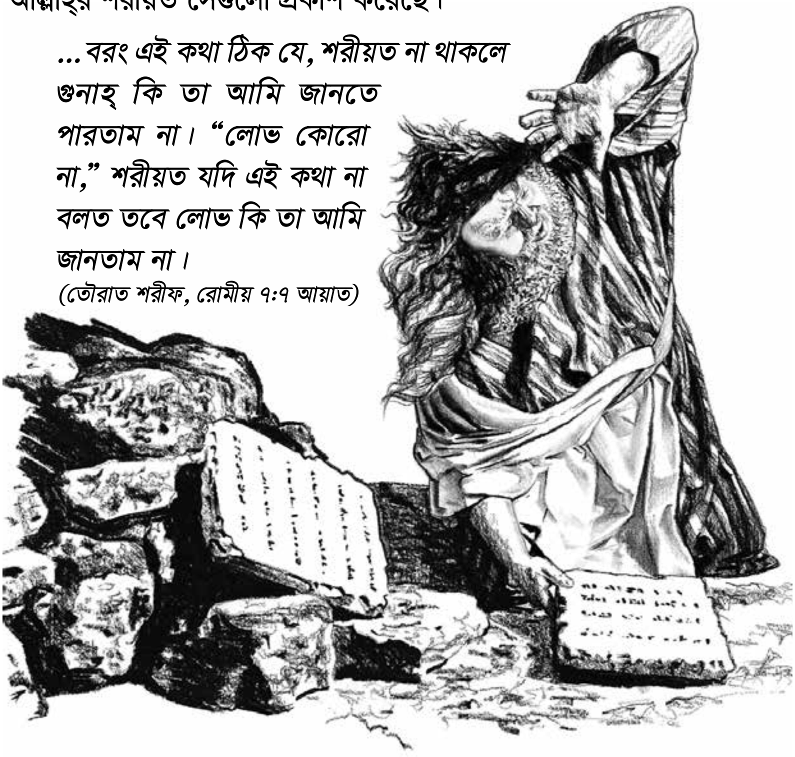

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। শরীয়ত প্রয়োগের বিষয়ে আল্লাহ্ কেমন কঠোর হবেন? মানুষ কি মাঝে মাঝে সেই শরীয়ত অমান্য করে আল্লাহ্‌র দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে পারবে? আল্লাহ্‌র আশা কি ছিল?

৩ আদালত-ঘর

যদি একজন লোক না জানে কখন ও কিভাবে দশটি বিশেষ হুকুম পালন করা দরকার, তাহলে সেগুলোকে অস্পষ্ট হিসাবে দেখা যেতে পারে। এর কি কোন ব্যতিক্রম আছে? উদাহরণ স্বরূপ, একজন লোক যদি অতীতে জেনা করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ কি তাকে চিরদিনের জন্য দোষী করবেন? একজন নিখুঁত আইনদাতার দাবী কি?

প্রাথমিকভাবে আল্লাহ্ আমাদের বলেন যে, যদি আমরা তাঁর দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই দশটি হুকুমের প্রতিটি পালন করতে হবে।

একজন লোক দশটি হুকুমের মধ্যে চারটি হুকুম পালন করা বেছে নিয়ে বাদবাকীগুলো অগ্রাহ্য করতে পারে না। আল্লাহ্ তা খুবই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রত্যেক লোককেই সবগুলো হুকুম অবশ্যই পালন করতে হবে। আল্লাহ্ বলেছেন-

> *যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও **মাত্র একটা বিষয়ে** গুনাহ্ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ২:১০ আয়াত)*

আমরা যদি কোন একটি হুকুম শুধুমাত্র একবার অমান্য করি তাহলে আল্লাহ্ সেই একবার অমান্য করাকে সমস্ত হুকুম অমান্য করার মতই দেখেন। যেহেতু আমরা এখন নিষ্পাপ নই তাই পবিত্র আল্লাহ্ আমাদের গ্রহণ করতে পারেন না।

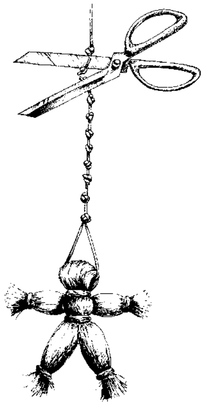

"শরীয়ত অমান্য করা মানে হল দশটি গিঁট দেওয়া একটি দড়ি কাটা। আপনি মাত্র একটি গিঁট কাটলেই পুরো দড়িটা খুলে যাবে। একই ভাবে ভাল ও খারাপের বিষয়ে আল্লাহ্‌র যে সামগ্রিক মানদণ্ড তা ভাঙ্গার বিষয়ে দোষী হওয়ার জন্য আপনাকে মাত্র একটি শরীয়তই অমান্য করতে হবে।

মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতায় সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। যারা তাদের পবিত্রতায় নিখুঁত, মাবুদ কেবলমাত্র তাদেরই গ্রহণ করেন। *মানুষের পবিত্রতাকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র পবিত্রতার <u>সমান</u> হতে হবে,* নতুবা আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে না।

আমাদেরকে যে শুধুমাত্র সমস্ত হুকুমই পালন করতে হবে তা নয়, কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন যে, আমরা আমাদের সমস্ত গুনাহের জন্য দায়ী, এমনকি যেসব গুনাহ্

আমরা না জেনে করি সেসবের জন্যও আমরা দায়ী।

> *যদি কেউ না জেনে মাবুদের নিষেধ করা কোন কিছু করে অন্যায় করে ফেলে তবে সে দোষী হবে এবং সেজন্য তাকে দায়ী হতে হবে।*
> *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ৫:১৭ আয়াত)*

আমি একবার এই বিষয়টি দু'জন বন্ধুকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। যখন আমি পাঠের মধ্যে এই সত্যটি ব্যাখ্যা করছিলাম, তখন তাদের মধ্যে একজন টেবিল চাপড়ে আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করেছিল। কিন্তু তার অন্য বন্ধুটি তাকে বলেছিল যে, আল্লাহ্‌র নামের অপব্যবহার করে সে আল্লাহ্‌র একটি হুকুম অমান্য করেছে। তাই সেই বলেছিল, *"আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করেছেন! যদি এটাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্যতার একমাত্র উপায় হয়, তাহলে এটা অসম্ভব। এমন কোন উপায় নেই যে, আমি এই হুকুমগুলো নিখুঁতভাবে পালন করতে পারি।"* এই কথার মধ্যে তার হতাশা স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছিল।

গুনাহের বিষয়ে জ্ঞান

আল্লাহ্ জানতেন মানুষ নিখুঁতভাবে তাঁর হুকুমগুলো পালন করতে পারবে না। এটা তাঁর কাছে অবাক বিষয় ছিল না। সেই দশটি বিশেষ হুকুম দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার।

> *আমরা জানি মূসার শরীয়ত তাদেরই জন্য যারা* ***সেই শরীয়তের অধীন****। ফলে ইহুদী কি অ-ইহুদী কারও কিছু বলবার নেই, সব* ***মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে দোষী হয়ে আছে****।* *(তৌরাত শরীফ, রোমীয় ৩:১৯ আয়াত)*

এই আয়াতটি দু'টি বিষয় ঘোষণা করছেঃ

১। যেসব লোক গর্ব করে বলে তাদের জীবন আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার মত যথেষ্ট ভাল, শরীয়ত তাদের মুখ বন্ধ করে দেয়। যদি কেউ বিশ্বস্ত ভাবে এই দশটি হুকুম নিয়ে অধ্যয়ন করে, তাহলে সে নিজে থেকেই নিজের গুনাহ্‌পূর্ণ অবস্থার বিষয় বুঝতে পারবে।

২। এই দশটি বিশেষ হুকুম আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, সত্যিই আমরা শরীয়ত অমান্যকারী। সৃষ্টির শুরুতে মানুষ ছিল আল্লাহ্‌র বন্ধু এবং সব ধরনের গুনাহ্ থেকে মুক্ত। কিন্তু হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহের অবাধ্য হলেন, আল্লাহ্ তখন আর তাঁদের বন্ধু রইলেন না, তখন তিনি তাঁদের বিচারক হয়ে গেলেন। কৌশলে দোষীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর সামনে কোন উকিলই দাঁড়াতে পারত না। এমনকি বিচারের রায়কে উল্টে দেওয়ার জন্য কেউই ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব পর্যন্ত করতে পারত না। রায়টি ছিল একেবারে স্পষ্ট। আল্লাহ্‌র শরীয়ত অমান্য করার দায়ে মানুষ ছিল ***অপরাধী***।

> *শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২০ আয়াত)*

আল্লাহ্ দশটি বিশেষ হুকুম দিয়েছিলেন যাতে মানুষকে দেখাতে পারেন যে, সে একজন গুনাহ্গার, আর আল্লাহ্ পবিত্র। আমরা সহজেই দেখতে পারি কোন্টা ঠিক এবং কোন্টা ঠিক নয়। শরীয়ত একটা থার্মোমিটারের মত। এটা আমাদের দেখিয়ে দিতে পারে আমরা অসুস্থ, কিন্তু আমাদেরকে সুস্থ করতে পারে না।

একটা আয়না

অনেক দিক দিয়েই সেই দশটি হুকুম একটা আয়নার মত। যখন আপনি একা থাকেন তখন একটা আয়না ছাড়া আপনি জানতে পারেন না আপনার মুখটি ময়লা। কেউ আপনাকে বলতে পারে, *"তোমার মুখটা ময়লা,"* কিন্তু আপনি তা অস্বীকার করে বলতে পারেন, *"আমার মুখটা ময়লা নয়, আমি তো কিছুই দেখছি না!"* এভাবে আপনি আপনার কথাগুলোকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি আপনাকে একটা আয়না দেয়, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন সত্যি সত্যি আপনার মুখে ময়লা আছে। তখন আপনি আর এ সত্যটা অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মুখে ময়লা আছে।

গুনাহের বেলায়ও ঠিক একই কথা খাটে। আল্লাহ্ আমাদেরকে শরীয়ত না দেওয়া পর্যন্ত আমরা সত্যিই জানতাম না গুনাহ্ কি। যেভাবে সেই আয়না আমার মুখের ময়লা দেখিয়ে দিয়েছিল ঠিক একই ভাবে দশটি হুকুম আমাকে আমার গুনাহ্ দেখিয়ে দিয়েছিল।

আমরা যাতে আল্লাহ্র কাছে উপযুক্ত হতে পারি সেজন্য পালনীয় নিয়ম হিসাবে দশটি হুকুম দেওয়া হয় নি। এটা শরীয়ত দানের উদ্দেশ্য ছিল না। এটা অনেকটা একটি আয়না দিয়ে আপনার মুখ থেকে ময়লা পরিষ্কার করার চেষ্টার মত। আয়নার কাজ পরিষ্কার করা নয়, বরং আয়নার কাজ হল কোন কিছু দেখিয়ে দেওয়া। আসলে আপনি যদি একটি আয়না দিয়ে আপনার নিজেকে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন, তাহলে তো আপনি আয়নাকেই নোংরা করে তুলবেন। এতে আয়না তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন করার কাজ করতে পারবে না। একই ভাবে দশটি হুকুম পালন করার দ্বারা যে লোকেরা আল্লাহ্র গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করে, তারা সাধারণতঃ নিজেদেরকে যাতে অতটা খারাপ না দেখায় সেজন্য হুকুমগুলোতে পরিবর্তন আনে বা কাটছাঁট করে।

আল্লাহ্র দৃষ্টিভঙ্গী

স্মরণ করুন কিভাবে আমরা গুনাহের বিষয়ে আল্লাহ্র দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পচা

ইঁদুরের দুর্গন্ধের তুলনা করেছিলাম। দশটি হুকুম পালন করার দ্বারা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করাটা একটা পচা ইঁদুরের উপরে পারফিউম ছিটানোর মত, যা ইঁদুরকে আরও বেশী আকর্ষণীয় করে না। পারফিউম ছিটানোর পরেও ইঁদুরটি পচাই থাকে। ঠিক একই ভাবে দশটি হুকুম পালন করার চেষ্টা আমাদেরকে কোনভাবেই আল্লাহ্‌র কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য করে তুলে না। আমরা তারপরও *গুনাহ্‌গার* থেকে যাই।

এই আলোচনা আমাদেরকে ১০টি হুকুম কেন দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে শরীয়ত দিয়েছেন যাতে-

> *...গুনাহ্‌ যে কত জঘন্য তা হুকুমের দ্বারাই ধরা পড়ে।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৭:১৩ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ আমাদের বুঝাতে চান বড় হোক বা ছোট হোক, গুনাহ্‌ সম্পূর্ণ রূপেই খারাপ, একেবারে ধ্বংসাত্মক, ভীষণ মারাত্মক, পুরোপুরি জঘন্য, আতংকজনক, ভয়ংকর এবং খুব নোংরা। এছাড়াও আল্লাহ্‌ আমাদের বুঝাতে চান আমরা নিজেদের শক্তি দিয়ে যতটুকু পবিত্র হতে পারি, তাঁর পবিত্রতা তার চেয়েও হাজার হাজার গুণ উৎকৃষ্ট। আবার অনেক সময় আল্লাহ্‌ আমাদের বুঝাতে চান যখন আমরা খুব ভাল হই তখন *আমাদের ভাল কাজগুলো তাঁর পবিত্রতার সমান হয় না*। এমনকি এটা তাঁর কাছাকাছিও থাকে না।

গভীর খাদ

শরীয়ত না দেওয়া পর্যন্ত হয়তো কোন কোন লোক চিন্তা করত ভাল কাজ করার চেষ্টার দরুনই আল্লাহ্‌ তাকে অন্য মানুষের চেয়ে বেশি মহব্বত করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ যখন তাঁর শরীয়ত দিলেন তখন প্রত্যেকটি লোক বুঝতে পারল-

> *হ্যাঁ, জন্ম থেকেই আমি অন্যায়ের মধ্যে আছি; গুনাহের অবস্থাতেই আমি মায়ের গর্ভে ছিলাম।* *(তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ ৫১:৫ আয়াত)*

এখন মানুষ যে কেবল তার সত্যিকারের গুনাহ্‌ বুঝতে পারল তা নয়, সে আল্লাহ্‌র নিখুঁততা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পেল। আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ছিল মানুষের নাগালের বাইরে। মানুষ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা অর্জন করতে পারে নি। মানুষের উপলব্ধির চেয়েও মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যেকার ব্যবধান আরও বড় হয়ে গেল। আর শরীয়ত সেই "ব্যবধানকে কমাতে" পারে নি, কারণ কোন মানুষই সেই শরীয়ত নিখুঁতভাবে পালন করতে পারে নি।

দু'টি দল

হযরত মূসা যখন প্রথমবারের মত বনি-ইসরাইলদের কাছে সেই দশটি হুকুম পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন তারা ভয়ে কেঁপেছিল। তারা আল্লাহ্‌র সেই মেঘ গর্জন ও বিদ্যুৎ দেখে আতংকিত হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্‌র শক্তির সেই প্রচণ্ড প্রদর্শন লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু লোকেরা আল্লাহ্‌র সেই

দশটি হুকুমের মূল উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারে নি। তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল তারা সেসব পালন করতে পারবে। বর্তমানেও অনেকেই একথা বিশ্বাস করে, কিন্তু পালন করার চেষ্টা করতে গিয়ে তারা আসল উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়।

অন্যদিকে কিছু কিছু বনি-ইসরাইল লোক শরীয়তের কথা শুনতে শুনতে আল্লাহ্‌র পবিত্রতার বিষয়ে গভীর জ্ঞান পেয়েছিল। এখন তারা বুঝতে পারল আল্লাহ্‌ কি বুঝিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন *পবিত্রতার মধ্যে গুনাহের কোন স্থান নেই*। অন্য আরেকটি কারণেও তারা আল্লাহ্‌কে ভয় পেয়েছিল। তারা জানত তারা কখনও আল্লাহ্‌র শরীয়ত নিখুঁত ভাবে পালন করতে পারবে না।

যে কারণেই হোক না কেন, কিতাবুল মোকাদ্দস বলে ইসরাইলরা ভয়ে কেঁপেছিল।

> *তারা মূসাকে বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে কথা বলুন, আমরা শুনব; কিন্তু আল্লাহ্‌ যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তবে আমরা মারা পড়ব।*
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২০:১৯ আয়াত)*

> *তারপর মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি পাহাড়ের উপরে আমার কাছে উঠে এসে কিছুকাল এখানেই থাক। লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য পাথরের যে ফলকের উপর আমি শরীয়ত ও হুকুম লিখে রেখেছি তা আমি তোমাকে দেব।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৪:১২ আয়াত)*

দশটি হুকুম এখন চালু হল। আর জীবনের মানদণ্ড হিসাবে সেসব হুকুম পালন করা বনি-ইসরাইলদের দায়িত্বের মধ্যে এসে গেল। কিন্তু যারা নিজেদের কাছে খোলামেলা, তারাই এখন জানতে পারল আল্লাহ্‌র দ্বারা গ্রহণযোগ্য হতে হলে তাদেরকে অন্য উপায়ে আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হতে হবে।

আপনি কি ধরনের লোক?

বেশীর ভাগ লোক স্বীকার করে তারা *গুনাহ্‌গার*। কিন্তু কম লোকই সহজে স্বীকার করে তারা অসহায় *গুনাহ্‌গার*। এই দু'টো কথার মধ্যে একটা বড় ব্যবধান আছে।

❖ *গুনাহ্‌গারেরা* আশা করতে পারে যে, ভাল কাজ করার দ্বারা আল্লাহ্‌ তাদেরকে গ্রহণ করবেন। তারা বিশ্বাস করতে পারে আল্লাহ্‌ চান তারা যেন দশটি বিশেষ হুকুম পালন করে। অথবা তারা বিশ্বাস করতে পারে ধর্মীয় সভায় যোগদান, বিশ্বস্তভাবে মুনাজাত, রোজা, হজ্ব, বিভিন্ন সেবামূলক কাজ বা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে সুন্দর ব্যবহারের দরুন আল্লাহ্‌ তাদেরকে গ্রহণ করবেন। তারা আশা করে তাদের *ভাল* আচরণের গুরুত্ব তাদের *খারাপ* আচরণের চেয়ে বেশী এবং আল্লাহ্‌ এতে সন্তুষ্ট হবেন। আল্লাহ্‌ এটা শিক্ষা দেন নি। ভাল কাজ করা প্রশংসনীয় বিষয়। কিন্তু যখন একজন লোকের আল্লাহ্‌র সাথে ভগ্ন সম্পর্ক থাকে তখন এসব ভাল কাজের কোনটাই সেই ভগ্ন সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে পারে না। পাক-কিতাব এই সত্যটি শিক্ষা দেয়। আমাদের *গুনাহ্‌ অবস্থা* খুব গভীর একটা সমস্যা এবং আমরা নিজেরা এটা দূর করতে পারি না।

ভাল

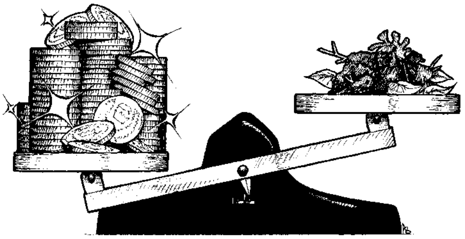

খারাপ

যে ধারণা আল্লাহ্‌র কালামে পাওয়া যায় না

❖ অন্যদিকে একজন *অসহায় গুনাহ্‌গার* জানে নিজেদেরকে পবিত্র আল্লাহ্‌র গ্রহণীয় করার জন্য তারা কিছুই করতে পারে না। তারা জানে তারা গুনাহ্‌-রূপ সেই মৃত ইঁদুর থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই গুনাহ্‌ তাদের জীবনকে দূষিত করছে। পাক-কিতাব বলে আমরা সম্পূর্ণ রূপে অসহায়।

> *"আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের **সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত**। ... আমাদের গুনাহ্‌ বাতাসের মত করে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে গেছে।"* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৬৪:৬ আয়াত)*

তাহলে বোঝা যায়, আমাদের ভাল কাজগুলোও আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সমান নয়। যেভাবে ***একটা পচা মরা ইঁদুর আমাদের কাছে অসহ্য লাগে*** ঠিক একই ভাবে আমাদের সব ধরনের সৎ কাজ পবিত্র ও নিখুঁত আল্লাহ্‌র কাছে ঘৃণ্য কাজ।

দশটি পরামর্শ

দশটি বিশেষ হুকুমকে মাঝে মাঝে নৈতিক আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এসব হুকুম নীতিবাদী ও নৈতিক আচরণকে বর্ণনা করে।

নৈতিক আইন আল্লাহ্‌র সাথে ভগ্ন সম্পর্ক ফিরিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু তারপরও এটার মূল্য আছে। যেভাবে প্রকৃতির আইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সেভাবে রূহানী আইনও একটা জাতির মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

অনেক দেশ ও জাতি কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্ণিত আচার-আচরণ বিষয় আইন অগ্রাহ্য করেছে। তারা বলে তারা নৈতিক ভাবে নিরপেক্ষ একটি সমাজে বাস করতে চায়। আসলে এ ধরনের কোন সমাজের অস্তিত্ব নেই। এধরনের “নিরপেক্ষ” সমাজ টিকে থাকতে পারে নি। যদি একটি সমাজ নৈতিক ভাবে জীবনযাপন করাকে বেছে না নেয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় তারা অনৈতিক জীবনযাপন বেছে নিচ্ছে। কিতাবুল মোকাদ্দসের শরীয়ত সমূহ প্রত্যাখান মানে খারাপ আচরণের প্রতি উদাসীন হওয়া। এতে প্রত্যেকটি প্রজন্ম গুনাহের বিষয়ে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয় এই অবস্থা সামগ্রিক বিশৃঙ্খলার দিকে নিয়ে যায়।

নবম অধ্যায়

১ আবাস-তাম্বু

২ অবিশ্বাস

৩ কাজীগণ, বাদশাহ্‌গণ ও নবীগণ

১ আবাস-তাম্বু

সম্ভবতঃ কিছু কিছু ইসরাইল লোক চিন্তা করেছিল নিখুঁত ভাবে দশটি বিশেষ হুকুম পালন করলেই আল্লাহ্ তাদেরকে গ্রহণ করবেন। তারা বোকামী করে এমন একটা পথ বেছে নিয়েছিল যা তাদেরকে রূহানী শূন্যতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে এমন আরও কিছু ইসরাইলীয় ছিল, যারা আল্লাহ্র গ্রহণযোগ্য হওয়ার একমাত্র পথটি দেখার ব্যাপারে প্রস্তুত ছিল।

পাক-কিতাবের কথাগুলো অধ্যয়ন করার সময় চলুন আমরা মূলভাবটি বুঝতে চেষ্টা করি। আল্লাহ্ গুনাহ্গার লোককে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন কিভাবে সে নির্দোষ হতে পারে এবং পবিত্র আল্লাহ্র সাথে একটি সম্পর্ক লাভ করতে পারে। যদি আল্লাহ্ একজন শিক্ষক হতেন তাহলে কিভাবে তিনি এই শিক্ষাটি শুরু করতেন? তাঁর প্রথম বিষয়টি কি হত?

পাঠের রূপরেখা - বিষয় #১

উদাহরণ- একজন লোক খুবই দ্রুত-প্রবহমান একটি নদীর অন্য পারে যাওয়ার জন্য সাঁতরাচ্ছিল। সে স্রোতের মধ্যে আটকে গেল। সে সেখান থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছিল। সাহায্যের জন্য সে চিৎকার করল। একদল লোক তা দেখছিল, কিন্তু সেই বাঁচার জন্য চেষ্টাকারী লোকটিকে সাহায্য করার জন্য সেখানে শুধুমাত্র একজন শক্তিশালী লোকই ছিল।

নদী তীরের লোকেরা সেই লোকটিকে সাহায্য করতে যাওয়ার জন্য সেই উদ্ধারকারী লোকটিকে অনুনয় করতে থাকল। কিন্তু উদ্ধারকারী লোকটি তাদের কথায় কোন সাড়া দিল না। বাঁচার জন্য সেই ডুবে যেতে থাকা লোকটির প্রাণপণ চেষ্টা যখন আরও প্রচণ্ড হয়ে উঠল তখন উদ্ধারকারী লোকটি উঠে দাঁড়াল। শেষে যখন সেই বাঁচার জন্য চেষ্টাকারী লোকটির শক্তি সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেল তখন সেই শক্তিশালী সাঁতারু লোকটি পানির মধ্যে ডুব দিল এবং ডুবে যেতে থাকা লোকটিকে টেনে তীরের দিকে নিয়ে আসল।

লোকেরা যখন দেরী করার জন্য উদ্ধারকারী লোকটির সমালোচনা করেছিল তখন সে বলল, "ঐ ডুবতে থাকা লোকটির গায়ে যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে কখনও সুযোগ দিত না। আমি শুধুমাত্র তখনই তাকে সাহায্য করতে পেরেছি, যখন দেখতে পেলাম সে তার নিজেকে সাহায্য করার চেষ্টা ত্যাগ করেছে।"

শেষ কথাঃ আল্লাহ্র সামনে আসার প্রথম ধাপ হল আপনি যে একজন অসহায় গুনাহ্গার সে কথা বুঝতে পারা। আর অসহায় গুনাহ্গার হিসাবে আপনি গুনাহের অনন্ত শাস্তি থেকে নিজেকে নিজে মুক্ত করতে পারেন না।

মাবুদ আল্লাহ্‌ যদি এভাবেই তাঁর পাঠটি উপস্থাপন করতেন তাহলে আমরা কল্পনা করতে পারি বনি-ইসরাইলরা হতাশার সঙ্গে এই কথা বলত, *"কিন্তু হে আল্লাহ্‌, তুমি তো আগেই তা আমাদের দেখিয়েছ। আমরা তা জানি!"*

আমরা অনুমান করতে পারি এর উত্তরে আল্লাহ্‌ বলতেন, "হ্যাঁ, আমি সেটা জানি। কিন্তু তোমরা বিষয়টা এখনও ভাল করে শেখ নি। আমি চাই তোমরা নিশ্চিত করে জানতে পার তোমরা এক একজন অসহায় গুনাহ্‌গার। আমি কেবল সেসব লোকদের উদ্ধার করতে পারি যারা নিজেদেরকে বাঁচানো ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করে দিয়ে আমার হাতে তাদের সমর্পণ করেছে।"

হতে পারে এই শিক্ষাটি শুধুমাত্র একটা উদাহরণের সাহায্যে বলা গল্প, কিন্তু আমরা যখন আল্লাহ্‌র সংগে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োগ করি তখন বুঝতে পারি এটা কতটা সত্য। কিতাবুল মোকাদ্দস এই সত্যটিই দৃঢ়ভাবে শিক্ষা দেয়। আসুন আমরা পরবর্তী ধাপে যাই।

> *মাবুদ মূসাকে বললেন, "বনি-ইসরাইলদের বল যেন তারা আমার জন্য দান নিয়ে আসে। নিজের ইচ্ছায় যারা তা আনবে তুমি তাদের কাছ থেকে তা বুঝে নেবে।*
>
> *বনি-ইসরাইলদের দিয়ে তুমি আমার থাকবার জন্য একটা পবিত্র জায়গা তৈরী করিয়ে নেবে। তাতে আমি তাদের মধ্যে বাস করব।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৫:১,২,৮ আয়াত)*

উদাহরণের মধ্য দিয়ে সাহায্য

আল্লাহ্‌ *আবাস-তাম্বু* নামে একটি পবিত্র স্থান তৈরীর জন্য বনি-ইসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি তাদের মধ্যে বাস করতে পারেন। আসলে বসবাসের জন্য আল্লাহ্‌র কোন ঘরের দরকার ছিল না, কিন্তু উদাহরণ হিসাবে আবাস-তাম্বু ব্যবহার করে তিনি তাদেরকে বিশেষ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। আমি সেই শিক্ষাটি ব্যাখ্যা করব, তাই ধৈর্য ধরুন। এটি ছবি মেলানোর সেই ধাঁধার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শুরুতে এই বিশেষ ঘর তৈরীর কাজের জন্য আল্লাহ্‌ বনি-ইসরাইলদেরকে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন দান ও উপহার আনতে বলেছিলেন। তিনি চেয়েছেন লোকেরা যাতে তাদের অন্তর থেকে খোলা মনে দান করে। অনেক বেশী জিনিষ আনার জন্য তিনি লোকদের কাছে জোরালো আবেদন রাখেন নি। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামত দান দিয়েছিল। তবে তিনি একটি বিষয় হযরত মূসাকে পরিষ্কার করে বলেছেন-

> *"যে নমুনা আমি তোমাকে দেখাতে যাচ্ছি ঠিক সেই রকম করেই তুমি আমার এই আবাস-তাম্বু ও সব আসবাবপত্র তৈরী করাবে।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৫:৯ আয়াত)*

মূল নক্‌শা

আবাস-তাম্বুর (বা মিলন-তাম্বু) বিভিন্ন অংশ খুলে ভাগ করা এবং তা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। তার মজবুত দেয়ালের উপরে ছাদের জন্য মোটা চাদরের মত ঢাকনা ছিল। এটিকে দু'টি অংশে ভাগ করা হয়েছিলঃ এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে ছিল *মহা-পবিত্র স্থান* এবং দুই-তৃতীয়াংশে ছিল *পবিত্র স্থান*। ঘোমটার মত একটি ভারী পর্দা এই দু'টি এলাকাকে আলাদা করেছিল।

> *"পর্দাটা মহাপবিত্র স্থান ও পবিত্র স্থানের মাঝখানে থেকে দু'টি স্থানকে আলাদা করে রাখবে।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৬:৩৩ আয়াত)*

আবাস-তাম্বুটির শেষ অংশটি ছিল একটি বাইরের উঠান। এর চারপাশে২ মিটার বা ৭ ফুট উঁচু একটি বেড়া ছিল। একটি দরজার মধ্য দিয়ে লোকেরা সেই উঠানে ঢুকতে পারত। *তাম্বুর* ভিতরে এবং বাইরের *উঠানে* সর্বমোট ৭ ধরনের আসবাবপত্র ছিল।

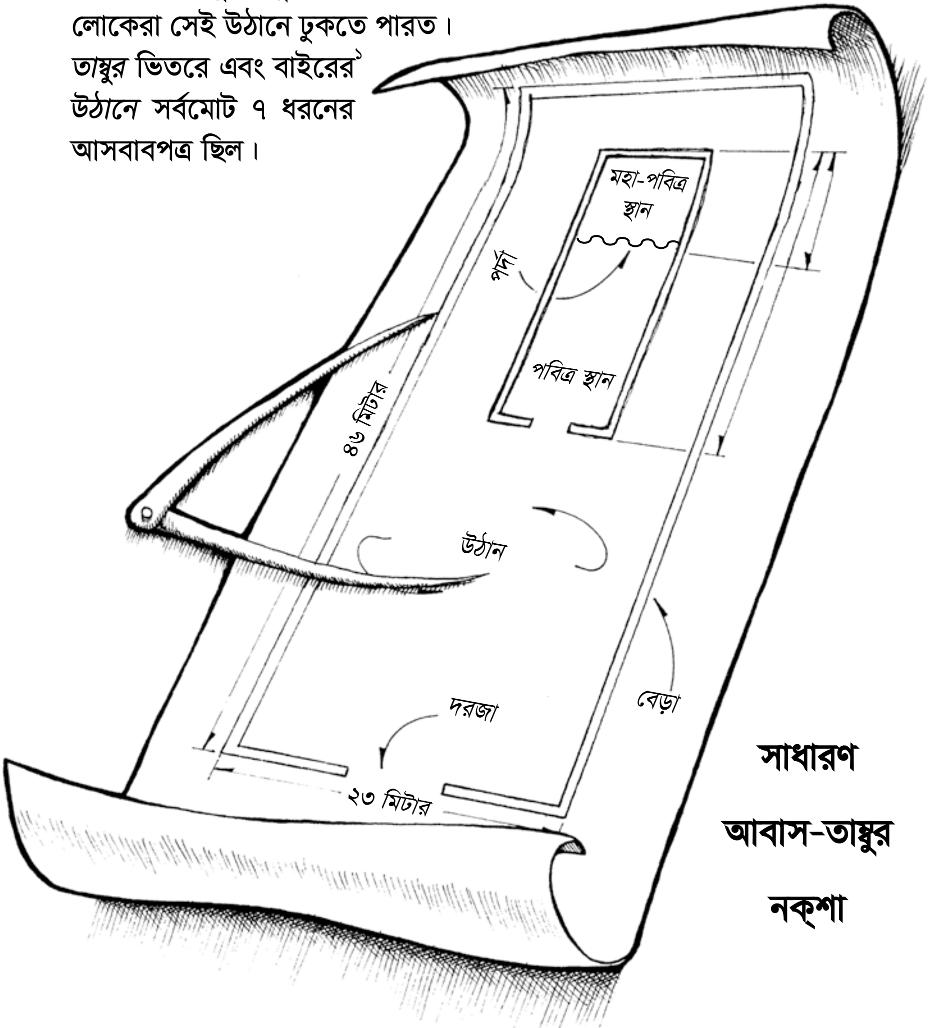

সাধারণ আবাস-তাম্বুর নক্‌শা

আবাস-তাম্বুর উঠান

❶ ব্রোঞ্জের গাহ্

উঠানের দরজার ঠিক ভিতরেই ছিল এই প্রথম আসবাবপত্রটি। গাহ্‌টি ছিল খুব বড়, কাঠ দিয়ে তৈরী, ব্রোঞ্জ দিয়ে মোড়ানো। গাহ্‌র কোণাগুলোতে চারটি শিং ছিল। প্রত্যেক পাশে লম্বা লম্বা খুঁটি ছিল যাতে লোকেরা তা বহন করতে পারে।

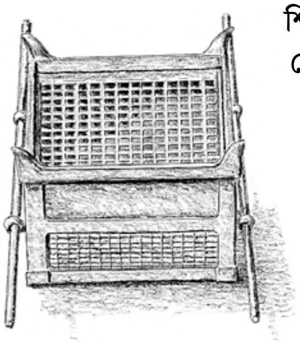

❷ হাত ধোয়ার বড় পাত্র

ব্রোঞ্জের একটি বড় পাত্র ব্রোঞ্জের গাহ্ এবং পবিত্র স্থানের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত ছিল। অনুষ্ঠানিক ভাবে হাত ধোয়ার জন্য সেই পাত্রটি পানি দ্বারা পূর্ণ রাখা হত। এটা দেখাত আল্লাহ্‌র সামনে যাওয়ার আগে মানুষকে অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে।

❸ বাতিদানী যদিও বাতিদানীর আয়তন সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয় নি, কিন্তু আমরা এর আকৃতি সম্পর্কে জানি। এর ছিল একটি প্রধান দণ্ড, যার ৭টি শাখা বা বাহু ছিল। শুধুমাত্র এই বাতিদানীটিই আবাস-তাম্বুকে আলো দিত।

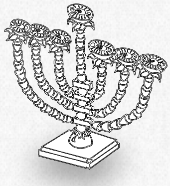

❹ রুটির টেবিল এই বিশেষ টেবিলে ইমাম ১২টি রুটি রাখতেন। প্রতিটি রুটি বনি-ইসরাইলের ১২ গোষ্ঠীর এক এক গোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ্‌র দৈনন্দিন যত্নের কথা তুলে ধরত।

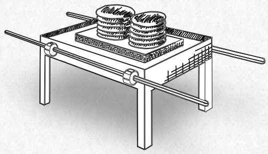

❺ ধূপ-গাহ্ যে পর্দাটি পবিত্র স্থানকে মহা-পবিত্র স্থান থেকে ভাগ করেছে এই গাহ্‌টি সেই পর্দার সামনে রাখা হয়েছিল। বনি-ইসরাইলরা যখন মুনাজাতের জন্য পবিত্র স্থানের বাইরে একত্রিত হত তখন ইমাম এই ধূপ-গাহের উপরে ধূপ দিতেন। ধূপের ধোঁয়া ও গন্ধ আকাশের দিকে উঠে যাওয়া ছিল আল্লাহ্‌র কাছে বিভিন্ন মুনাজাত উঠে যাবার একটি ছবি।

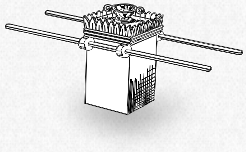

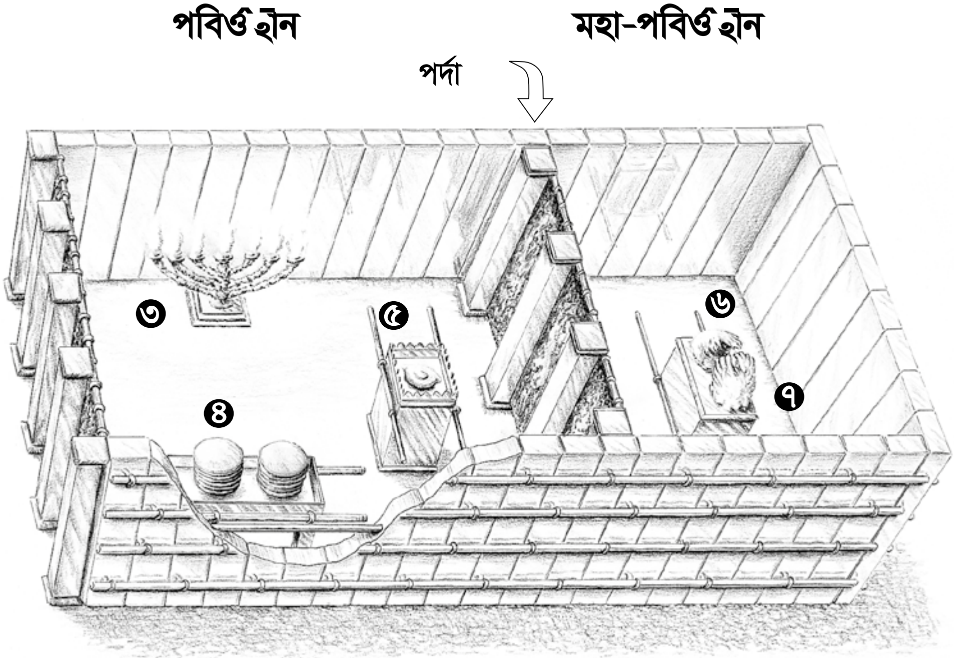

❻ শাহাদাত-সিন্দুক

এই ছোট কাঠের সিন্দুকটি খাঁটি সোনা দ্বারা মোড়ানো ছিল। বাক্সের ভিতরে দুটি জিনিষ রাখা ছিল। সেই জিনিষগুলো সম্বন্ধে আমরা এরই মধ্যে জেনেছি। সেগুলো ছিলঃ (১) দশটি বিশেষ হুকুম লেখা পাথরের দু'টি ফলক এবং (২) একটা পাত্র যেটির মধ্যে ছিল মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াবার সময় বনি-ইসরাইলদের জন্য আল্লাহ্ যে রুটি দিয়েছিলেন সেই রুটির একটি নমুনা।

❼ গুনাহ্ ঢাকা দেবার ঢাকনা

সেই শাহাদাত-সিন্দুকের উপর স্বর্ণের তৈরী একটা কারুকাজ-করা ঢাকনা ছিল। সেই ঢাকনার উপরে দুটি কারুবীর প্রতীক মুখোমুখি অবস্থায় তাদের ডানা দু'পাশে ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ্ বলেছেন-

> *"এই সাক্ষ্য-সিন্দুকের ঢাকনার উপরে কারুবী দু'টির মাঝখানে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে বনি-ইসরাইলদের জন্য আমার সমস্ত হুকুম তোমাকে দেব।"* *(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৫:২২ আয়াত)*

ইমামগণ

"তুমি বনি-ইসরাইলদের মধ্য থেকে তোমার ভাই হারুন ও তার ছেলে নাদব, অবীহূ, ইলিয়াসর এবং ঈথামরকে তোমার কাছে ডেকে পাঠাও। তারা ইমাম হয়ে আমার এবাদত-কাজ করবে।"

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ২৮:১ আয়াত)

আল্লাহ্‌ হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন হযরত হারুন ও তাঁর ছেলেদেরকে আবাস-তাম্বুর *ইমাম* হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার জন্য। হযরত হারুনকে *মহা-ইমাম* হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্‌ এই লোকদেরকে অন্যান্যদের কাছ থেকে পৃথক করেছিলেন। তাদের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল বলে যে তিনি তাঁদের পৃথক করেছিলেন তা নয়; বরং তিনি চেয়েছিলেন তাঁর লোকেরা তাঁর পবিত্রতাকে সম্মান করবে। তিনি আবাস-তাম্বুর মধ্যে শৃঙ্খলা চেয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশনা সমূহ পরিপূর্ণ করার জন্য ইমামদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ছিল। বনি-ইসরাইলরা যখন একস্থান থেকে আরেক স্থানে যাত্রা করত, তখন সেই ইমামেরা আবাস-তাম্বু খুলতেন এবং প্রত্যেকটি নতুন জায়গায় গিয়ে আবার তা সঠিকভাবে স্থাপন করতেন।

আবাস-তাম্বু নির্মাণ সম্পন্ন

বনি-ইসরাইলরা তুর পাহাড়ে পৌঁছার পর আবাস-তাম্বু নির্মাণ কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে নয় মাস সময় লেগেছিল।

মূসা তাদের সব কাজ দেখে বুঝলেন যে, মাবুদের হুকুম মতই সব কাজ করা হয়েছে। এতে মূসা বনি-ইসরাইলদের দোয়া করলেন।

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৩৯:৪৩ আয়াত)

দ্বিতীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে আবাস-তাম্বুটা দাঁড় করানো হল।

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৪০:১৭ আয়াত)

যখন আবাস-তাম্বু নির্মাণ শেষ হয়েছিল তখন বনি-ইসরাইলরা মিসর ছাড়ার পর যে মেঘস্তম্ভটি তাদের পথ দেখিয়েছিল তা মহা-পবিত্র স্থানের উপরে নেমে এসেছিল। তাতে লোকেরা বুঝেছিল আল্লাহ্‌ তাদের সাথে আছেন।

তারপর মেঘ এসে মিলন-তাম্বুটা ঢেকে ফেলল এবং মাবুদের মহিমায় আবাস-তাম্বুটা পূর্ণ হয়ে গেল।

আবাস-তাম্বুটা, অর্থাৎ মিলন-তাম্বুটা মেঘে ঢাকা এবং মাবুদের মহিমায় পূর্ণ ছিল বলে মূসা সেখানে ঢুকতে পারলেন না।

(তৌরাত শরীফ, হিজরত ৪০:৩৪,৩৫ আয়াত)

উদাহরণমূলক সাহায্য বাস্তবায়ন

আবাস-তাম্বু নির্দিষ্ট স্থানে রাখার সাথে সাথে এই বড় সাহায্যকারী উদাহরণটি

কার্যকর করার সময় এসে গিয়েছিল। আল্লাহ্ হযরত মূসাকে...

বনি-ইসরাইলদের বলতে বললেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ মাবুদকে কোরবানী হিসাবে কিছু দিতে চায় তবে সে একটা পশু নিয়ে আসুক; সেই পশুটা যেন কোন গরু, ভেড়া বা ছাগল হয়। যদি সে গরু দিয়ে পোড়ানো কোরবানী দিতে চায় তবে সেটা হতে হবে একটা নিখুঁত ষাঁড়।" *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১:২,৩ক আয়াত)*

আবাস-তাম্বুর কাছে কোরবানী নিয়ে আসার জন্য আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। এজন্য-

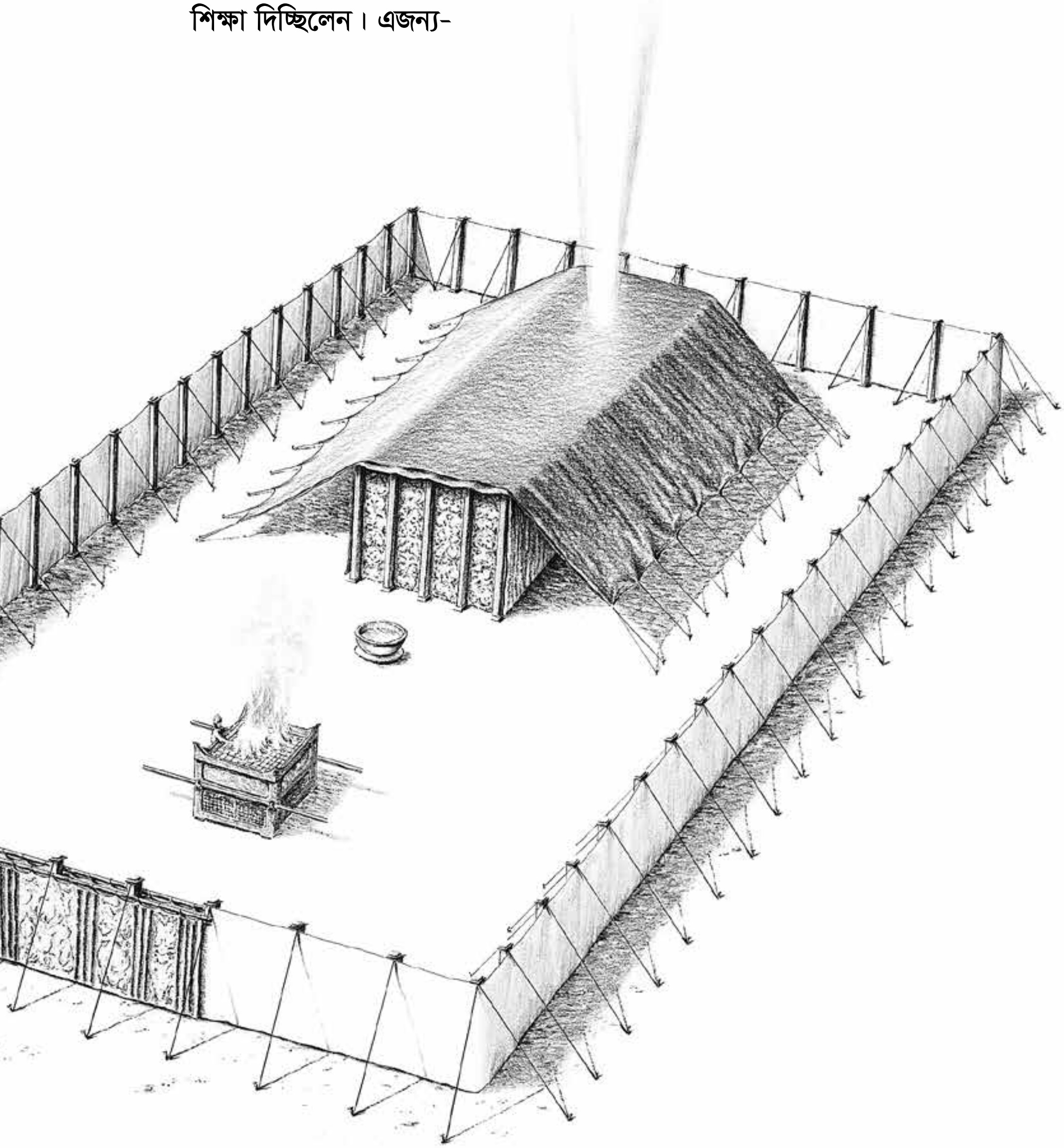

- ❖ সেই পশুটা হতে হত খুঁতহীন কোন ভেড়া, ছাগল বা গরু, সেটা অন্য যেকোন পশু, যেমন- শুকর, ঘোড়া বা উট হতে পারত না।
- ❖ সেই পশুকে হতে হত পুরুষ জাতীয় পশু।
- ❖ সেই পশুকে হতে হত নিখুঁত, সেটা রোগাক্রান্ত বা খোঁড়া হতে পারত না।

"মাবুদ যাতে তার উপর সন্তুষ্ট হন সেইজন্য তাকে সেই ষাঁড়টা মিলন-তাম্বুর দরজার কাছে উপস্থিত করতে হবে।"

(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১:৩খ আয়াত)

এই কোরবানী শুধুমাত্র আবাস-তাম্বুর উঠানের ফটকের ভিতরে ব্রোঞ্জের* গাহ্‌র উপরে করতে হত। নিজেকে একজন অসহায় গুনাহ্‌গার হিসাবে স্বীকার করা ছাড়াও এটা আল্লাহ্‌র সামনে আসার প্রথম পদক্ষেপ ছিল। কোরবানী দানকারী লোকটি...

*পাক-কিতাবে ব্রোঞ্জ প্রায়ই গুনাহের বিচারের সাথে সম্পৃক্ত।

"পোড়ানো-কোরবানীর জন্য আনা সেই ষাঁড়টার মাথার উপরে... তার হাত রাখবে; আর সেটা তার জায়গায় তার গুনাহ্‌ ঢাকবার জন্য কবুল করা হবে।" *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১:৪ আয়াত)*

সেই কোরবানীকৃত পশুর মাথার উপর নিজের হাত রেখে মানুষটিও সেই কোরবানীর সাথে এক হয়ে যেত। পশুর মাথার উপর হাত রাখার চিহ্ন ছিল এই যে, সেই লোকটির গুনাহ্‌ সেই ব্যক্তি থেকে পশুর কাছে চলে যাচ্ছে। মানুষের গুনাহ্‌ সেই পশুর উপর চলে যেত বলে সেই পশুকে মরতে হত। *গুনাহের শাস্তিই হল মৃত্যু*। কোরবানী দানকারী লোকটি পশুটির গলা কেটে ফেলত। এই

কাজটি মানুষটিকে দেখাত যে, *তার* গুনাহের কারণেই সেই পশুটির মৃত্যু হল। *সেই দোষী লোকের জায়গায় একজন বদলী হিসেবে নির্দোষ প্রাণীটি মারা যাচ্ছিল*। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্‌ মানুষের পক্ষে সেই কোরবানীটি গ্রহণ করতেন।

বনি-ইসরাইলদের কাছে এই কোরবানীটি অবশ্যই খুব পরিচিত শোনাবে। হযরত আদম, হাবিল ও নূহ নবীর সময় থেকে শুরু করে সব ঈমানদারদেরকে পশুর রক্ত কোরবানী করে আল্লাহ্‌র কাছে আসতে হয়েছিল।

ন্যায়বান নাজাতদাতা

মাবুদ আবার তাঁর লোকদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর দ্বারা গ্রহণযোগ্য হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল একথা বিশ্বাস করা যে, তিনি ন্যায়বান আল্লাহ্‌ ও উদ্ধারকর্তা *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫:২১ আয়াত)*।

একটা পশু কোরবানী করে লোকেরা দেখাচ্ছিল তারা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে। তারা মাবুদকে বিশ্বাস করে। যেহেতু মৃত্যুই গুনাহের শাস্তি, তাই কোরবানীটি দেখাত কিভাবে একজন লোকের গুনাহ্‌ মাফ করা হবে।

> *রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না। (তৌরাত শরীফ, ইবরানী ৯:২২ আয়াত)*
>
> *কারণ রক্তেই থাকে প্রাণীর প্রাণ। সেইজন্যই তোমাদের প্রাণের বদলে আমি তা দিয়ে কোরবানগাহের উপরে তোমাদের গুনাহ্‌ ঢাকা দেবার ব্যবস্থা দিয়েছি। রক্তের মধ্যে প্রাণ আছে বলেই তা গুনাহ্‌ ঢাকা দেয়।*
> *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১৭:১১ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ যখন একটি পশুর মৃত্যু দেখতেন তখন তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট হতেন যে, *গুনাহ্‌ ও মৃত্যুর শরীয়তটি* প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়েছে। সেই কোরবানীর সাথে সাথে *গুনাহের মূল্য পরিশোধ* করা হয়েছে। মানুষের যে গুনাহ্‌ ঋণ, আল্লাহ্‌ আর সেই ঋণ তার বিরুদ্ধে ধরবেন না; মানুষকে আর বিচার করা হবে না; গুনাহের অনন্তকালীন পরিণতি আর প্রয়োগ করা যাবে না। তার বদলে তাঁর উপর মানুষটির ঈমানকে মাবুদ সম্মানিত করবেন এবং তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন, যেমনটি তিনি হযরত ইব্রাহিমের বেলায় করেছিলেন।

> *"ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।" (ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৪:৩ আয়াত)*

যেহেতু সেই ধার্মিকতা ছিল আল্লাহ্‌র দেওয়া উপহার, তাই এটা মানুষকে আল্লাহ্‌র সাথে বাস করার জন্য সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা দান করেছিল।

এটা একটা নূতন বিষয় ছিল না। হাবিল, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহিম এবং অন্য সব ধার্মিক লোকেরা এই একই উপায়ে আল্লাহ্‌র সামনে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক লোক জানত পশুর রক্ত মানুষের গুনাহ্‌-ঋণ স্থায়ী ভাবে বাতিল করতে পারে

না। যেহেতু মূল্যের দিক দিয়ে একটি পশু একটি মানুষের সমান নয়, তাই তার গুনাহের ঋণ স্থায়ী ভাবে মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাই পাক-কালাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় পশু-কোরবানী ছিল...

> *ছায়ামাত্র; তাতে সত্যিকারের মহান বিষয়গুলো নেই। ...কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্ দূর করতে পারে না।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:১,৪ আয়াত)*

গুনাহ্ ঢাকা দেবার দিন

নিজেদের দায়িত্ব পালনের সময় শুধুমাত্র একটি জায়গা ছাড়া অন্য সব জায়গায় ইমামদের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। মহা-পবিত্র স্থানে ঢুকবার স্বাধীনতা তাঁদের একেবারেই ছিল না, কারণ সেখানে আল্লাহ্‌র গৌরব অবস্থান করত। তাই গুনাহ্‌গার লোকদের সেই মহা-পবিত্র স্থানের ভিতরে তাকানোরও অনুমতি দেওয়া হত না। দু'টি কামরার মাঝখানে একটি পুরু পর্দা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে কেউই মহা-পবিত্র স্থানের ভিতরটা দেখতে না পারে। শুধুমাত্র গুনাহ্ ঢাকা দেওয়ার দিনেই[২] বছরে কেবল একবার মহা-ইমাম হারুন এতে ঢুকতে পারতেন।

> *কিন্তু দ্বিতীয় অংশটিতে, অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানে কেবলমাত্র মহা-ইমামই ঢুকতেন। বছরে মাত্র একবারই তিনি কোরবানী করা পশুর রক্ত নিয়ে সেখানে ঢুকতেন। তাঁর নিজের গুনাহের জন্য এবং লোকেরা না জেনে যে সব গুনাহ্ করেছে তার জন্য তিনি এই রক্ত কোরবানী দিতেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৯:৭ আয়াত)*

কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তার মৃত্যু হত। মাবুদ মূসাকে বললেন-

> *"তোমার ভাই হারুনকে বল, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরকার ঢাকনার সামনে যে পর্দা রয়েছে তার পিছনে সেই পবিত্র জায়গায় সে যেন তার খুশীমত যখন-তখন না যায়। তা করলে সে মারা যাবে, কারণ সেই ঢাকনার উপরে মেঘের মধ্যে আমি প্রকাশিত থাকি।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১৬:২ আয়াত)*

গুনাহ্ ঢাকা দেবার কোরবানীটি কেবল বছরে একবার করা হত। এই কোরবানীটি বনি-ইসরাইলদেরকে মনে করিয়ে দিত পবিত্র আল্লাহ্‌র সামনে যাওয়ার জন্য মানুষের দরকার তার গুনাহ্ ঢেকে রাখা। পশুর রক্ত সেই গুনাহ্-ঋণ সম্পূর্ণরূপে ঢাকতে পারত না। সেই রক্ত ছিল কেবল অস্থায়ী একটি ঢাকনা মাত্র।

আবাস-তাম্বু, আসবাব-পত্র, ইমামগণ, বিভিন্ন কোরবানী, গুনাহ্ ঢাকা দেওয়ার দিন- এই সমস্তই ছিল আল্লাহ্‌র দেওয়া বড় সাহায্যকারী উদাহরণের অংশ। এসব উদাহরণ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা, সে বিষয়ে শিক্ষা দিতে সাহায্য করেছিল।

২ অবিশ্বাস

বনি-ইসরাইলরা মাবুদ আল্লাহ্‌র বিষয়ে আরও বেশি করে শিখছিল। আল্লাহ্‌ বিশ্বস্ত ভাবে প্রতিদিন তাদের খাবার ও পানি যুগিয়ে দিচ্ছিলেন। এমনকি কিতাবুল মোকাদ্দস বলে আল্লাহ্‌ তাদের জুতা পর্যন্ত টেকসই করে দিয়েছিলেন। এতে তাদের জুতাগুলো পুরানো হয়ে যায় নি। এখন বনি-ইসরাইলদের বিভিন্ন নৈতিক আইন-কানুন হয়েছে। যদিও দশটি বিশেষ হুকুম পালনের চেষ্টা তাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারে নি, তবুও সেসব হুকুম তাদেরকে সঠিক জীবনযাপন সম্বন্ধে একটি মানদণ্ড দান করেছে এবং একটি জাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বনি-ইসরাইলরা জানত কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয়। এছাড়াও নিজের কাছে আসার একটি পথ দান করার দ্বারা আল্লাহ্‌ তাঁর মহব্বত তাদের দেখিয়েছিলেন। যদি লোকেরা বিশ্বাস সহকারে একটি পশুর রক্ত কোরবানী করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা গ্রহণ করবেন। মাবুদ আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, কিন্তু তারা সেজন্য কৃতজ্ঞ ছিল না। তারা আবারও অভিযোগ করতে শুরু করেছিল।

বনি-ইসরাইলদের বিষয় বলতে গিয়ে আমরা অবশ্যই নিজেদের বিষয়ে গর্ব করব না। কেননা আমরাও প্রায় সময়ই অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হই। বনি-ইসরাইলদের মত আমাদেরও একই মনোভাব আছে।

অনেক ভাবে বনি-ইসরাইলরা সব মানুষদের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিল। তারা প্রত্যেক বছর আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে আরও বেশী করে শিখছিল এবং এই জ্ঞান তাদের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্বও নিয়ে এসেছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে...

> *যাকে বেশি দেওয়া হয় তার কাছে থেকে বেশী দাবী করা হবে; আর লোকে যার কাছে বেশি রেখেছে তার কাছে তারা বেশিই চাইবে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১২:৪৮ আয়াত)*

বনি-ইসরাইলরা তখন সমষ্টিগত ভাবে দুনিয়ার অন্য যেকোন লোকের চেয়ে আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে আরও বেশী করে জেনেছিল।

> *এর পর বনি-ইসরাইলরা ইদোম দেশের পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার জন্য হোর পাহাড়ের কাছ থেকে আকাবা উপসাগরের পথ ধরে চলল। কিন্তু পথে তারা ধৈর্য হারিয়ে আল্লাহ্‌ ও মূসার বিরুদ্ধে বলতে লাগল, "এই মরুভূমিতে মারা পড়বার জন্য কেন তোমরা মিসর দেশ থেকে আমাদের বের করে এনেছ? এখানে রুটিও নেই পানিও নেই, আর এই বাজে খাবার আমরা দু'চোখে দেখতে পারি না।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, শুমারী ২১:৪,৫ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ মহান যোগানদাতা। যদিও আল্লাহ্‌ লোকদের অভাব পূরণ করছিলেন

তবুও তারা তাঁকে ধন্যবাদ দেয় নি। তারা তাদেরকে অবহেলা করার বিষয়ে আল্লাহ্‌কে দোষী করেছিল। বনি-ইসরাইলদের এই অভিযোগগুলো সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। তারা মিথ্যা বলার দ্বারা এবং তাঁর নামের অসম্মান করার দ্বারা আল্লাহ্‌র শরীয়তকে অবজ্ঞা করেছিল।

আমরা আগে শিখেছি যে, যখন একজন লোক আল্লাহ্‌র নিয়ম আইন অমান্য করে তখন তাকে তার পরিণতি ভোগ করতে হয়। একজন লোক মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অবহেলা করলে ঠিক যেমন তার হাড় ভেঙ্গে যেতে পারে তেমনি আল্লাহ্‌র নৈতিক আইন অমান্যের দরুন বিভিন্ন পরিণতি ভোগ করতে হয়।

যদিও বনি-ইসরাইলরা গুনাহ্‌ করেছিল তবুও আল্লাহ্‌ বার বার তা উপেক্ষা করেছিলেন* এবং তাদেরকে রহমত দেখিয়েছিলেন। এখন তারা আর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে "নতুন" নয়। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা-মালিক সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিখেছে। এখন তারা দশটি হুকুম সম্বন্ধে জানে। আর তাদের এই জ্ঞানের জন্যই আল্লাহ্‌ তাদের দায়ী করেছেন। আল্লাহ্‌ তাদের গুনাহ্‌ দেখেও না দেখার ভান করে বলতে পারেন নি, "ও, কোন সমস্যা নেই। আমরা সেই গুনাহের কথা ভুলে যাব।" না, সব সময়ই গুনাহের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

*আল্লাহ্‌ শুধু কিছু সময়ের জন্য গুনাহ্‌ উপেক্ষা করে চলেন। তিনি সব গুনাহের শাস্তি দিবেনই। প্রেরিত্‌ ১৭:৩০ আয়াত তুলনা করুন।

"তখন মাবুদ তাদের মধ্যে এক রকম বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে দিলেন। সেগুলোর কামড়ে অনেক ইসরাইলীয় মারা গেল।"
(তৌরাত শরীফ, শুমারী ২১:৬ আয়াত)

সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ্ বলেছেন গুনাহ্ আমাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে। এই মৃত্যু ছিল দৈহিক, সম্পর্কগত ও অনন্ত মৃত্যু। এই ঘটনায় সেই সত্য স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে, কারণ অনেক লোক মারা গিয়েছিল।

বনি-ইসরাইলরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল কেবল আল্লাহ্ই তাদেরকে মুক্ত করতে পারেন। তারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল। তারা ছিল অসহায়।

> *তখন লোকেরা গিয়ে মূসাকে বলল, "মাবুদ ও আপনার বিরুদ্ধে কথা বলে আমরা গুনাহ্ করেছি। আপনি এখন মাবুদের কাছে অনুরোধ করুন যেন তিনি এই সব সাপ আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেন।"*
> *(তৌরাত শরীফ, শুমারী ২১:৭ আয়াত)*

শাস্তিদানের বিষয়ে আল্লাহ্র একটা উদ্দেশ্য আছে। তিনি চান মানুষ যেন তাদের মন পরিবর্তন করে এবং তাঁর কাছে ফিরে আসে। কিতাবুল মোকাদ্দসে আমাদের মন পরিবর্তন করা মানে "তওবা করা।" কিন্তু এই তওবা বেঁচে থাকাকালীন সময়ে করা দরকার। তা করলে আল্লাহ্ নিশ্চয় শুনবেন। যখন গুনাহ্গার লোক আগুনের হ্রদে অনন্ত শাস্তির মুখোমুখি হবে তখন সে আর কোন মতেই তওবা করার সুযোগ পাবে না, আর সে সময় তা করলেও আর লাভ হবে না।

বনি-ইসরাইলরা বুঝতে পেরেছিল তারা গুনাহ্ করেছে। তারা তওবা করেছিল এবং তাদেরকে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ্কে মিনতি করেছিল। তারা আবার আল্লাহ্র উপর ঈমান আনতে শুরু করেছিল।

> *তখন মূসা লোকদের জন্য অনুরোধ করলেন।*
>
> *এর জবাবে মাবুদ মূসাকে বললেন, "তুমি একটা সাপ তৈরী করে একটা খুঁটির উপরে রাখ। যাকে সাপে কামড়াবে সে ওটার দিকে তাকালে বেঁচে যাবে।"*
>
> *তখন মূসা একটা ব্রোঞ্জের সাপ তৈরী করে একটা খুঁটির উপরে লাগিয়ে রাখলেন। কাউকে সাপে কামড়ালে সে ঐ ব্রোঞ্জের সাপের দিকে চেয়ে দেখত আর তাতে সে বেঁচে যেত।"*
> *(তৌরাত শরীফ, শুমারী ২১:৭-৯ আয়াত)*

খুঁটির উপরের সেই সাপটি কোন *যাদু* বিদ্যার *কৌশল* ছিল না। বনি-ইসরাইলরা যাতে দেখাতে পারে তারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে, সেজন্য তিনি কেবল তাদেরকে একটি সুযোগ দিচ্ছিলেন। যখন একজন ইসরাইলীয়কে সাপে কামড় দিত, তখন তাকে কেবল সেই ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকাতে হত। তারপরেই সে সুস্থ হয়ে যেত। ব্রোঞ্জের সেই সাপের দিকে ফিরে তাকিয়ে সেই লোকটি মাবুদের উপর যে তার ঈমান আছে তা প্রমাণ করত। এভাবে সে আল্লাহ্ এবং তাঁর কালামের উপরে ঈমান আনত।

ধরুন, একজন লোককে সাপে কামড় দিল আর সেই লোকটি সেই সাপের দিকে তাকাল না। এই লোকটি হয়তো বলতে পারত "হযরত মূসার মাথা খারাপ, আর তাই তিনি বলেছেন সেই সাপের দিকে তাকালে সুস্থ হওয়া যাবে। এটা আসলেই একটা পাগলামী চিন্তা। আমি এটা বিশ্বাস করি না।" তাহলে এই লোকটি মারা যেত। তার মারা যাওয়ার দু'টি কারণ ছিলঃ ১। সাপের বিষে সে মরবে। ২। আল্লাহ্‌র কালামের উপর ঈমান না আনায় সে মরবে।

একথাটি বুঝতে হবে যে, আমরা আল্লাহ্ সম্পর্কে যা জানি, তার সব কিছুর জন্যই তিনি আমাদের দায়ী বলে বিবেচনা করেন। আমরা যা জানি তার জন্য আমরা দায়ী।

পুনরালোচনাঃ মৃত্যু

কিতাবুল মোকাদ্দস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়।

১। **দেহের মৃত্যুঃ** মানুষের দেহ থেকে তাঁর রূহ্ আলাদা হয়ে যাওয়া।

২। **সম্পর্কের মৃত্যুঃ** আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষের রূহ্ আলাদা হয়ে যাওয়া।

৩। **ভবিষ্যত আনন্দের মৃত্যুঃ** আল্লাহ্‌র কাছ থেকে চিরকালের জন্য মানুষের রূহের বিচ্ছেদ।

"গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু।" *(ইঞ্জিল শরীফ রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)*

৩ কাজীগণ, বাদশাহ্‌গণ ও নবীগণ

আমি এখন মাত্র কয়েকটি পৃষ্ঠায় কয়েক শতাব্দীর বিভিন্ন ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলব। তাই যারা ইতিহাস পছন্দ করেন না, তারা ভয় পাবেন না। এটা একটা সহজ অধ্যয়ন। যদিও আপনি সব কিছু বুঝবেন না তবুও আপনি যথেষ্ট শিখতে পারবেন যাতে সাধারণ ধারণাটি বুঝতে পারেন। দয়া করে ১৮৬-১৮৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া সময়রেখার দিকে নির্দেশ করুন।

মিসর দেশ ছেড়ে আসার পর ওয়াদা-করা দেশে না ঢুকা পর্যন্ত ইসরাইলদের মোট ৪০ বছর সময় লেগেছিল। তারা ওয়াদা-করা দেশে প্রবেশ করার আগেই মূসা নবীর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর তাঁর জায়গায় একজন দক্ষ সেনাপতি এসেছিলেন।

ওয়াদা-করা দেশে ঢোকার পরে সেই দেশে সব কিছু ঠিকঠাক করতে অনেক বছর সময় লেগে গিয়েছিল। তারপরে দেশটি ১২ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকুবের (যিনি ইসরাইল নামেও পরিচিত ছিলেন) ১২জন ছেলের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী (শুধুমাত্র লেবীয় গোষ্ঠী ছাড়া) এক একটি অঞ্চলে গিয়ে বাস করেছিল।

কাজীগণের সময়

বনি-ইসরাইলরা কিছু সময়ের জন্য আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রেখেছিল। কিন্তু তারপরে তারা আবার সত্য থেকে সরে যেতে শুরু করেছিল। শেষে তারা বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করল। আর তাদেরকে আক্রমণ ও পরাজিত করার জন্য বিদেশী জাতিদের অনুমতি দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তারা আবার কয়েক বছর পরে তওবা করত এবং আল্লাহ্‌কে ডাকত। আর আল্লাহ্‌ও তাদেরকে রক্ষা করার জন্য একজন শাসনকর্তা (যাকে কাজীও বলা হয়) দিয়ে সাহায্য করতেন। এভাবে বনি-ইসরাইলরা তাদের উপর বিজয়ী জাতিদেরকে পরাজিত করতেন। বিদ্রোহ, তওবা এবং আবার মুক্ত করার এই চক্র ৩০০ বছর ধরে এভাবে চলেছিল। এই সময়ে মোট ১৫জন কাজী ছিলেন।

মাঝেমাঝে ইসরাইলরা যখন মিথ্যা দেবতাকে বিশ্বাস করত তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌ অন্যান্য জাতিদের ব্যবহার করতেন। আবার অন্য সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমাপূজাকারী জাতিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বনি-ইসরাইল জাতিকে ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্‌ নিরপেক্ষ; তাঁর কাছে প্রিয় বলতে কেউ নেই। তিনি চান সব জাতির সব লোকেরা যেন শুধুমাত্র তাঁর উপরে ঈমান আনে।

বাদশাহ্‌দের সময়

দুনিয়ার সমস্ত জাতিদের মধ্যে বনি-ইসরাইলরাই সবচেয়ে বেশী সুবিধা পেয়েছিল। আল্লাহ্‌ নিজেই ছিলেন তাদের নেতা ও বাদশাহ্‌। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই তারা অন্য জাতিদের অবস্থা দেখে আল্লাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করল এবং একজন মানুষ বাদশাহ্‌ দাবী করল। আল্লাহ্‌ তাদের অনুরোধ কবুল করলেন। যদিও তিনি তাদেরকে মানুষ বাদশাহ্‌ লাভ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, তারপরও তারা তাঁর অবাধ্য হওয়া ও নানান দেব-দেবীর পূজা করা চালিয়ে গেল।

বনি-ইসরাইলদের অনেক বাদশাহ্‌ ছিলেন। খুব কম বাদশাহ্‌ই আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর বাধ্য হয়েছিলেন। এজন্যই শাস্তি দান, তওবা, তারপরে আবার দোয়া করার যে চক্র, সেই চক্রটি চলতেই লাগল। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, তারা একজন কাজীর পরিবর্তে শুধু একজন বাদশাহ্‌ লাভ করেছিল।

সেই বাদশাহ্‌দের মধ্যে কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বনি-ইসরাইলদের সবচেয়ে মহান ও নামকরা বাদশাহ্‌ ছিলেন হযরত দাউদ। অন্যান্য অনেক

বাদশাহ্‌র চেয়ে আল্লাহ্‌র উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল সত্যিকারের। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই তাঁকে গুনাহের চরম পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি মাবুদকে *"আমার নাজাতদাতা"* বলে ডেকেছেন।

বাদশাহ্ দাউদ শুধু একজন বাদশাহ্‌ই ছিলেন না, তিনি একজন নবীও ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে পাক-কিতাবে লেখা অনেক কাওয়ালী লিখতে অনুপ্রেরণা দান করেছিলেন। সেই কাওয়ালীগুলোতে তিনি আল্লাহ্‌র মহব্বত ও রহমতের বিষয়ে প্রশংসা করেছিলেন এবং *ওয়াদা-করা নাজাতদাতা* সম্বন্ধে লিখেছিলেন। আল্লাহ্ হযরত দাউদের কাছে ওয়াদা করে বলেছিলেন সেই *নাজাতদাতা* হবেন তাঁর বংশধর।[৩] স্থানান্তরযোগ্য আবাস-তাম্বুর পরিবর্তে একটি স্থায়ী এবাদতখানা নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর প্রবল আকাঙ্খা ছিল। এই এবাদত-ঘর তিনি রাজধানী শহর জেরুজালেমে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এবাদত-ঘর তৈরীর জিনিষপত্র যোগাড় করা সত্ত্বেও তিনি সেই ঘর নির্মাণের কাজ করতে পারেন নি, বরং তাঁর ছেলে সোলায়মানই সেই নির্মাণ-কাজ পরিচালনা করেছিলেন।

বাদশাহ্ সোলায়মান দু'টি বিষয়ের জন্য নামকরা ছিলেনঃ তাঁর বিশাল *বিশেষ জ্ঞান* এবং জেরুজালেমের *এবাদতখানা* নির্মাণ। এই তাৎপর্যপূর্ণ এবাদতখানাটি মোরিয়া পাহাড়ের উপরে নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই একই পাহাড়ের উপরে হযরত ইব্রাহিম তাঁর ছেলে হযরত ইস্‌হাককে কোরবানী করতে গিয়েছিলেন।

হযরত সোলায়মানের মৃত্যুর পর ইসরাইল জাতি দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। উত্তর দিকের দশটি গোষ্ঠী তাদের নাম *ইসরাইল* রেখে দিয়েছিল। দক্ষিণ দিকের দু'টি গোষ্ঠী *এহুদা* রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। বনি-ইসরাইলরা আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পিত হতে চায় নি। উত্তর দিকের গোষ্ঠীগুলোই প্রথমে অবাধ্য হয়েছিল। তারা বাধ্য হওয়ার ভান করেছিল, কিন্তু তাদের দিল আসলে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে ছিল। যেভাবে চললে আল্লাহ্ খুশী হন, তারা সেভাবে চলতে পারে নি। তারা ছিল দুনিয়ার লোকদের কাছে খারাপ সাক্ষী।

নবীগণ

বনি-ইসরাইলদের কাছে তবলীগ করতে আল্লাহ্ বিভিন্ন নবী পাঠিয়েছেন। এই নবীরা বনি-ইসরাইলদের অনৈতিক জীবনযাপনের বিরুদ্ধে তবলীগ করেছিলেন। তাঁরা লোকদেরকে আসন্ন বিচার সম্বন্ধে সাবধান করে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও মনের কঠিনতার জন্য শাস্তি দেবেন। তারা তাদের দেশে বিদেশীদের প্রতি মহব্বত দেখায় নি। তারা গরীবদের কথা চিন্তা না করে বরং তাদের ঠকিয়েছিল।

> *মাবুদ বলছেন, "ইসরাইলের তিনটা গুনাহ্, এমন কি, চারটা গুনাহের দরুন আমি নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দেব। তার লোকেরা টাকা-পয়সার জন্য সৎ লোকদের এবং পায়ের এক জোড়া জুতার জন্য অভাবীদের*

বিক্রি করে। ধুলা মাড়াবার মত করে তারা গরীবদের মাড়ায় এবং পথ থেকে অভাবীদের ঠেলে সরিয়ে দেয়।

পিতা ও ছেলে একই মেয়ের সঙ্গে জেনা করে এবং এইভাবে আমার পবিত্র নামের অসম্মান করে। তারা প্রত্যেকটি বেদীর কাছে বন্ধক নেওয়া পোশাকের উপরে ঘুমায়। তাদের উপাসনা-ঘরে তারা জরিমানার টাকা দিয়ে কেনা আংগুর-রস খায়" (নবীদের কিতাব, আমোস ২:৬-৮ আয়াত)

পাক-কিতাব লেখার জন্য নবীদের মধ্যে অনেককে আল্লাহ্ পরিচালনা দিয়েছিলেন। সেই নবীরা *ওয়াদা-করা নাজাতদাতার* বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দান করেছিলেন।

সাধারণতঃ বনি-ইসরাইলরা এবং তাদের বাদশাহ্‌রা নবীদের কথাগুলো ভাল ভাবে গ্রহণ করত না। এর একটি কারণ ছিল। নবীগণ তাদের এমন একটি বাণী দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা তারা শুনতে চাইত না। যেমন- নবী হযরত ইশাইয়া লোকদের বলেছিলেন-

দ্বীন-দুনিয়ার মালিক বলছেন, "এই লোকেরা মুখেই আমার এবাদত করে আর মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা কেবল মানুষের শিখানো নিয়ম দিয়ে আমার এবাদত করে।" (নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ২৯:১৩ আয়াত)

বেশির ভাগ বনি-ইসরাইলরাই নবীদের বাণী অপছন্দ করেছিল। তারা নবীদের উপর অত্যাচার করেছিল, এমনকি কাউকে কাউকে হত্যাও করেছিল। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য শয়তান ভণ্ড নবীদের পরিচালিত করেছিল। যদিও আল্লাহ্ ভাল ও খারাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট শিক্ষা দান করেছিলেন, তবুও ভণ্ড নবীদের শিক্ষা বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এসব ভণ্ড নবীরা গুনাহের বিষয়ে বলত না। লোকেরা যা শুনতে চাইত তেমন কথাই তারা বলত। আল্লাহ্ হযরত ইয়ারমিয়াকে পাঠিয়েছিলেন এসব ভণ্ড নবীদের বিষয়ে লোকদের সতর্ক করার জন্য...

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলছেন, "নবীরা যে কথা বলছে তা তোমরা শুনো না; তারা তোমাদের মনে মিথ্যা আশা জাগিয়েছে। তারা মাবুদের মুখ থেকে শুনে কথা বলে না বরং নিজেদের মনগড়া দর্শনের কথা বলে। যারা আমাকে তুচ্ছ করে তাদের কাছে সেই নবীরা এই কথা বলতে থাকে, 'মাবুদ বলছেন, তোমাদের শান্তি হবে'; ...এই নবীদের আমি পাঠাই নি, তবুও তারা আগ্রহের সংগে তাদের সংবাদ লোকদের জানিয়েছে; আমি তাদের কোন কথা বলি নি, তবুও তারা কথা বলেছে। কিন্তু তারা যদি আমার সামনে দাঁড়াত, তাহলে আমার বান্দাদের কাছে তারা আমার কালামই ঘোষণা করত আর খারাপ পথ ও খারাপ কাজ থেকে তাদের ফিরাত।" (নবীদের কিতাব, ইয়ারমিয়া ২৩:১৬,১৭,২১,২২ আয়াত)

ইসরাইল রাজ্যের ছড়িয়ে পড়া

অবশেষে আল্লাহ্ শাস্তি দান করেছিলেন। আশেরীয় জাতি ৭২২ খ্রীঃ পূর্বাব্দে উত্তর দিকের ইসরাইল রাজ্যের সেই ১০টি গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। এই রাজ্যের লোকেরা যে নিজেদের দেশে আবার সুসংগঠিত হয়ে ফিরে এসেছিল, কিতাবুল মোকাদ্দসে তার কোন উল্লেখ নেই।

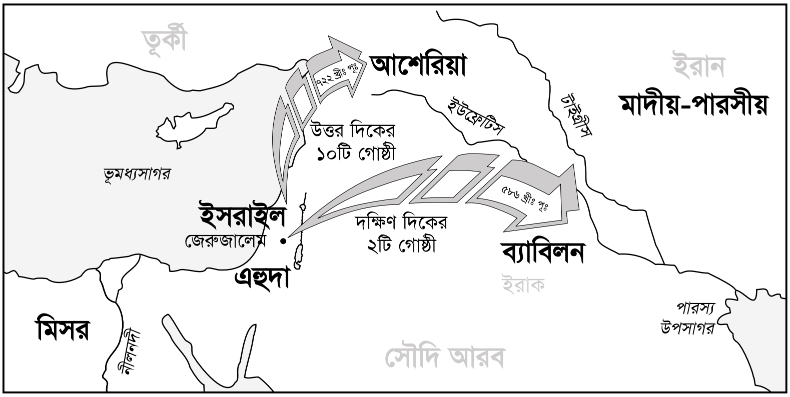

এহুদা রাজ্যের বন্দীত্ব

৫৮৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকের দু'টি গোষ্ঠী একটি রাজ্য হিসাবে ছিল। তারপরে ব্যাবিলনীয়েরা* জেরুজালেম শহর আক্রমণ করে তা ধ্বংস করে ফেলল। ব্যাবিলনের সৈন্যরা হযরত সোলায়মানের তৈরী এবাদতখানাও ধ্বংস করল এবং এহুদার লোকদের বন্দী করে নিয়ে গেল।

*যেখানে ব্যাবিলের উঁচু-ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল সেই এলাকা থেকে আসা লোকেরা।

এই বন্দীদশার সময় থেকেই এহুদার লোকদেরকে ইহুদী বলে ডাকা শুরু হয়েছিল। ব্যাবিলনে নিজেদের এবাদতখানা না থাকায় ইহুদীরা পাক-কিতাব থেকে শিক্ষাদান ও অধ্যয়নের জন্য মজলিস-খানার প্রচলন করেছিল। ৭০ বছর ধরে এহুদার এই বন্দীদশা চলেছিল। ৫৩৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে দক্ষিণ দিকের দু'টি গোষ্ঠীর অল্প সংখ্যক লোক নিজেদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে শুরু করেছিল। তারা নিজেদের দেশে ফিরে জেরুজালেমের চারপাশে বসবাস করতে শুরু করেছিল। আবারও এবাদতখানাটি তৈরী করা হয়েছিল। সেই এবাদতখানাটি হযরত সোলায়মানের তৈরী এবাদতখানার মত এত বড় বা সুন্দর ছিল না। তারপরও ইহুদীরা বিভিন্ন কোরবানী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আবার আল্লাহ্‌র এবাদত করতে শুরু করেছিল।

গ্রীকদের প্রভাব

প্রায় ৪০০ পূর্বাব্দে ৪০০ বছরের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস লেখার কাজ বন্ধ ছিল। এই ৪০০ বছরকে কিতাবুল মোকাদ্দসের 'নীরব যুগ' বলা হয়। ইতিহাস

কিন্তু থেমে ছিল না। ইতিহাসে লেখা আছে এসময়টায় মহান আলেকজাণ্ডার নামে একজন শক্তিশালী ও সুচতুর সেনাপতির আবির্ভাব হয়। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ জয় করে গ্রীস সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি যখন মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়েছিলেন তখন তিনি ইহুদীদেরও তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। তাঁর দূতেরা পরাজিত জাতিগুলোর মধ্যে গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচলন করেছিলেন। যোগাযোগের জন্য গ্রীক ভাষা ব্যবহার হত। আর গ্রীক সংস্কৃতি এতই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল যে, পরবর্তী অনেক শতাব্দী ধরে লোকেরা এর প্রশংসা করেছিল।

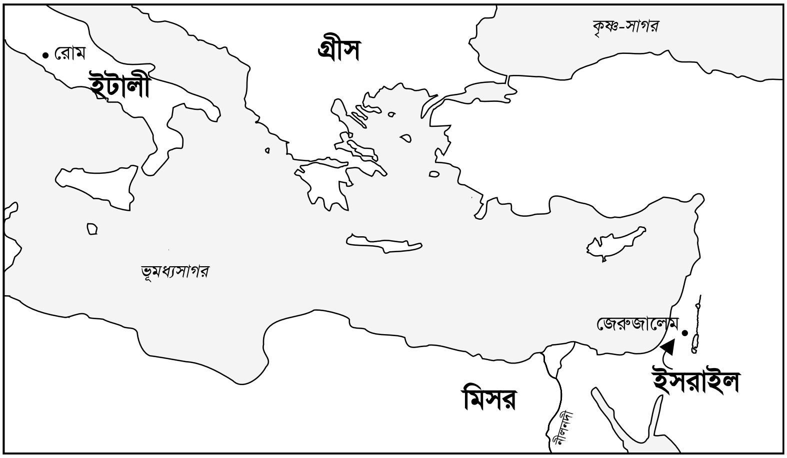

কিছু কিছু ইহুদী স্বেচ্ছায় গ্রীক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল এবং সেটাকে আল্লাহ্‌র বিষয়ে তাঁদের বিশ্বাসের সাথে যুক্ত করেছিল। এই লোকদের বলা হত *সদ্দূকী*। যদিও সদ্দূকীদের সংখ্যা বেশী ছিল না, কিন্তু তাদের অনেক সম্পদ ও প্রভাব ছিল। তারা মহা-ইমামকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইত। আর সে সময় এই মহা-ইমামের পদটি কেনা-বেচা হত।

প্রায় ২০০ বছর ধরে অনেক গ্রীক নেতা ইহুদীদের উপরে রাজত্ব করেছিল। ১৬৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে ইহুদীরা বিদ্রোহ করেছিল। ম্যাক্কাবীয় নামে তাদের একজন নেতা ইহুদীদেরকে স্বাধীনতার পথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এই স্বাধীনতার সময়ে ফরীশী নামে আরেকটি দেশপ্রেমিক ধর্মীয় ইহুদী দল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা সেই সময়কার গ্রীক সংস্কৃতির প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। তারা মূসা নবীর কাছে দেওয়া আল্লাহ্‌র শরীয়তগুলোকে সম্মান করত। তাই আসল শরীয়তকে রক্ষার জন্য তারা নিজেরা কিছু শরীয়ত বানিয়েছিল। আর এসব নতুন শরীয়তও আল্লাহ্‌র শরীয়তের মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ফরীশীরা আল্লাহ্‌র কালামের বাইরে *যোগ* করেছিল।

সেই একই সময়ে সদ্দূকী নামে অন্য আরেকদল আলেম গোষ্ঠের গুরুত্বপূর্ণ লোক ছিলেন। তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব ছিল ফটোকপি মেশিনের মত করে হাতে পাক-কিতাবের মূল লেখা বা পাণ্ডুলিপি থেকে হুবহু তুলে নেওয়া। ফটোকপি মেশিন যেভাবে হুবহু লেখা তুলে, সেভাবে এই লোকেরা খুবই যত্নের সাথে পাক-কিতাবের কথাগুলো বারবার লেখার কাজ করতেন। এই লেখকগণ ছিলেন খুবই শিক্ষিত এবং ধর্মের ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল তাঁদের সেই পরিশ্রমের সাথে প্রায়ই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাব দেখা যেত।

রোমীয়েরা

ম্যাক্কাবীয় বিদ্রোহের পরে ইহুদীরা প্রায় ১০০ বছর মাত্র স্বাধীন ছিল। তারপরে ৬৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সেনাপতি পম্পে জেরুজালেম আক্রমণ করে ইহুদীদের পরাজিত করেন।

যতদিন পর্যন্ত ইহুদীরা সরকারকে খাজনা দিয়েছিল এবং বিদ্রোহ করে নি, ততদিন রোম সরকার ইহুদী ধর্ম পালনের অনুমতি দিয়েছিল। সেই রোমীয় শাসনামলে সব কিছু শান্ত থাকলেও সাম্রাজ্যের লোকেরা ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট ছিল।

রোমীয় সাম্রাজ্য ছিল খুবই বিশাল। এটা রোম থেকে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল শাসনের জন্য স্থানীয় নেতা নির্বাচন করা হয়েছিল। এহুদিয়া ছিল এসময় রোমের একটি প্রদেশ, আর এই প্রদেশে হেরোদ নামে একজন লোককে আঞ্চলিক বাদশাহ্‌ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। চরম নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে *মহান হেরোদ* বলে ডাকা হত। নিজেকে একজন ইহুদী হিসাবে পরিচয় দিলেও তিনি কিন্তু আসল ইহুদীর মত আচরণ করতেন না। রোমীয়দের অধীনে পরবর্তী ১০০ বছর ধরে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা অসন্তুষ্ট ইহুদীদের উপরে শাসন করেছিলেন। এই শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার ব্যাকুল আকাংখায় ইহুদীরা মুনাজাত করেছিল।

আল্লাহ্‌ হযরত ইব্রাহিমের কাছে ওয়াদা করে বলেছিলেন তাঁর বংশধরদের একজন হবেন সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা। যখন সেই ওয়াদা করা হয়েছিল তখন থেকে আরও দু'হাজার বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গিয়েছিল। হযরত ইব্রাহিম থেকে শুরু করে এতগুলো শতাব্দী পর্যন্ত কিছু কিছু ইহুদীর আল্লাহ্‌র কালামের উপরে ঈমান ছিল। তারা তখনও বিশ্বাস করত আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা পরিপূর্ণ করবেন। সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতার আগমনের জন্য এই "ঈমানদারেরা" ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করেছিল। রোমীয় নিয়ন্ত্রণাধীনের কঠিন বছরগুলোর সময়ে কিছু কিছু লোক তখনও পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ওয়াদা সমূহ দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরেছিল। যদিও তাঁরা জানত না, তবুও সেই নাজাতদাতার আগমনের সময় এসে গিয়েছিল। তাঁর জন্য সব কিছু প্রস্তুত ছিল। শয়তান অবশ্যই ভয়ে কেঁপে ছিল। ফেরেশতারা ব্যাকুল নীরবতায় অপেক্ষা করছিলেন। সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*** কে হবেন?

নবীরা বলেছেন...

আল্লাহ্ জানতেন বিভিন্ন লোক এসে নিজেদেরকে আল্লাহ্র সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা হিসাবে পরিচয় দেবে। মানুষ যাতে সত্য থেকে মিথ্যা সনাক্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করতে এবং সেই 'ওয়াদা-করা নাজাতদাতার' বিষয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য আল্লাহ্ অনেক ভিন্ন ভিন্ন নবীদের পাঠিয়েছিলেন। এসব নবীদের লেখার সময়কালের ব্যাপ্তি ছিল শত শত বছর। সেই নাজাতদাতার বিষয়ে তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহে ৩০০-এরও বেশী নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে। একজন লোকের দ্বারা ৩০০টির সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করা মোটামুটি অসম্ভব। এমনকি একজন লোকের পক্ষে এর ৪৮টি পূর্ণ করাও অসম্ভব। ডঃ পিটার স্টোনার নামে আমেরিকার একটি কলেজের প্রফেসর বলেছেন, কারো পক্ষে ৪৮টিও পূর্ণ করার সম্ভাবনা দাঁড়ায়- ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। এই সংখ্যাটি এত বড় যে, এটা বুঝতে পারা অসম্ভব। আমেরিকান সায়েন্টিফিক এফিলিয়েশন নামক একটি প্রতিষ্ঠানও ডঃ স্টোনারের এই গবেষণাটি যাচাই করে এটাকে "সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল" বলেছেন।

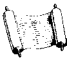

এই বইয়ে আমরা সেই ৩০০টি ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র কয়েকটি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব। বইটি পড়ার সময় যখন এই রকম "স্ক্রোল" বা গুটানো বইয়ের ছবি দেখবেন তখন জানবেন সেই আয়াতটি সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতার বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। আমি সাধারণতঃ নবীদের নাম এবং কখন তাঁদের করা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ করা হয়েছিল এবং পূর্ণ হয়েছিল তার বছর উল্লেখ করব। পরবর্তী কোন একটি অধ্যায়ে পাক-কিতাবের পুরো একটি রুকুর উদ্ধৃতি দেখতে পাব, যে রুকুটি আল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে হযরত ইশাইয়ার কাছে দিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি থেকে আপনি নিজেই বিচার করে দেখতে পারবেন সেটি কার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে।

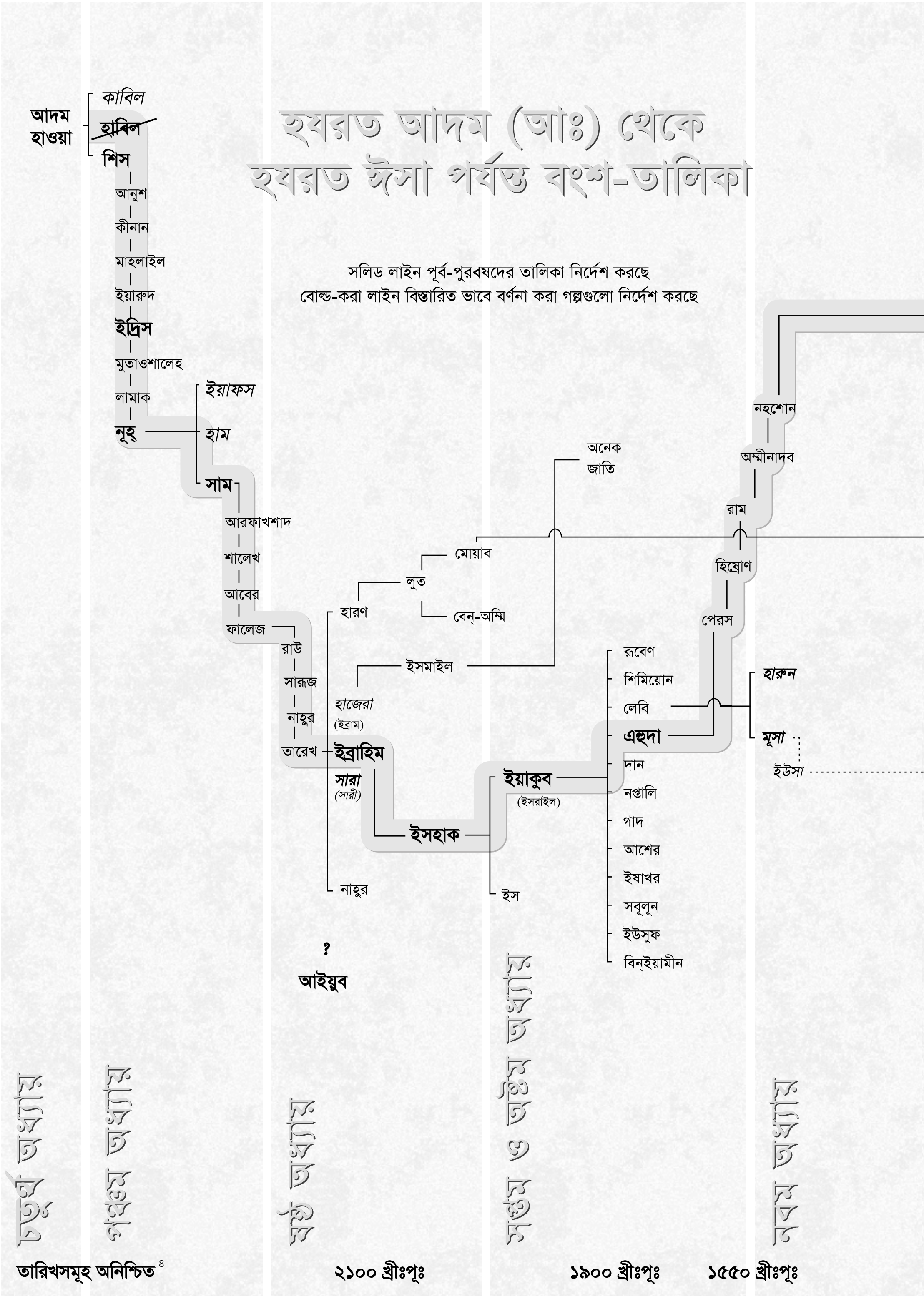
হযরত আদম (আঃ) থেকে
হযরত ঈসা পর্যন্ত বংশ-তালিকা
সলিড লাইন পূর্ব-পুরুষদের তালিকা নির্দেশ করছে
বোল্ড-করা লাইন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা গল্পগুলো নির্দেশ করছে
আদম
হাওয়া
কাবিল
হাবিল
শিস
আনুশ
কীনান
মাহলাইল
ইয়ারুদ
ইদ্রিস
মুতাওশালেহ
লামাক
নূহ
ইয়াফস
হাম
সাম
আরফাখশাদ
শালেখ
আবের
ফালেজ
রাউ
সারুজ
নাহুর
তারেখ
হারণ
লুত
মোয়াব
বেন্-অম্মি
অনেক
জাতি
ইসমাইল
হাজেরা
(ইব্রাম)
ইব্রাহিম
সারা
(সারী)
নাহুর
ইসহাক
ইয়াকুব
(ইসরাইল)
ইস
রূবেণ
শিমিয়োন
লেবি
এহুদা
দান
নপ্তালি
গাদ
আশের
ইষাখর
সবূলূন
ইউসুফ
বিন্‌ইয়ামীন
পেরস
হিষ্রোণ
রাম
অম্মীনাদব
নহশোন
হারুন
মূসা
ইউসা
?
আইয়ুব
চতুর্থ অধ্যায়
পঞ্চম অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়
নবম অধ্যায়
তারিখসমূহ অনিশ্চিত [4]
২১০০ খ্রীঃপূঃ
১৯০০ খ্রীঃপূঃ
১৫৫০ খ্রীঃপূঃ

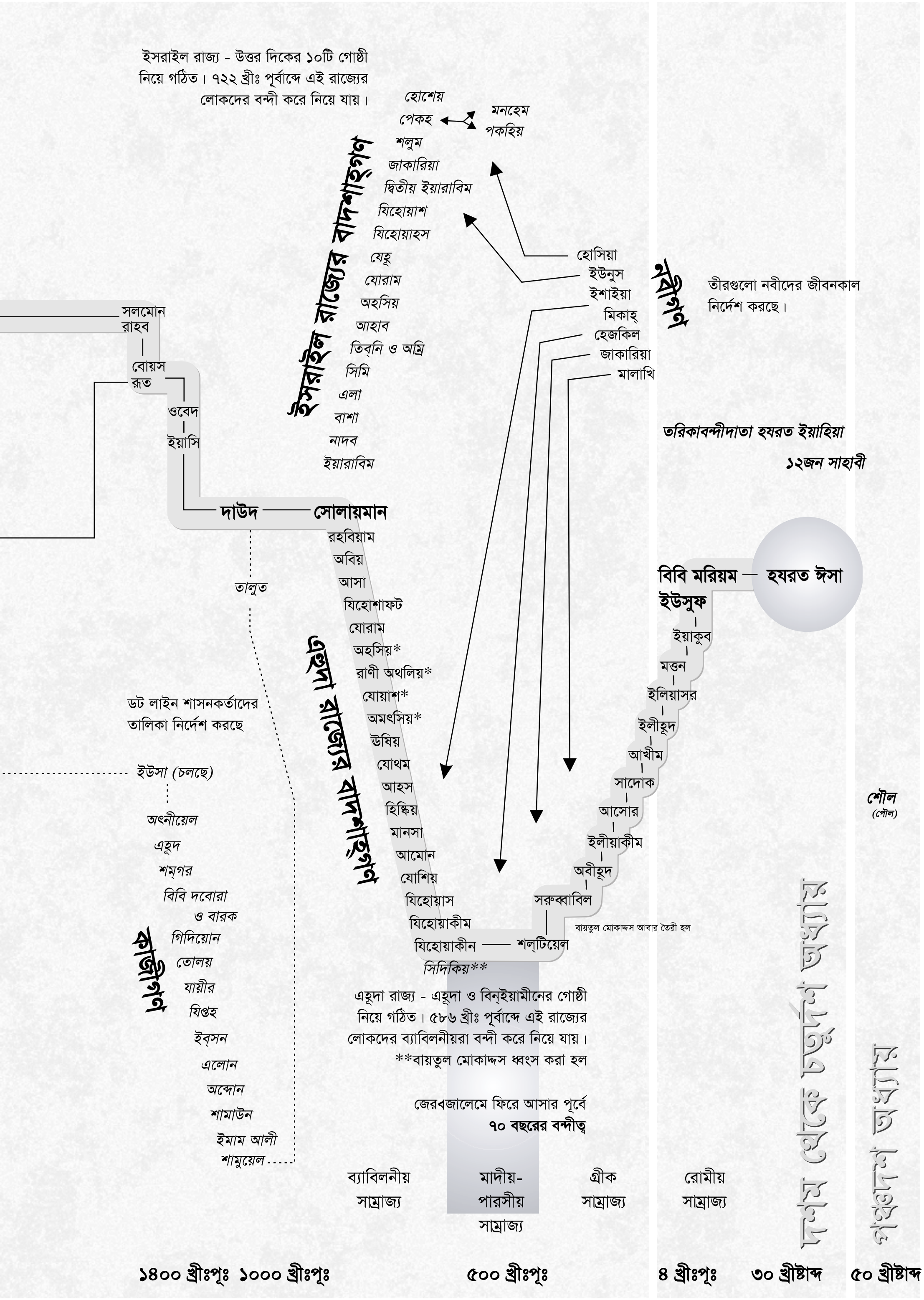

*হযরত ঈসার পূর্ব-পুরুষদের তালিকার বিষয়ে মথির দেওয়া বিবরণে এই শাসনকর্তাদের নাম দেখা যায় না।

দশম অধ্যায়

১ জিবরাইল ফেরেশতা

২ মসীহ্‌

৩ আলেমদের মধ্যে

৪ নবী ইয়াহিয়া

১ জিবরাইল ফেরেশতা

শত শত বছর ধরে শয়তান মানুষকে বন্দী করে রেখেছিল। মানুষ তার গুনাহের ভারে কষ্ট পাচ্ছিল। মানুষের একমাত্র আশা ছিল সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা***। এ কথা সত্য যে, আল্লাহ্ দয়া করে দোষী লোকের জায়গায় মরার জন্য একটি নিষ্পাপ পশুর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই নিষ্পাপ পশুটি ছিল একটি বিকল্প স্বরূপ। কিন্তু এটা ছিল কেবল গুনাহের জন্য একটা অস্থায়ী মূল্য মাত্র। পশুর রক্ত মানুষের গুনাহ্ দূর করতে পারে নি। এটা কেবল গুনাহ্ ঢেকে দিয়েছিল। পাক-কিতাব পরিষ্কার ভাবে বলে...

...ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্ দূর করতে পারে না।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:৪ আয়াত)

মানুষের এই ভয়ানক গুনাহ্ সমস্যার কি কোন সমাধান ছিল? হয়ত একজন লোক আরেকজন লোকের জন্য মরতে আগ্রহী হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন সমাধান হতে পারে না, কারণ একজন গুনাহ্গার আরেকজন গুনাহ্গারকে রক্ষা করতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ, এমন দু'জন লোকের কথা কল্পনা করুন যারা একটা পুরনো গভীর কুয়ায় পড়ল। সেই দু'জন লোক যখন সেই কুয়ার তলার অন্ধকার ও ভেজা কাঁদার মধ্যে বাঁচবার চেষ্টা করছিল তখন তাদের একজন আরেকজনকে বলল, "এই ভয়ানক জায়গা থেকে আমাকে বের কর; আমি এই দুর্গন্ধময় নোংরা কাদায় ডুবে যাচ্ছি।" অন্য লোকটি তখন উত্তর দিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি নিজেও তো ডুবে যাচ্ছি! আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি না।" ঠিক একই ভাবে একজন গুনাহ্গারের পক্ষে আরেকজন গুনাহ্গারকে গুনাহের ভয়ানক গর্ত থেকে টেনে তোলা অসম্ভব।

কিন্তু দুনিয়ার এতগুলো মানুষের মধ্যেকার গুনাহ্ সমস্যা সমাধান করার জন্য নিশ্চয়ই কোন একজন লোকের থাকবার দরকার ছিল। কিন্তু কোন নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। যদিও কেউ কেউ নবী বা ইমাম ছিলেন, তারপরও প্রত্যেকের মধ্যে সেই ভয়ানক গুনাহ্-স্বভাব ছিল। সেই প্রথম থেকেই সমস্ত মানুষ হযরত *আদমের বংশধর* হিসেবে আদমের গুনাহ্-স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ***নাজাতদাতা*** হিসাবে কোন মানুষের পক্ষে সেই কাজ করা অসম্ভব ছিল, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই নিজের গুনাহের শাস্তি পাওনা ছিল।

গুনাহের গর্তের বাইরে থেকে মানুষের একজন ***নাজাতদাতার*** দরকার, অর্থাৎ এমন একজন নিষ্পাপ মানুষের দরকার ছিল যার কোন গুনাহ্-ঋণ নেই এবং যিনি গুনাহের ভয়ানক পরিণতি থেকে মানুষকে নাজাতদান করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু কে সেই ***নাজাতদাতা*** হতে পারবেন? আল্লাহ্ কোথায় এধরনের একজন নিষ্পাপ মানুষ খুঁজে পাবেন? আল্লাহ্ কি এই কাজের দায়িত্ব একজন

ফেরেশতা বা একজন নবীকে দেবেন? কোন মানুষের পক্ষে এর সমাধানের কথা চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা কে হবেন, আল্লাহ্ তা কিভাবে প্রকাশ করবেন? তাঁর আগমনের পরে কিভাবে একজন লোক তাঁকে চিনতে পারবে?

প্রথমতঃ আল্লাহ্ সেই ***নাজাতদাতার*** আগমনের জন্য দুনিয়াকে প্রস্তুত করবেন। তারপরে তিনি সেই আসন্ন ঘটনাটি ঘোষণা করার জন্য একজন বিশেষ সংবাদবাহককে পাঠাবেন।

ইমাম জাকারিয়া

হেরোদ যখন এহুদিয়া প্রদেশের বাদশাহ্ ছিলেন সেই সময়ে ... জাকারিয়া নামে ইহুদীদের একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল এলিজাবেত। তিনিও ছিলেন ইমাম হারুনের একজন বংশধর। তাঁরা দু'জনেই আল্লাহ্র চোখে ধার্মিক ছিলেন। মাবুদের সমস্ত হুকুম ও নিয়ম তাঁরা নিখুঁতভাবে পালন করতেন। তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে হয় নি কারণ এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বয়সও খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল।

একবার নিজের দলের পালার সময় জাকারিয়া ইমাম হিসাবে আল্লাহ্র এবাদত-কাজ করছিলেন। ...তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি বায়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র স্থানে গিয়ে ধূপ জ্বালাতে পারেন।

ধূপ জ্বালাবার সময় বাইরে অনেক লোক মুনাজাত করছিল। এমন সময় ধূপ-গাহের ডানদিকে মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ এসে জাকারিয়াকে দেখা দিলেন। ফেরেশতাকে দেখে তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি ভয় পেলেন। ফেরেশতা তাঁকে বললেন, "জাকারিয়া, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমার মুনাজাত শুনেছেন। তোমার স্ত্রী এলিজাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো ইয়াহিয়া। সে তোমার জীবনে মহা আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ মাবুদের চোখে সে মহান হবে। সে কখনও আংগুর-রস বা কোন রকম মদানো রস খাবে না এবং মায়ের গর্ভে থাকতেই সে পাক-রূহে পূর্ণ হবে। বনি-ইসরাইলদের অনেককেই সে তাদের মাবুদ আল্লাহ্র কাছে ফিরিয়ে আনবে। নবী ইলিয়াসের মত মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে মাবুদের আগে আসবে। সে পিতার মন সন্তানের দিকে ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের

ভাব বদলে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে মাবুদের জন্য এক দল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।”
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৫-১৭ আয়াত)

ফেরেশতা জিবরাইল হযরত জাকারিয়াকে বললেন যে, ইয়াহিয়া নামে তাঁর ছেলেটি প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করবে। অবশ্যই এটা ছিল একটা সুসংবাদ!

হযরত ইয়াহিয়ার জন্মের ৪০০ বছর আগে নবী মালাখি তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন-

***আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন** বলছেন, “দেখ, **আমি** আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি; সে **আমার** আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করবে। তারপর যে মালিকের জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ তিনি হঠাৎ তাঁর ঘরে আসবেন; ব্যবস্থা কাজে পরিণতকারী সেই সংবাদদাতা, যাঁকে তোমরা চাইছ, তিনি আসছেন।”* *(নবীদের কিতাব, মালাখি ৩:১ আয়াত)*

কিতাবুল মোকাদ্দস এই কথাটি স্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। হযরত জাকারিয়া ছিলেন একজন ইমাম এবং পাক-কিতাবের উপরের কথাগুলো তিনি পড়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন আমি আগে এই বিষয়টি লক্ষ্য করি নি? এটা খুবই পরিষ্কার। সর্বশক্তিমান মাবুদ বলেছিলেন, *“দেখ, আমার আগে গিয়ে পথ প্রস্তুত করার জন্য আমি আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি।”* এছাড়াও জিবরাঈল ফেরেশতা বলেছিলেন যে, সেই সংবাদদাতা হবেন ইমাম জাকারিয়ার ছেলে ইয়াহিয়া।

বিবি এলিজাবেত

হযরত জাকারিয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। তিনি বোবা হয়ে গেলেন আর বাড়ী ফিরে গেলেন। আল্লাহ্‌ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করেছিলেন। সেই ফেরেশতা যেভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেভাবেই তা ঘটেছিল।

*“এর পরে তাঁর স্ত্রী **এলিজাবেত গর্ভবতী হলেন** এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেলেন না। তিনি বললেন, ‘এটা মাবুদেরই কাজ। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করবার জন্য তিনি এখন আমার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন’।”* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:২৪,২৫ আয়াত)*

কিন্তু হযরত জাকারিয়া অবশ্যই চিন্তা করে থাকবেনঃ “কিভাবে সর্বশক্তিমান মাবুদ এই দুনিয়াতে আসবেন? তিনি কি সাতটি সাদা ঘোড়ার সোনালী রথে চড়ে আসবেন? জ্বলজ্বল করা ফেরেশতাদের সৈন্যবাহিনী কি তাঁর সঙ্গে আসবেন? তিনি কি রোমীয় শাসনকর্তাদের ও হেরোদকে উৎখাত করবেন? সেই ফেরেশতা সেই বিষয়ে কিছু বলেন নি।

মরিয়ম

এবার ফেরেশতা জিবরাইল মরিয়ম নামে একজন যুবতী মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন।

“এলিজাবেতের যখন ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন। বাদশাহ্ দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক হয়েছিল।”

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:২৬,২৭ আয়াত)

হযরত ইউসুফ ও বিবি মরিয়মের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। পাক-কিতাব বলে তাঁরা দু'জনই বাদশাহ্ দাউদের সরাসরি বংশধর ছিলেন। হযরত দাউদ এই ঘটনারও ১০০০ বছর আগে জীবিত ছিলেন।

ফেরেশতা মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, “মাবুদ তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।” এই কথা শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম সালামের মানে কি। ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমাকে খুব রহমত করেছেন। শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে।” *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:২৮-৩১ আয়াত)*

কী অবাক কাণ্ড! এবার বিবি মরিয়মের মুখ দিয়েও কোন কথা বের হল না। আবার বাকশক্তি ফিরে পেয়ে তিনি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেনঃ

তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন, “এ কেমন করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।”

ফেরেশতা বললেন, “পাক-রূহ্ তোমার উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার কুদরতীর ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইব্‌নুল্লাহ্ বলা হবে।”

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৩৪,৩৫ আয়াত)

মরিয়মই হবেন সেই ***নাজাতদাতা***'র মা। ইতিহাসের প্রথম থেকে এই নাজাতদাতার বিষয়েই হযরত ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরদের কাছে ওয়াদা করা হয়েছিল।

এখন সব কিছু আরও পরিষ্কার হল। পাক-কিতাবের বিভিন্ন ঘটনার কথা বিবি মরিয়মের ভালভাবে মনে পড়ল। আদন বাগানে আল্লাহ্ বিবি হাওয়ার কাছে ওয়াদা করে বলেছিলেন সেই ***“ওয়াদা-করা নাজাতদাতা”*** তাঁর সন্তান হবেন। সেই ওয়াদায় বলা হয় নি “*তাদের সন্তান।*” যদি সেই ওয়াদায় বলা হত “তাদের *সন্তান*”, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াত “পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সন্তান।” আর সেই ওয়াদাটি এখন প্রায় পূর্ণ হতে চলেছে। *সেই শিশুটি একজন অবিবাহিতা মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করবে*। এটি শুধু তাঁর (স্ত্রীলোকের) সন্তান হবে। সেই

শিশুটির মানুষ পিতা থাকবে না। এই বিষয়ে বিবি হাওয়ার কাছে করা ওয়াদাটি এ সময়ের আগ পর্যন্ত গুরুত্বহীন মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা গেল সেই কথা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব।

এই সত্যটির আরও অনেক তাৎপর্য ছিল। যেহেতু বিবি মরিয়মের গর্ভের এই শিশুটির জন্ম হযরত আদমের বীজ থেকে হবে না, তাই সেই শিশুটির মধ্যে আদমের দূষিত রক্তের ধারাও থাকবে না। হযরত আদমের বংশের সকলেই তাঁর *গুনাহ্-স্বভাবের* উত্তরাধিকারী ছিল। কিন্তু হযরত ঈসা সেই আদমের সন্তান হবেন না। তিনিই ইব্‌নুল্লাহ্।* সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র স্বভাব তাঁর মধ্যে থাকবে। এই কারণে পাক-কিতাব বলে...

*১৯৪ পৃষ্ঠায় "ইব্‌নুল্লাহ্" বিষয়ে আরও লেখা আছে।

> *প্রথম মানুষ [আদম] মাটি থেকে এসেছিলেন- তিনি মাটিরই তৈরী; কিন্তু দ্বিতীয় মানুষ [ঈসা] বেহেশত থেকে এসেছিলেন।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ১৫:৪৬,৪৭ আয়াত)*

ফেরেশতা বিবি মরিয়মকে বলেছিলেন যে, সেই শিশুটি হবে "*পবিত্র সন্তান।*" আল্লাহ্ যেমন নিষ্পাপ, সেই শিশুটিও তা-ই হবেন। গর্ভাবস্থা থেকেই তিনি নিখুঁত হবেন।

কাজেই সর্বশক্তিমান প্রভুর আগমন বেহেশতের সব গৌরব ও জাঁকজমক সহকারে হবে না। তিনি অন্য সব শিশুদের মত জন্মগ্রহণ করবেন। জিবরাইল ফেরেশতা বিবি মরিয়মকে বললেন...

> *"দেখ, এই বুড়ো বয়সে তোমার আত্মীয়া এলিজাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।"*
>
> *মরিয়ম বললেন, "আমি মাবুদের বান্দী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।" এর পরে ফেরেশতা মরিয়মের কাছ থেকে চলে গেলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৩৬-৩৮ আয়াত)*

বিবি মরিয়ম জানতেন বিবি এলিজাবেতের বয়স এত বেশী হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁর সন্তান জন্মদান অসম্ভব ছিল। এই বৃদ্ধ বয়সে বিবি এলিজাবেতের জন্য যদি সন্তান ধারণ করা সম্ভব হয়, তাহলে একজন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে সন্তান জন্মদান করাটাও সম্ভব। বিবি মরিয়ম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার পথ বেছে নিলেন।

নবী ইয়াহিয়া

> *"সময় পূর্ণ হলে পর এলিজাবেতের একটি ছেলে হল।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৫৭ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে হযরত ইয়াহিয়ার জন্ম হয়েছিল। পাক-কিতাব বলে

এই জন্মের ফলে একটা গুরুত্ববহ আনন্দ হয়েছিল। লোকেরা প্রায়ই বন্ধ্যা স্ত্রীলোকদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত, কিন্তু এখন সেই বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের গর্ভে তাঁর ছেলে হয়েছে। তাঁর ছেলের নাম রাখার অনুষ্ঠানের পর পরই হযরত জাকারিয়া আল্লাহ্‌র প্রশংসায় ফেটে পড়েছিলেন। পাক-কিতাব বলে...

> *পরে ছেলেটির পিতা জাকারিয়া পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে নবী হিসাবে এই কথা বলতে লাগলেন, "ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মমতা করবার জন্য আর তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা, অর্থাৎ তাঁর কসম পূর্ণ করবার জন্য আমাদের রক্ষা করেছেন। সেই কসম তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের কাছে খেয়েছিলেন।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৬৭-৭০,৭২,৭৩ আয়াত)*

যারা সেই ছেলেটিকে দেখতে এসেছিল, হযরত জাকারিয়া তাদের কাছে ইতিহাসের কথা এবং ***নাজাতদাতা*** পাঠানোর বিষয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াদার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। কল্পনা করুন, বৃদ্ধ হযরত জাকারিয়া তাঁর নতুন ছেলেকে দু'হাতে উঁচু করে ধরেছিলেন যাতে সকলে তাঁকে দেখতে পায়। তিনি বলেছিলেন-

> *"সন্তান আমার, তোমাকে আল্লাহ্‌তা'লার নবী বলা হবে, কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক করবার জন্য তাঁর আগে আগে চলবে।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৭৬ আয়াত)*

হযরত ইয়াহিয়াই সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতার*** দুনিয়ায় আগমনের কথা ঘোষণা করবেন।

একটি নামের অর্থ

পাক-কিতাব নবীদের অনেক ইতিহাস ও শিক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। যদিও এই নবীরা হযরত ঈসার জন্মের অনেক বছর আগে জীবিত ছিলেন তবুও তাঁরা নির্ভুল ভাবে তাঁর জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। হযরত ইশাইয়া হযরত ঈসার জন্মের ৭০০ বছর আগে পাক-কিতাবের এই নীচের অংশটি লিখেছেন।

> *"এই সমস্ত হবে, কারণ একটি **ছেলে** আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন, একটি **পুত্র** আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, **শক্তিশালী আল্লাহ্‌, চিরস্থায়ী পিতা**, শান্তির বাদশাহ্‌।"* *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৯:৬ আয়াত)*

লক্ষ্য করুন, সেই *শিশুকে বলা হবে শক্তিশালী আল্লাহ্, চিরস্থায়ী পিতা*- এই দু'টি নামের অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

আমরা দেখেছি আল্লাহ্র অনেকগুলো নাম আছে। প্রত্যেকটি নাম তাঁর একটি নির্দিষ্ট গুণ বর্ণনা করে। চলুন আমরা হযরত ঈসার জন্য ব্যবহৃত এই দু'টি নামের মধ্যেকার পার্থক্য দেখি।

১। **ইব্‌নুল্লাহ্ঃ** কিছু কিছু লোক **'ইব্‌নুল্লাহ্'** কথাটির অর্থ ভুল ভাবে বুঝেছে। আল্লাহ্র সাথে হযরত ঈসার মা বিবি মরিয়মের অবশ্যই কোনরূপ দৈহিক সম্পর্ক ছিল না কিংবা থাকতে পারে না। এই ধরনের চিন্তা ভুল এবং আল্লাহ্-নিন্দার সামিল। আল্লাহ্র কালাম কখনও এরকম শিক্ষা দেয় না। বরং পাক-কিতাব এর বিপরীতটাই শিক্ষা দেয়। এতে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে, হযরত ঈসার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত বিবি মরিয়মের সাথে কারো দৈহিক মিলন হয় নি। হযরত ঈসা আল্লাহ্র কুদরতীর শক্তিতে মরিয়মের গর্ভে এসেছিলেন, যা দুনিয়াবী দৈহিক মিলনের ফল ছিল না। এই অলৌকিক কাজটি সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ বিবি মরিয়মের শরীরে বিশেষ শক্তি দান করেছিলেন। তিনি একটি শিশুর জন্মদান করতে পেরেছিলেন।

সুতরাং ইব্‌নুল্লাহ্ শব্দটির যদি কোন দৈহিক অর্থই না থাকে, তাহলে এই শব্দটির আসল অর্থ কি?

দুনিয়ার বেশীর ভাগ ভাষা বিভিন্নভাবে এই 'পুত্র' শব্দটি ব্যবহার করে, যা দ্বারা দৈহিক বংশধর বুঝায় না। যেমন- যদি একজন লোককে রাস্তার সন্তান বলে ডাকা হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই লোকটি একজন ভ্রমণকারী। একই ভাবে কিতাবুল মোকাদ্দস 'পুত্র' শব্দটিকে বাগধারা হিসেবে ব্যবহার করেছে। এটা একজন লোকের **বৈশিষ্ট্য** বা তার সাথে সম্পর্ক নির্দেশ করে। পাক-কিতাবে লেখা নীচের উদাহরণগুলো চিন্তা করুনঃ

❖ *"সিবদিয়ের দুই ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্না (এঁদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গিস, অর্থাৎ বজ্রধ্বনির পুত্রেরা)।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:১৭ আয়াত)*

এই আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই, হযরত ঈসার দু'জন সাহাবী হযরত ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে "বজ্রধ্বনির পুত্রেরা" বলা হয়েছে। বজ্রধ্বনির কোন পুত্র থাকতে পারে না। কিন্তু এখানে 'বজ্রধ্বনি' বলতে তাঁদের স্বভাব বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ তারা যে বজ্রধ্বনির মত তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, সে কথা বুঝানো হয়েছে।

❖ *"ঈমানের জন্যই মূসা বড় হবার পর চাইলেন না, কেউ তাঁকে ফেরাউনের মেয়ের ছেলে বলে ডাকে।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১১:২৪ আয়াত)*

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, ফেরাউনের মেয়ে মূসা নবীর গর্ভধারিনী মা না হলেও তাঁকে লালন-পালন করতে গিয়ে তাদের মধ্যে মা-ছেলের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

❖ *"তুমি ইবলিসের সন্তান ও যা কিছু ভাল তার শত্রু ... ।"*

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১৩ঃ১০ আয়াত)

এটা স্পষ্ট যে, শয়তানের স্ত্রী ছিল না এবং তাঁর কোন সন্তানও ছিল না। বরং এই অংশটি একজন দুষ্ট *লোককে* নির্দেশ করছে।

সেইজন্যই কিতাবুল মোকাদ্দস যখন "ইব্‌নুল্লাহ্‌" হিসাবে হযরত ঈসা সম্পর্কে বলে তখন আমাদের এটা বুঝা দরকার যে, এই শব্দটি তাঁর চরিত্রের বিষয়ে নির্দেশ করছে। তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌র নিখুঁত ও পবিত্র স্বভাব ছিল। তাঁর স্বভাব মানুষের মত কলুষিত ছিল না। পাক-কিতাব মানুষের স্বভাবকে বর্ণনা করার জন্য আদমের সন্তান শব্দটি ব্যবহার করেছে। কিন্তু হযরত ঈসা সম্বন্ধে বলেছে-

*"আল্লাহ্‌র সব গুণ সেই পুত্রের মধ্যেই রয়েছে; পুত্রই **আল্লাহ্‌র পূর্ণ ছবি** ... ।"*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১:৩ আয়াত)

২। **ইব্‌নে-আদমঃ** এই শব্দটির অর্থ এই নয় যে, হযরত ঈসার একজন মানব পিতা ছিল। (যদিও ইউসুফ ছিলেন বিবি মরিয়মের স্বামী, কিন্তু তিনি হযরত ঈসার পিতা ছিলেন না)। "ইব্‌নে-আদম" কথাটি হযরত ঈসা কেবল তাঁর নিজের বিষয় বুঝাবার জন্য ব্যবহার করেছিলেন। এর দুটি দিক আছেঃ

ক) 'ইব্‌নে-আদম' কথাটি হযরত ঈসা যে মানুষ ছিলেন, সেকথা ঘোষণা করে। যদিও হযরত ঈসার মানব পিতা ছিল না, তবুও তিনি ১০০% মানুষ ছিলেন। ব্যতিক্রম হল তিনি মানুষ হিসাবে জীবনযাপন করলেও কখনও গুনাহ্‌ করেন নি। আমাদের এই কাহিনী যতই এগিয়ে যাবে ততই আমরা এর গুরুত্ব সম্পর্কে শিখতে পারব।

খ) 'ইব্‌নে-আদম' কথাটি হযরত ঈসার সত্যিকারের পরিচয় ঘোষণা করে। অনেক বছর ধরেই কিতাবুল মোকাদ্দসের পণ্ডিতেরা বুঝতে পেরেছেন যে, 'ইব্‌নে-আদম' কথাটি দ্বারা ***"সেই নাজাতদাতা"***-কে নির্দেশ করা হয়েছে। হযরত ঈসা নবীদের কথাগুলো উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন তিনি ***সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতার*** বিষয়ে করা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ করেছেন। দানিয়েল নবীর লেখা কিতাবটির কথা চিন্তা করুন। এটা হযরত ঈসার জন্মের ৫০০ বছর আগে লেখা হয়েছিল।

রাতের বেলায় আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে আমি তাকিয়ে ইব্‌নে-আদমের মত একজনকে আকাশের মেঘের মধ্যে আসতে দেখলাম। ...সেই ইবনে আদমকে কর্তৃত্ব, সম্মান ও রাজত্ব করবার ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সমস্ত জাতির, দেশের ও ভাষার লোকেরা তাঁর সেবা করে... ।"

(নবীদের কিতাব, দানিয়াল ৭:১৩,১৪ আয়াত)

আমরা যখন কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন চালিয়ে যাব তখন আমরা আরও পরিষ্কার ভাবে এই শব্দটির পুরো অর্থ সম্বন্ধে বুঝতে পারব।

নামগুলো সংযুক্ত করা

'ইব্‌নুল্লাহ্' ও 'ইব্‌নে-আদম' নামগুলো হযরত ঈসার শত শত নাম ও পদবীর মধ্যে মাত্র দু'টি নাম। যখন এই দু'টি নামকে আমরা একসাথে যুক্ত করি, তখন সেগুলো আল্লাহ্ সম্বন্ধেই বলে, যিনি-

"... মানুষ হিসাবে প্রকাশিত হলেন ... ।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ তীমথিয় ৩:১৬ আয়াত)*

হযরত ঈসা যখন মানব রূপ ধারণ করলেন, তখন তাঁর আল্লাহ্-স্বভাব থেমেছিল না। তখনও তাঁর মধ্যে আল্লাহ্‌র-স্বভাব ছিল। আবার যখন তিনি মানুষের রূপ ধারণ করলেন তখন তিনি গুনাহ্ করেন নি। যদিও তিনি নিজে কিছু সীমাবদ্ধতা গ্রহণ করেছিলেন, তারপরও তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও ধার্মিকতায় নিখুঁত। কিভাবে তিনি মানব দেহে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারলেন, আবার একই সময়ে তাঁর সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য একেবারে সম্পূর্ণ, আমাদের পক্ষে তা বুঝা কঠিন। কিন্তু পাক-কিতাব এটাই আমাদের শিক্ষা দেয়। ***আল্লাহ্ মহান এবং যেকোন কিছু করতে পারেন; কিন্তু তিনি কখনও তাঁর স্বভাবের বিপরীতে কাজ করতে পারেন না***। মানুষ রূপে এই দুনিয়াতে তাঁর আগমন সম্বন্ধে লেখার জন্য আল্লাহ্ তাঁর নবীদেরকে অনুপ্রাণীত করেছিলেন। তাহলে কিভাবে তিনি সেই কথা পূর্ণ না করে থাকতে পারেন? এ বিষয়ে অধ্যয়ন করে যেতে যেতে আমরা বুঝতে পারব কেন আল্লাহ্ এইভাবে তাঁর পরিকল্পনা পূর্ণ করার ব্যাপারে স্থির করেছিলেন।

চূড়ান্ত ব্যাখ্যা

কিছু কিছু লোক 'ইবনুল্লাহ্' শব্দটির অর্থ বুঝতে পারে নি। তারা ভুল ভাবে চিন্তা করেছে যে, যদি বিবি মরিয়ম হযরত ঈসার মা হন তাহলে বিবি মরিয়ম আল্লাহ্‌রও মা। এই লোকেরা মনে করে বিবি মরিয়ম এক ধরনের দেবী। আবার কারও কারও বিশ্বাস বিবি মরিয়ম বেহেশতের রাণী, সেজন্য তারা মনে করে আল্লাহ্ বেহেশতে তাঁকে বিয়ে করেছেন এবং তার ফলশ্রুতিতে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছে। কিন্তু *এই শিক্ষা পাক-কিতাবের কোথাও নেই*। এটা সম্পূর্ণরূপে কুফরী বা আল্লাহ্-নিন্দা। পাক-কিতাব এ ব্যাপারে খুবই স্পষ্ট।

বিবি মরিয়ম আল্লাহ্‌কে মহব্বত করতেন এবং আল্লাহ্‌র কালামকে সম্মান করতেন। তিনি সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌ও ছিলেন না, আবার আল্লাহ্‌র মাও ছিলেন না। তবে একথা সত্য যে, বিবি মরিয়মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ 'ঈসা' নামে এই দুনিয়াতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু অন্য সব মানুষের মত বিবি মরিয়ম একজন গুনাহ্‌গার ছিলেন এবং তিনি জানতেন তাঁরও একজন ***নাজাতদাতা*** দরকার।

তখন মরিয়ম বললেন, "আমার হৃদয় মাবুদের প্রশংসা করছে; আমার নাজাতদাতা আল্লাহ্‌কে নিয়ে আমার দিল আনন্দে ভরে উঠছে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৪৬,৪৭ আয়াত)

২ মসীহ্

"ঈসা মসীহের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। ইউসুফের সংগে ঈসার মা মরিয়মের বিয়ের ঠিক হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা একসংগে বাস করবার আগেই পাক-রূহের শক্তিতে মরিয়ম গর্ভবতী হয়েছিল। মরিয়মের স্বামী ইউসুফ সৎ লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি লোকের সামনে মরিয়মকে লজ্জায় ফেলতে চাইলেন না; এইজন্য তিনি গোপনে তাঁকে তালাক দেবেন বলে ঠিক করলেন।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:১৮,১৯ আয়াত)*

ইহুদী সমাজের নিয়ম অনুসারে কোন বাগদান (আক্‌দ) ভেঙ্গে দেবার জন্য তালাক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ইউসুফের চিন্তা সম্বন্ধে ভাবুন। তিনি অবশ্যই মনে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। বিবি মরিয়ম গর্ভবতী এবং তাঁর গর্ভের সন্তানটি তাঁর (ইউসুফের) নয়। যদি তিনি সবার সামনে এই সত্যটি প্রকাশ করে দেন, তাহলে লোকেরা চিন্তা করবে বিবি মরিয়ম জেনাকারী। আবার একজন ফেরেশতা যে বিবি মরিয়মকে দেখা দিয়েছিলেন সে কথা সত্য হলে লোকেরা কি চিন্তা করবে? লোকেরা হয়ত বলবে *"না, না। এটা হাস্যকর! মেয়েটির মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। ইউসুফ তাঁকে ভালবাসে। কিন্তু ইউসুফ এমন কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না, যে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে তাঁর সাথে প্রতারণা করেছে এবং একটি আজগুবি গল্প দিয়ে সেই সত্যকে ঢাকতে চেষ্টা করেছে।"* আমরা জানি না ইউসুফ কি চিন্তা করেছিলেন। তবে আমরা একথা জানি যে, মনের কষ্টে তিনি মরিয়মকে গোপনে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইউসুফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন মাবুদের এক ফেরেশতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, "দাউদের বংশধর ইউসুফ, মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কোরো না, কারণ তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে তা পাক-রূহের শক্তিতেই জন্মেছে।

তাঁর একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ্ থেকে নাজাত করবেন।"

এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: "একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।" এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে আল্লাহ্। *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:২০-২৩ আয়াত)*

ইউসুফ সেই ফেরেশতাটির বাণী পরিষ্কার ভাবে শুনেছিলেন। বিবি মরিয়ম তখনও একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে ছিলেন এবং তিনি ছেলে সন্তানের মা হতে যাচ্ছিলেন! সেই ছেলেটির নাম হবে *ঈসা*, যার অর্থ *নাজাতদাতা*। তিনি তাঁর লোকদেরকে তাঁদের গুনাহের পরিণতি থেকে মুক্ত করবেন। সেই

ফেরেশতাটি বলেছিলেন যে, হযরত ঈসার আরেকটি নাম হবে *ইম্মানূয়েল*, যার অর্থ *আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্*। হযরত ঈসা হবেন মানুষের মধ্যে বাসকারী মানুষরূপী আল্লাহ্।

হযরত ঈসার জন্মের ৭০০ বছর আগে হযরত ইশাইয়া এই কথাগুলো লিখেছিলেন।

> *কাজেই দ্বীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।"*
> *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৭:১৪ আয়াত)*

হয়ত ইউসুফ হঠাৎ তাঁর বিছানায় শোয়া অবস্থা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসলেন। তাহলে নবী ইশাইয়ার কথা ছিল সঠিক! আল্লাহ্‌র ওয়াদা পূর্ণ হবে। কিন্তু লোকেরা কি চিন্তা করবে? তাতে কিছুই আসে যায় না! কিন্তু ইউসুফকে একটি কাজ করতেই হবে। তাঁকে আল্লাহ্‌র কথায় ঈমান এনে অবশ্যই তাঁর বাধ্য হতে হবে।

> *"মাবুদের ফেরেশতা ইউসুফকে যেমন হুকুম দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে তিনি তেমনই করলেন। তিনি মরিয়মকে বিয়ে করলেন, কিন্তু ছেলের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগে মিলিত হলেন না। পরে ইউসুফ ছেলেটির নাম ঈসা রাখলেন।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:২৪,২৫ আয়াত)*

ঈসা মসীহের জন্ম

> *সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার* তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার হুকুম দিলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:১ আয়াত)*

*অগাস্টাস সিজার রোমীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন।

শাসনকর্তা সিজারের টাকা দরকার ছিল। একটি নির্ভুল শুমারী (লোক গণনা) করার পদক্ষেপ নেওয়া হলে হয়ত রোমীয় সরকারের পক্ষে আরও বেশী লোকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা সম্ভব হবে। এই কারণে নাম লেখাবার জন্য সবাইকে অবশ্যই তাদের জন্মস্থানে যেতে হবে। ইউসুফ অবশ্যই এই ঘোষণায় খুশী ছিলেন না, কারণ তখন তাঁর স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের শেষ মাস ছিল। নাসরত গ্রামে তিনি কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন। হয়তো সেখানে তিনি সেই শিশুটির জন্য একটি খাট বানিয়েছিলেন। এছাড়াও সেই শিশুটির প্রসব কাজে সাহায্য করার জন্য হয়ত তিনি একজন ধাত্রীর ব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে ও বিবি মরিয়মকে শুমারী উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মস্থান বেথেলহেমে যেতে হচ্ছে। এক হাজার বছর আগে এই বেথেলহেম ছিল বাদশাহ্ দায়ূদের জন্মস্থান এবং ইউসুফ ছিলেন তাঁর একজন বংশধর। বেথেলহেম প্রায় ১২০ কি. মি. দূরে। তাঁর সাথে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীকে নেওয়া কঠিন হবে! সেই সময়টাকে খুবই অশুভ মনে হয়েছিল। কিন্তু রোম সরকার কাউকে অজুহাত দাঁড় করাতে দেয় নি। তাঁদেরকে এসময় অবশ্যই বেথেলহেমে যেতে হবে।

“নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে যেতে লাগল।

ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্‌ দাউদের জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে।

তাই ইউসুফ নাম লেখাবার জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে গেল। সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৩-৭ আয়াত)

বেথেলহেমে ঈসা মসীহের জন্ম হয়েছিল। যেখানে বিবি মরিয়ম এবং ইউসুফ বাস করতেন, বেথেলহেম ছিল সেই নাসরত গ্রাম থেকে দূরে। শুমারীর কারণে বেথেলহেম মানুষে ভরে গিয়েছিল। শেষে ইউসুফ গোয়াল-ঘরে একটি থাকার জায়গা পেলেন। হযরত ঈসার প্রথম বিছানা ছিল একটি যাবপাত্র। নাসরতে ইউসুফের মনে যেসব পরিকল্পনা ছিল সেগুলো সব ভেস্তে গিয়েছিল। তাঁরা এখন বেথেলহেমের একটি গোয়াল-ঘরে। কিন্তু তিনি সেই শিশুটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় বুঝেছিলেন যে, সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। সবকিছু একেবারেই ঠিক ছিল।

পরে ইউসুফ ছেলেটির নাম ঈসা রাখলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:২৫ আয়াত)

রাখালেরা

বেথেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল। ফেরেশতা তাদের বললেন, “ভয় কোরো না, কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব লোকেরই জন্য। ***আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্‌, তিনিই প্রভু।*** *এই কথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তার চিহ্ন হল এই– তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং যাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।”*

এই সময় সেই ফেরেশতার সংগে হঠাৎ সেখানে আরও অনেক ফেরেশতাকে দেখা গেল। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগলেন,

> *"বেহেশতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৮-১৪ আয়াত)*

রাখালেরা প্রতিদিনের মত নীরবে ভেড়া পাহারা দিচ্ছিলেন। অনেক সময় তাদের পালের ভেড়া জেরুজালেমের এবাদতখানার কোরবানীতে ব্যবহৃত হত। জেরুজালেম বেথেলহেম থেকে মাত্র কয়েক মাইল উত্তরে ছিল। জীবন প্রতিদিনের মতই চলছিল। কিন্তু এই সময় ফেরেশতাদের দেখা গেল। আর রাখালদের জীবনযাত্রায় শিহরণ জেগে উঠল। নাজাতদাতার আগমনের ঘটনাতেই যে তাদের জীবনে শিহরণ জেগেছিল তা নয়, বরং তিনি যে আসলে কে ছিলেন, সে কথা ভেবে তারা শিহরিত হয়েছিল। কী ভয়ানক বিষয়! সেই রাখালেরা অবশ্যই একজন অন্যজনকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমরা যা শুনেছি তা কি তোমরা শুনেছ? মসীহের আগমন হয়েছে! তিনিই প্রভু।"

ঈসা মসীহ্‌

ইবরানী ভাষায় 'মসীহ্‌' শব্দটির অর্থ *"সেই অভিষিক্ত জন।"* শত শত বছর ধরে বনি-ইসরাইলরা মসীহের জন্য অপেক্ষা করেছে; যিনি ছিলেন সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা।

আর এই সময় ফেরেশতারা বলছিলেন যে, সেই অভিষিক্ত জন, অর্থাৎ মসীহ্‌ই হলেন প্রভু।[১] তারা রাখালদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন...

> *আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই মসীহ্‌, তিনিই প্রভু।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:১১ আয়াত)*

সেই লোকেরা যেন এই ঘটনার আসল অর্থ জানতে পারে সেইজন্য আল্লাহ্‌ তাঁর

পক্ষে সংবাদ ঘোষণা করতে ফেরেশতাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

...আমি আল্লাহ্‌ই কি তা করি নি?

আমি ছাড়া আর মাবুদ নেই; আমি ন্যায়বান আল্লাহ্‌, আমি উদ্ধারকর্তা। আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৫ঃ২১ আয়াত)*

আমাদের একথা বুঝতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইনিই সেই একমাত্র আল্লাহ্‌। কেউ যেন এই কথা চিন্তা করতে শুরু না করে যে, একজন বড় এবং একজন ছোট আল্লাহ্‌ আছেন। বরং পাক-কিতাব বলে...

"আমি, আমিই আল্লাহ্‌, আমি ছাড়া আর কোন উদ্ধারকর্তা নেই।"
(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪৩:১১ আয়াত)

মাত্র একজনই নাজাতদাতা ছিলেন এবং আছেন।

ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকে বেহেশতে চলে যাবার পর রাখালেরা একে অন্যকে বলল, "চল, আমরা বেথেলহেমে যাই এবং যে ঘটনার কথা মাবুদ আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।"

তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম, ইউসুফ ও যাবপাত্রে শোয়ানো সেই শিশুটিকে তালাশ করে বের করল... *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:১৫-১৭ আয়াত)*

রাখালেরা ছিল গরীব। তারা এমন কোন লোক ছিল না যে, একজন বাদশাহ্‌র জন্মে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া যায়। কিন্তু রাখালেরা ছাড়াও আরও কয়েকজন লোক শিশু ঈসাকে দেখবার জন্য পথে ছিল।

পণ্ডিতেরা

এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে ঈসার জন্ম হয়েছিল। তখন বাদশাহ্‌ ছিলেন হেরোদ। পূর্বদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত জেরুজালেমে এসে বললেন, "ইহুদীদের যে বাদশাহ্‌ জন্মেছেন তিনি কোথায়? পূর্ব দিকের আসমানে আমরা তাঁর তারা দেখে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে এসেছি।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২:১,২ আয়াত)*

এই পণ্ডিতেরা আসমানের তারা নিয়ে গবেষণা করার বিষয়ে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা আসমানে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনা দেখতে পেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌ যে এই দুনিয়াতে কাজ করছেন তা জানতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ তারা আরব বা পারস্য দেশ (বর্তমান ইরান) থেকে আসছিলেন। তাঁদের সেই যাত্রাটা ছিল দীর্ঘ এবং খুব ব্যয়বহুল। কিন্তু তাঁরা এই বিশেষ শিশুকে দেখতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের লোকেরা বাদশাহ্‌র প্রাসাদে গিয়ে বাদশাহ্‌র সাথে দেখা করার যোগ্য ছিলেন। জেরুজালেমে পৌঁছালে পর বাদশাহ্‌ হেরোদ তাঁদের বিষয় শুনে

বুঝলেন তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মেহমান। তাঁদের আগমন ভয়ের নয়। এই লোকেরা তো কোন সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন না। তাঁদের একমাত্র প্রশ্ন ছিলঃ "যে নতুন বাদশাহ্‌র জন্ম হয়েছে তিনি কোথায়?"

> *এই কথা শুনে বাদশাহ্ হেরোদ এবং তাঁর সংগে জেরুজালেমের অন্য সকলে অস্থির হয়ে উঠলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২:৩ আয়াত)*

এই একটি মাত্র প্রশ্ন হেরোদকে সত্যিই অস্থির করে তুলেছিল। হেরোদ অত্যন্ত ক্ষমতাধর ছিলেন, তাই তিনি সেই ক্ষমতা ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। কেউ তাঁর কাছ থেকে তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেষ্টা করলে তিনি চাইতেন তাকে শেষ করে ফেলতে। জেরুজালেমের লোকেরা সম্ভবতঃ কাঁপছিল। যখন বাদশাহ্ হেরোদ অস্থির হতেন তখন তিনি প্রায়ই নিষ্ঠুর হয়ে উঠতেন। এমতাবস্থায় তিনি কখন কি করে বসবেন তা কে জানে! হেরোদ তাঁর ধর্মীয় পরামর্শদাতাদের ডেকে পাঠালেন।

> *হেরোদ সমস্ত প্রধান ইমাম ও আলেমদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন মসীহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২:৪ আয়াত)*

সেই ধর্মীয় নেতারাও অবশ্যই অবাক হয়ে থাকবেন। এর আগে হেরোদ ধর্মীয় ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান নি। তাই হেরোদের কাছ থেকে মসীহ্ বিষয়ক প্রশ্ন প্রত্যাশার বিষয় ছিল না। যে স্মরণীয় ঘটনা সম্বন্ধে সেই পণ্ডিত লোকেরা অবগত ছিলেন, মনে হয় সে সম্বন্ধে ইহুদী ধর্মীয় নেতারাও কিছু জানতেন না। কিন্তু বাদশাহ্ হেরোদকে তো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আচ্ছা, মসীহ্ কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন?"

ভবিষ্যদ্বাণী

সেই ধর্মীয় নেতারা ও ধর্ম-শিক্ষকেরা গুরুত্ব সহকারে প্রাচীন কিতাব সমূহ তালাশ করে দেখলেন। ৭০০ বছর আগে নবী মিকাহ্ মসীহের জন্মের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কাঁপা কাঁপা আঙ্গুল দিয়ে একজন ধর্ম-শিক্ষক কিতাবের সেই অংশটির দিকে নির্দেশ করলেন এবং এর কথাগুলো সতর্কতার সাথে পড়লেনঃ

> *"কিন্তু, হে বেথেলহেম-ইফ্রাথা, যদিও তুমি এহুদার হাজার হাজার গ্রামগুলোর মধ্যে ছোট, তবুও তোমার মধ্য থেকে আমার পক্ষে এমন একজন আসবেন যিনি হবেন ইসরাইলের শাসনকর্তা, যাঁর শুরু পুরানো দিন থেকে, অনন্তকাল থেকে।"* *(নবীদের কিতাব, মিকাহ্ ৫:২ আয়াত)*

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি খুবই পরিষ্কার। সেই শাসনকর্তা বেথেলহেম-ইফ্রাথায় জন্মগ্রহণ করবেন। বেথেলহেম নামে দু'টি গ্রাম ছিল, যার একটি নাসরতের কাছে এবং অন্যটি ইফ্রাথা এলাকায় জেরুজালেমের দক্ষিণে। সেইজন্য বেথেলহেম-ইফ্রাথা নামটি গুরুত্বপূর্ণ।

ইউসুফের যদি এই তথ্য জানা থাকত, তাহলে তিনি বেথেলহেম-ইফ্রাথায় তাঁদের যাত্রার আসল কারণটি জানতে পারতেন। এটা ছিল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা। ইউসুফ ও বিবি মরিয়মকে সেই গ্রামে আনার জন্য আল্লাহ্‌ রোম সরকারের সেই শুমারীকে ব্যবহার করেছিলেন।

হেরোদ যখন শুনলেন এই শাসনকর্তা অনন্তকাল থেকে আছেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল অবশ্যই বিষন্ন হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ তো অনন্তকালীন হতে পারেন না! সম্ভবতঃ হেরোদ চিন্তা করেছিলেন ধর্ম-শিক্ষকেরা হয়ত তাঁকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছিল। তিনি তাদেরকে সেই ঘর থেকে চলে যেতে বললেন...

> *তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডাকলেন এবং জেনে নিলেন ঠিক কোন্‌ সময়ে তারাটা দেখা গিয়েছিল। তিনি পণ্ডিতদের এই কথা বলে বেথেলহেমে পাঠিয়ে দিলেন, "আপনারা গিয়ে ভাল করে সেই শিশুটির খোঁজ করুন। তাঁকে খুঁজে পেলে পর আমাকে জানাবেন যেন আমিও গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে তাঁকে সম্মান দেখাতে পারি।"*
>
> *বাদশাহ্‌র কথা শুনে পণ্ডিতেরা চলে গেলেন। তাঁরা পূর্ব দিকে যে তারাটা দেখেছিলেন সেই তারাটা তাঁদের আগে আগে চলল। শিশুটি যেখানে ছিলেন সেই ঘরের উপরে এসে না থামা পর্যন্ত তারাটা চলতেই থাকল। তারাটা দেখে পণ্ডিতেরা খুব আনন্দিত হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং সেই শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের কাছে দেখতে পেলেন। তখন তাঁরা মাটিতে উবুড় হয়ে সেই শিশুটিকে সম্মান দেখালেন এবং তাদের বাক্স খুলে তাঁকে সোনা, লোবান ও গন্ধরস উপহার দিলেন।* [২]
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২:৭-১১ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ সেই পণ্ডিতদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

> *পরে আল্লাহ্‌ স্বপ্নে তাঁদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা হেরোদের কাছে ফিরে না যান। তখন তাঁরা অন্য পথে নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।*
>
> *পণ্ডিতেরা চলে যাবার পর মাবুদের এক ফেরেশতা স্বপ্নে ইউসুফকে দেখা দিয়ে বললেন, "ওঠো, ছেলেটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিসর দেশে পালিয়ে যাও আর আমি যতদিন না বলি ততদিন পর্যন্ত সেখানেই থাক, কারণ ছেলেটিকে মেরে ফেলবার জন্য হেরোদ তাঁর খোঁজ করবে।"*
>
> *তখন ইউসুফ উঠে সেই ছেলে ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাতেই মিসরে রওনা হলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই রইলেন। এটা ঘটল যাতে নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: আমি মিসর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে এনেছিলাম।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২:১২-১৫ আয়াত)*

ইতিহাস নিশ্চিত করে বলে যে, হেরোদ হযরত ঈসাকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শিশু ঈসা মিসরে নিরাপদে ছিলেন। প্রাচীন কাল থেকে মিসরকে অত্যাচার ও সহিংসতার দেশ হিসাবে মনে করা হত। আল্লাহ্ এদেশটিকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশু ঈসা যাতে বড় হয়ে উঠতে পারেন সেজন্য আল্লাহ্ এখন মিসরকে একটি নিরাপদ জায়গা হিসাবে সম্মান দান করলেন। মহান হেরোদের নিষ্ঠুর অন্যায় ও খারাপ পরিকল্পনা থেকে মসীহ্‌কে আল্লাহ্ মিসরে সুরক্ষা দিয়েছিলেন।

হেরোদ মারা গেলে পর আল্লাহ্ ইউসুফকে নাসরতে ফিরে যাওয়ার কথা বললেন। আরেকবার তিনি সেখানে তাঁর কাঠমিস্ত্রীর দোকানটি শুরু করলেন।

শিশু ঈসা বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র দোয়া ছিল। *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৪০ আয়াত)*

দুই ধরনের মহত্ত্ব

কিছু কিছু লোক বলে, "এটা অসম্ভব! সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কখনও এত নীচে নামতে পারেন না যে, তিনি একজন অসহায় শিশু হিসাবে একটি নোংরা গোয়াল-ঘরে জন্মগ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ কখনও একজন মানুষ হবেন না! আল্লাহ্ খুবই মহান!"

কিন্তু তা কি আসলেই সত্য? চলুন 'মহান' শব্দটির সংজ্ঞা দেখি।

১। যে বাদশাহ্ রাজপ্রাসাদে থাকেন তাঁকে "মহান" বলে ধরা হয়। তাঁর পাশে থাকে সম্পদ, বিলাসিতা ও চাকর-বাকর। তিনি সাধারণতঃ তাঁর হাত নোংরা করেন না। তিনি সাধারণ লোকদের কষ্ট ও চিন্তার বিষয় সম্বন্ধে খুবই কমই জানেন।

২। "মহান" শব্দের দ্বিতীয় একটি সংজ্ঞা আছে। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তাঁর দেশের নামকরা হাসপাতালটি ছেড়ে বিদেশের একটি দেশে গেলেন। তিনি তাঁর চারপাশে রোগ আর দারিদ্রতা দেখতে পেলেন, আর তাই এই মহান ডাক্তার বিদেশের মাটিতে একটি হাসপাতাল শুরু করেন। তিনি লোকদের সেবা করেন, তাদের সাহায্য করেন, তাদের চিকিৎসা করেন এবং তাদের জন্য তাঁর জীবন দান করেন।

উপরের কোন্ ধরনের মহত্ত্বটি একজন দয়ালু আল্লাহ্‌র বিষয়ে যোগ্যতা আরও বেশী বর্ণনা করে?

আল্লাহ্‌র কালাম

চিঠিপত্র নাকি সামনাসামনি কথাবার্তা- কোন্‌টি দিয়ে আমরা আরও পরিষ্কার ভাবে যোগাযোগ করি? উভয়ই মূল্যবান। চিঠিপত্র গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি একজন লোক কেউ একজনকে সত্যিকার ভাবে জানতে চায় তাহলে তার সাথে একসাথে সময় কাটানোর মত ভাল উপায় আর নেই। যেসব লোক আল্লাহ্‌র কালামের উপর ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌ তাদের রহমত দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ শুধুমাত্র তাঁর সম্বন্ধে আমাদের বলেনেই নি, তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তিনি এই দুনিয়াতে আগমন দ্বারা তাঁর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন।

> *প্রথমেই **কালাম** ছিলেন, কালাম আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং কালাম নিজেই আল্লাহ্‌ ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন। ...সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং **আমাদের মধ্যে বাস করলেন...**।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:১,২,১৪ আয়াত)*

যে কালামটি প্রথমে *আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এবং মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন তা কি?* কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের বলে সেই কালাম ছিলেন ঈসা মসীহ্‌। সেই অনন্ত কালাম মানুষ হিসাবে এই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করার পরেই ঈসা *(অর্থ নাজাতদাতা)* নাম ধারণ করলেন।

কিতাবুল মোকাদ্দস যখন বলে হযরত ঈসা আল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন তখন তার অর্থ এই নয় যে, দু'জন আল্লাহ্‌ আছেন। আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের কথাগুলো আমাদের অন্তর ও মন প্রকাশ করে। আমরা মনে করি না আমরা আমাদের কথাগুলো থেকে আলাদা। কেউ আমাদের মস্তিষ্ক থেকে "কথাগুলো" কেটে বাদ দিতে পারে না। যখন আমরা মুখ দিয়ে বা কলম দিয়ে লিখে যোগাযোগ করি তখন আমরা আসলেই নিজেদের প্রকাশ করছি। যদি কেউ একজন আমার কথাগুলোর সমালোচনা করে তাহলে সে আমাকে সমালোচনা করছে। আমি ও আমার কথাগুলো এক। একই ভাবে আল্লাহ্‌ ও হযরত ঈসা এক। হযরত ঈসা হলেন আল্লাহ্‌র কালাম বা মুখের কথা।

যেহেতু আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ যোগাযোগকারী, তাই তিনি যোগাযোগের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কখনও তাঁর নিজেকে কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার পরিকল্পনা করেন নি। তিনি একজন মানুষ হিসেবে এই দুনিয়াতে এসেছিলেন।

> ***সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন।*** *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:১৪ আয়াত)*

৩ আলেমদের মধ্যে

ইউসুফ ও বিবি মরিয়ম শিশু ঈসাকে লালন-পালন করেছিলেন। এটা অবশ্যই অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল, কারণ হযরত ঈসা ছিলেন নিষ্পাপ। ছোটবেলায় হযরত ঈসা কখনও তাঁর মা-বাবার সাথে তর্ক করেন নি, তাঁদের অসম্মান করেন নি কিংবা তাঁদের প্রতি অধৈর্য হন নি। যদিও হযরত ঈসার শৈশব সম্বন্ধে অনেক ধারণা প্রচলিত আছে, কিন্তু পাক-কিতাব আমাদেরকে শুধুমাত্র একটি ঘটনার কথা বলে। তখন হযরত ঈসার বয়স ছিল ১২ বছর।

> *উদ্ধার-ঈদের সময়ে ঈসার মা-বাবা প্রত্যেক বছর জেরুজালেমে যেতেন। ঈসার বয়স যখন বারো বছর তখন নিয়ম মতই তাঁরা সেই ঈদে গেলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৪১,৪২ আয়াত)*

ইহুদীদের নিয়ম অনুসারে যখন একটি বালক “সাবালক” হত তখন সে ধর্মীয় সমাজের পূর্ণ সদস্য হয়ে যেত। এই ছেলেটি তখন যুবক হিসাবে সমাজের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব লাভ করত। জেরুজালেমে নিজেদের নিয়মমাফিক ভ্রমণের সময় ইউসুফ ও বিবি মরিয়মও হয়ত চিন্তা করেছিলেন হযরত ঈসা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একজন পূর্ণ সদস্য হবেন।[৩]

বাড়ী ফিরে যাওয়া

উদ্ধার-ঈদ শেষে প্রত্যেকে তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরতে শুরু করেছিল। হয়ত পারস্পরিক সঙ্গ লাভ ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নাসরত গ্রামের লোকেরা একসাথে ভ্রমণ করত।

> *ঈদের শেষে তাঁরা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন ঈসা জেরুজালেমেই থেকে গেলেন। তাঁর মা-বাবা কিন্তু সেই কথা জানতেন না। তিনি সংগের লোকদের মধ্যে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ চলে গেলেন।*
>
> *পরে তাঁরা তাঁদের আত্মীয় ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে ঈসার তালাশ করতে লাগলেন। কিন্তু তালাশ করে না পেয়ে তাঁকে তালাশ করতে করতে তাঁরা আবার জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৪৩,৪৪,৪৫ আয়াত)*

তালাশ করা

হয়ত বিবি মরিয়ম ও ইউসুফ পাগলের মত অনেক জায়গায় তালাশ করেছিলেন। একটি সাধারণ বালককে পাওয়া যেতে পারে এমন সব সম্ভাব্য জায়গায় তাঁরা ঈসাকে তালাশ করে দেখেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁরা বাজারে ও হোটেলে তালাশ করে দেখেছিলেন। শেষবার তাঁকে জেরুজালেমের এবাদতখানায় দেখা গিয়েছিল। তাই মরিয়া হয়ে তাঁরা আবার এবাদতখানায় ফিরে আসলেন।

তিন দিন পরে তাঁরা তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দসে পেলেন। তিনি আলেমদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন। যাঁরা ঈসার কথা শুনছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর জবাব শুনে অবাক হচ্ছিলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৪৬,৪৭ আয়াত)

কী আশ্চর্য! হযরত ঈসা কারো শিক্ষা শুনছিলেন না, বরং শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যদিও তিনি কোন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন না তবুও তিনি খুবই গভীর ও অর্থপূর্ণ সব প্রশ্ন করছিলেন। তাঁর প্রশ্নগুলো প্রমাণ করেছিল পাক-কিতাবের বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে। বায়তুল-মোকাদ্দসের জ্ঞানী ধর্মীয় নেতারা প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনছিলেন। পাক-কিতাব বলে যে, সেই আলেমেরা তাঁর কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন!

তাঁর মা-বাবাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে ঈসাকে খুঁজে পেয়ে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন।

তাঁর মা-বাবা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, "বাবা, তুমি আমাদের সংগে কেন এমন করলে? তোমার পিতা ও আমি কত ব্যাকুল হয়ে তোমার তালাশ করছিলাম।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৪৮ আয়াত)

হযরত ঈসা তাঁর মা-বাবাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন-

"তোমরা কেন আমার তালাশ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে?।" (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২ঃ৪৯ আয়াত)

নরম উত্তর

হযরত ঈসার দেওয়া উত্তরটি অসম্মানের ছিল না। তিনি শুধু বলছিলেন যে, তিনি তাঁর বাবার বাড়ীতেই আছেন। *কিন্তু হযরত ঈসা "বাবা" বলতে কি বুঝিয়েছিলেন? কাকে তিনি তাঁর বাবা বলছিলেন?* আমরা এ বিষয়ে পরবর্তী ভাগে আরও অধ্যয়ন করব। হযরত ঈসা শান্ত ও নরম ভাবে তাঁর দুনিয়াবী মা-বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আসলেই কে ছিলেন।

ঈসা যা বললেন তাঁর মা-বাবা তা বুঝলেন না। এর পরে তিনি তাঁদের সংগে নাসরতে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা এই সব বিষয় মনে গেঁথে রাখলেন। ঈসা জ্ঞানে, বয়সে এবং আল্লাহ্ ও মানুষের মহব্বতে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২:৫০-৫২ আয়াত)

৪ নবী ইয়াহিয়া

৩০ বছর বয়সে হযরত ঈসা তাঁর কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইমাম জাকারিয়ার ছেলে হযরত ইয়াহিয়া হযরত ঈসার কাজের জন্য পথ প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন।

তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এহুদিয়ার মরুভূমিতে এসে এই বলে তবলিগ করতে লাগলেন, "তওবা কর, কারণ বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে।" এই ইয়াহিয়ার বিষয়েই নবী ইশাইয়া বলেছিলেন,

*"মরুভূমিতে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে, 'তোমরা **মাবুদের** পথ ঠিক কর; তাঁর রাস্তা সোজা কর।'"*

...জেরুজালেম, সমস্ত এহুদিয়া এবং জর্ডান নদীর চারপাশের লোকেরা সেই সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:১-৩,৫ আয়াত)*

৭০০ বছর আগে করা হযরত ইশাইয়া নবীর ভবিষ্যদ্বাণীটি নবী ইয়াহিয়া পূর্ণ করছিলেন। তিনি প্রভুর জন্য রাস্তা ঠিক করছিলেন। একই অংশে নবী ইশাইয়া বলেছিলেন...

হে সিয়োন, সুসংবাদ আনছ যে তুমি, তুমি উঁচু পাহাড়ে গিয়ে ওঠো। হে জেরুজালেম, সুসংবাদ আনছ যে তুমি, তুমি জোরে চিৎকার কর, চিৎকার কর, ভয় কোরো না; এহুদার শহরগুলোকে বল, "এই তো তোমাদের আল্লাহ্‌!" *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৪০:৯ আয়াত)*

নবী ইয়াহিয়া সবাইকে বলছিলেন মসীহ্‌, অর্থাৎ সেই ***'ওয়াদা করা নাজাতদাতার'*** আগমন হয়েছে। তাঁর এই ঘোষণা প্রত্যেককে নাড়া দিয়েছিল।

তরিকাবন্দী

হযরত ইয়াহিয়াকে তরিকাবন্দীদাতা নামটি দেওয়া হয়েছিল, কারণ তিনি লোকদের তরিকাবন্দী দিচ্ছিলেন। তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যে তরিকাবন্দী একটি পরিচিত ও অর্থপূর্ণ রীতি ছিল। গ্রীক ভাষার "বাপ্টিজো" শব্দ থেকে তরিকাবন্দী (baptism) শব্দটি এসেছে, যার অর্থ একাত্ম হওয়া। গ্রীস দেশের বস্ত্র শিল্পে কাপড় রং করার বড় পাত্রের মধ্যে কাপড় ডুবানো হত। সেই কাপড় কাঁচা রং শুষে নিয়ে রংয়ের সাথে সম্পূর্ণরূপে *এক হয়ে যেত*।

হযরত ইয়াহিয়া ইহুদীদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তারা পাক-কিতাবের কথাগুলো থেকে সরে গিয়েছে। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় ঈমান না এনে তারা মানুষের ধারণা সমূহের উপর ঈমান এনেছিল। হযরত ইয়াহিয়া তাদেরকে তওবা করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরতে বলেছিলেন। তরিকাবন্দী গ্রহণ করে ইহুদীরা

দেখিয়েছিল যে, তওবা করার বিষয়ে হযরত ইয়াহিয়ার তবলীগ করা বাণীর সাথে তারা একমত।

> *"জেরুজালেম, সমস্ত এহুদিয়া এবং জর্ডান নদীর চারপাশের লোকেরা সেই সময় তাঁর কাছে আসতে লাগল। এই লোকেরা যখন নিজেদের গুনাহ্ স্বীকার করল তখন ইয়াহিয়া জর্ডান নদীতে তাদের তরিকাবন্দী দিলেন।*
>
> *পরে ইয়াহিয়া দেখলেন অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী তরিকাবন্দী নেবার জন্য তাঁর কাছে আসছেন। তিনি তাঁদের বললেন, "সাপের বংশধরেরা! আল্লাহ্‌র যে গজব নেমে আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এই বুদ্ধি তোমাদের কে দিল? ভাল, তোমরা যে তওবা করেছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:৫-৮ আয়াত)*

তওবা

তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়ার শ্রোতাদের মধ্যে ছিল ফরীশী ও সদ্দূকী। এই দু'টি ধর্মীয় দল একে অন্যকে অপছন্দ করত, কিন্তু একটি দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল ছিল। উভয় দলই বিশ্বাস করত তারা অন্যদের চেয়ে ভাল। তারা ছিল অহংকারী। হযরত ইয়াহিয়া তাদেরকে *সাপের বংশধর* বলে ডেকেছেন, কারণ তারা অন্যদের উপর অসহনীয় কড়া নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের শিক্ষার সাথে তাদের কথা ও কাজের মিল ছিল না। হযরত ইয়াহিয়া এই ধর্মীয় নেতাদেরকে তওবা, অর্থাৎ মন পরিবর্তন করার জন্য বলেছিলেন।

হযরত ঈসার পরিচয় প্রকাশ

> *সেই সময় ঈসা তরিকাবন্দী নেবার জন্য গালীল থেকে জর্ডান নদীর ধারে ইয়াহিয়ার কাছে আসলেন। ইয়াহিয়া কিন্তু তাঁকে এই কথা বলে বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, "আমারই বরং আপনার কাছে তরিকাবন্দী নেওয়া দরকার; আর আপনি কিনা আসছেন আমার কাছে!।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:১৩,১৪ আয়াত)*

হযরত ইয়াহিয়া ছিলেন একজন নবী, কিন্তু তিনি জানতেন হযরত ঈসা একজন নবীর চেয়েও বেশি কিছু। কোন কিছুর বিষয়ে হযরত ঈসার তওবা করার দরকার নেই, কারণ তিনি নিখুঁত। তিনি এটাও জানতেন যে, হযরত ঈসার তরিকাবন্দী নেওয়ার দরকার নেই। তাঁরই বরং হযরত ঈসার কাছ থেকে তরিকাবন্দী নেওয়া দরকার। সেজন্যই *তিনি* হযরত ঈসার কাছ থেকে তরিকাবন্দী পাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন।

> *তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "কিন্তু এবার এই রকমই হোক, কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এইভাবেই আমাদের পূর্ণ করা উচিত।" তখন ইয়াহিয়া রাজী হলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:১৫ আয়াত)*

হযরত ঈসা তরিকাবন্দী নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ ধার্মিকতায় জীবনযাপনের বিষয়ে হযরত ইয়াহিয়ার বাণীর সাথে তিনি এক হতে চেয়েছিলেন। তরিকাবন্দী নিয়ে হযরত ঈসা নিশ্চিত করেছিলেন হযরত ইয়াহিয়ার প্রচারিত বাণী সত্য।

> *তরিকাবন্দী নেবার পর ঈসা পানি থেকে উঠে আসবার সংগে সংগেই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেল। তিনি আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন বেহেশত থেকে বলা হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:১৬,১৭ আয়াত)*

আমরা শীঘ্রই এসব আয়াত গভীর ভাবে অধ্যয়ন করব, কিন্তু প্রথমে চলুন আমরা এই ঘটনাটি শেষ করি।

আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক

> *পরের দিন ইয়াহিয়া ঈসাকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, **"ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন।** ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:২৯,৩০ আয়াত)*

হযরত ইয়াহিয়া সনাক্ত করেছিলেন হযরত ঈসাই সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা, যিনি দুনিয়ার লোকদের গুনাহ্ দূর করবেন। তিনি বলেছিলেন যে, হযরত ঈসা তাঁর আগে, অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে আছেন। তিনি বলেছিলেন...

> *"আমি তা দেখেছি আর সাক্ষি দিচ্ছি যে, ইনিই ইব্‌নুল্লাহ্।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:৩৪ আয়াত)*

একবার আমি পাক-কিতাব সম্বন্ধে একটি নতুন দম্পতিকে শিক্ষা দিচ্ছিলাম। যখন তারা এই আয়াতটি পড়েছিল *"ঐ দেখ আল্লাহ্‌র মেষ-শাবক, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন!"* তখন স্ত্রীলোকটি আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, *"মেষ-শাবক! আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাবে যেসব ভেড়ার বাচ্চার বিষয়ে পড়ছি, এই মেষ-শাবকের সাথে কি সেসব ভেড়াদের কোন সম্পর্ক আছে?"*

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "হ্যাঁ, সম্পর্ক আছে। ...যখন সময় হবে, তখন সব কিছু একসাথে এমন ভাবে মিলে যাবে যে, তা অবিশ্বাস্য লাগবে।"

জটিল একত্ব

১০০০ বছর ধরে মাবুদ বনি-ইসরাইলদেরকে তাঁর গৌরব ও রহমত দেখিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত করে, অন্য দেব-দেবীর নয়। কিন্তু তারা সেই একমাত্র সত্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ফিরে গিয়েছিল। এর ফলে তারা দুঃখ-কষ্ট, অন্য জাতিদের দ্বারা আক্রমণ ও বন্দীত্বের শিকার হয়েছিল। অবশেষে ইসরাইল জাতি তওবা করেছিল এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদত করেছিল।

কিন্তু এখন মাবুদ আল্লাহ্ চাইলেন তাঁর লোকেরা এবং অন্য সব জাতিরা যাতে তাঁর বিষয়ে আরো বেশী কিছু জানতে পারে। এই বেশী কিছু সম্বন্ধে শেখার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রস্তুত হয় নি যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌র একত্বের বিষয়টি শিখেছে। তারা শিখেছিল- "আমাদের মাবুদ আল্লাহ্ এক" *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪ আয়াত)*। কিন্তু এই একত্ব জটিল একত্ব।

আমরা এই ধারণাটি অনেক সময় ব্যবহার করি। যেমন- মাঝেমাঝে আমরা একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয় (যেমন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) বা একটি বড় হাসপাতাল (যেমন- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) কিংবা বড় মার্কেটের (যেমন-চট্টগ্রাম নিউ মার্কেট) বিষয়ে কথা বলি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ত বিজ্ঞান, বাণিজ্য, মানবিক ও কলা নামে বিভিন্ন অনুষদ ও শিক্ষা ভবন আছে। হয়ত ভবনগুলোর একটি থেকে অন্যটি অনেক দূরত্বে অবস্থিত। তবুও সবগুলো অনুষদ ও শিক্ষা ভবন বিশ্ববিদ্যালয় সীমানার মধ্যেই আছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নামেই পরিচিত। একই ভাবে আমরা যখন বলি আল্লাহ্ এক, তখন আমরা বুঝাচ্ছি তাঁর একত্ব জটিল। তিনি পিতা, পুত্র ও পাক-রূহ এ তিনে মিলে এক। কিছু কিছু লোক এটাকে ত্রিত্ব বা তিনজনের মধ্যে ঐক্য বলে থাকে। ত্রি অর্থ তিন; ঐক্য অর্থ একঃ তাই একের মধ্যে তিন।

হযরত ঈসার জন্মের আগে নবীরা আল্লাহ্‌র একত্বে বহুবচনের বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন। কয়েকটি আয়াতে বুঝা যায় মাবুদ তাঁর নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আল্লাহ্ যে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন তা হযরত মূসা লিখেছিলেন এই ভাবে...

> *আল্লাহ্ বললেন, "**আমরা আমাদের** মত করে এবং **আমাদের** সঙ্গে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি...।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১:২৬ আয়াত)*

হযরত আদম যখন গুনাহ্ করলেন তখন...

মাবুদ আল্লাহ্ বললেন, "দেখ, নেকী-বেদীর জ্ঞান পেয়ে মানুষ ***আমাদের*** *একজনের মত হয়ে উঠেছে...।"*
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২২ আয়াত)

আল্লাহ্ যখন ব্যাবিলের লোকদের ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন...

"কাজেই এস, ***আমরা*** *নীচে গিয়ে তাদের ভাষায় গোলমাল বাধিয়ে দিই যাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে না পারে। তারপর মাবুদ সেই জায়গা থেকে তাদের সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিলেন।"*
(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ১১:৭,৮ আয়াত)

নবীরা আল্লাহ্র "ইলোহিম" নামটি ব্যবহার করেছিলেন। এই নামটি একটি জটিল একত্বের দিকে ইঙ্গিত করে, কারণ ইব্রীয় ভাষায় এটি একটি বহুবচনীয় বিশেষ্য পদ।

একই সাথে আল্লাহ্ ও মানুষ রূপে এই দুনিয়াতে এসে মাবুদ তাঁর এই জটিল একত্বের বিষয়ে আরও বেশী কিছু প্রকাশ করেছেন। জিবরাইল ফেরেশতা বিবি মরিয়মের সাথে কথা বলার সময় বলেছিলেন...

...পাক-রূহ্ *তোমার উপরে আসবেন এবং* ***আল্লাহ্তা'লার*** *শক্তির ছায়া* ***তোমার উপরে পড়বে।*** *এইজন্য যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে* ***ইব্নুল্লাহ্*** *বলা হবে। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১:৩৫ আয়াত)*

এই আয়াতে জিবরাইল ফেরেশতা তিনজন ব্যক্তি কিন্তু একজন আল্লাহ্র বিষয়েই বলেছেন। পাক-কিতাবের এই আয়াতের পর থেকেই আমরা এই একের ভিতর তিনের স্পষ্ট ধারণা দেখতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা পড়ি...

তরিকাবন্দী নেবার পর ***ঈসা*** *পানি থেকে উঠে আসবার সংগে সংগেই তাঁর সামনে আসমান খুলে গেল। তিনি* ***আল্লাহ্র রূহ্*** *কে কবুতরের মত হয়ে তাঁর উপরে নেমে আসতে দেখলেন। তখন* ***বেহেশত থেকে বলা হল,*** *"ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।"* *ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৩:১৬,১৭ আয়াত*

এখানে তিনটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছেঃ হযরত ঈসা, আল্লাহ্র রূহ্ এবং একটি বেহেশতী কন্ঠ। কিন্তু এই তিন মিলে এক। অর্থাৎ তিনি এক জটিল আল্লাহ্, যার ব্যক্তিগত নাম মাবুদ।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতালের ধারণা থেকে এই জটিল একত্বটি সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যখন আমরা আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এই শব্দটি প্রয়োগ করি, তখন আমাদের মন স্তব্ধ হয়ে যায়। বছরের পর বছর অনেক লোক আল্লাহ্‌র বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে। এসব উদাহরণ ব্যবহার করে তারা "একের মধ্যে তিন"-এর ধারণাটি বুঝতে চেষ্টা করেছে। যেমন-

১। **পানি**। এই পানির তিনটি অবস্থা আছে, যেমন- তরল, বাষ্প ও বরফ। কিন্তু এই তিনের সবগুলো পানি।

২। **দিক**। একটি বাক্সের উচ্চতা, প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য আছে। যদিও এই তিনটি দিক এক নয়, কিন্তু সেগুলোকে আলাদা করা সম্ভব নয়।

৩। **গুনন**। ১x১x১ = ১

৪। **সূর্য**। সূর্যের আছে দৃশ্য আকার, অদৃশ্য আলোকরশ্মি এবং উষ্ণ তাপরশ্মি। তথাপি তিনটি আলাদা আলাদা উপাদান হলেও সূর্য মাত্র একটি।

যদিও এসব উদাহরণের কয়েকটা হয়ত সাহায্যকারী তবুও এগুলো সম্পূর্ণরূপে একের মধ্যে তিনের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। মানুষ হিসাবে আমাদের উচিত নয় আল্লাহ্‌কে মানুষের স্তরে নামিয়ে আনা। আমরা তাঁকে আমাদের কোন মানুষের মত করে দেখব না। আল্লাহ্ আমাদের বুঝবার জ্ঞানের চেয়েও আরও বেশী মহান ও উঁচু। তাঁকে বুঝতে না পারার কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন...

তুমি ভেবেছ আমি তোমারই মত একজন। *(জবুর শরীফ ৫০:২১ আয়াত)*

যখন আমরা ছোট ছেলেমেয়ে ছিলাম তখন অনেক বিষয় না বুঝলেও আমরা সেসব বিষয়কে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলাম। উদাহরণ স্বরূপ, "বিদ্যুৎ কি? যখন আমি সকেট থেকে প্ল্যাগটা বের করে ফেলি তখন কেন বিদ্যুৎ মেঝের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় না? আমার পক্ষে বিদ্যুৎকে চোখ দিয়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। সকেটের মধ্যে

আঙ্গুল ঢুকালে আমি ইলেকট্রিক সক্ খাব বলার দ্বারা আপনি কি বুঝান? ঠিক সেইভাবে আমরা যদি বলি আমরা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বুঝি না, তার মানে এই দাঁড়ায় না যে, আসলে বিদ্যুৎ বলে কিছু নেই।

প্রাপ্ত বয়স্ক লোক হিসাবে আমরা এখন আমাদের চারদিকের দুনিয়া সম্বন্ধে অনেক বেশী বুঝি। মানুষের বিভিন্ন সাফল্যের বিষয়ে আমরা

গর্ব অনুভব করি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ সৃষ্টির অনেক বিষয় আবিষ্কার করেছে। এখন আমরা আগেকার লোকদের চেয়ে আরও বেশী বুঝি। তথাপি আমাদের আরও নম্র হতে হবে। আমরা সবকিছু বুঝি না। দুনিয়ার মধ্যে তারপরও অনেক রহস্য থাকবে। হয়ত ভবিষ্যতে একের মধ্যে তিনের এই ধারণাটা বুঝা সম্ভবপর হবে।

ভবিষ্যতে সে দিন আসলেও আমরা আমাদের সসীম মনে কখনও অসীম আল্লাহ্‌কে মিলাতে পারব না। কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত সমূহে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে সেভাবে বুঝলে আমরা দেখতে পাব আল্লাহ্‌ এমন আল্লাহ্‌ যিনি আমাদের অবাক করে দেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে তাঁকে বুঝা অসম্ভব।

অনন্ত আল্লাহ্‌ বিষয়ক পুরো ধারণাটি সহজে চিন্তা করতে ও বুঝতে পারাটা অসম্ভব। আবার আল্লাহ্‌ যে একই সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকেন, সে আল্লাহ্‌কেও ধারণা দিয়ে বুঝানোর চেষ্টাটা হতবুদ্ধিকর। সেরকম ভাবে আল্লাহ্‌র জটিল একত্ব সম্বন্ধে বুঝাও কঠিন ব্যাপার। পাক-কিতাব বলে-

> *"গোপন সব কিছু আমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র ব্যাপার,* ***কিন্তু*** *প্রকাশিত সব কিছু চিরকালের জন্য আমাদের ও আমাদের সন্তানদের... ।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ আয়াত*

আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কিতাবুল মোকাদ্দস নীচের ধারণা সমূহ শিক্ষা দেয় না। যেমন-

❖ **ত্রি-আস্তিকতাবাদ** (তিনজন দেবতার উপর বিশ্বাস)ঃ প্রাচীন মিসরীয়রা এ শিক্ষায় বিশ্বাস করত। তারা তাদের দেবতাদের তিনজন তিনজন করে ভাগ করেছিল, অর্থাৎ এক একটি দলে তিনজন দেবতা ছিল। সাধারণতঃ একটি দল ছিল একটি পরিবার, যেমন- অসিরিস ছিল পিতা দেবতা, ইসিস ছিল মাতা দেবতা এবং হোরোস ছিল পুত্র দেবতা। বর্তমানে কিছু কিছু লোক ত্রিত্বের বিষয়ে ভুল বুঝে। তারা পাক-কিতাবের কথাকে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্‌কে পিতা, মরিয়মকে মাতা (বেহেশতের রাণী) এবং হযরত ঈসাকে সন্তানের আসনে বসায়। আল্লাহ্‌র কালামে এই ধারণাটি শিক্ষা দেওয়া হয় নি।

❖ **ভূমিকাবাদ** (পিতা, পুত্র ও পাক-রূহ্‌ তিনজন আলাদা আলাদা ব্যক্তি নয়, কিন্তু প্রকাশের জন্য শুধুমাত্র একজনের তিনটি ভিন্ন ভূমিকা)ঃ একজন লোক পুত্র, স্বামী ও পিতা হিসাবে তিনটি ভূমিকায় পরিচিত হতে পারে।

একাদশ অধ্যায়

১ প্রলোভন

২ ক্ষমতা ও খ্যাতি

৩ নীকদীম

৪ প্রত্যাখ্যান

৫ জীবন-রুটি

১ প্রলোভন

সৃষ্টির শুরুতেই ইবলিস শয়তান অবাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এই দুনিয়াতে জন্মের সময় ইব্‌নুল্লাহ্* হযরত ঈসা তাঁর সমস্ত গৌরব ও মহিমাকে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। যদিও তিনি সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহ্ ছিলেন তবুও তিনি বেহেশত ত্যাগ করে মানুষ হিসাবে দুনিয়াতে আসলেন। আর সেই ঈসা এখন শয়তানের মুখোমুখি হলেন। যদি শয়তান কোন ভাবে ঈসাকে তার বাধ্য হওয়ার জন্য প্রলোভিত করতে পারে তাহলে তা হবে এক মহা বিজয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এই সময়টা ছিল তাঁর নিজের বিষয়ে আরও বেশী কিছু প্রকাশ করার সময়।

*"ইব্‌নুল্লাহ্"-এর বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্য ১৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

এর পরে পাক-রূহ্ ঈসাকে মরুভূমিতে নিয়ে গেলেন যেন ইবলিস ঈসাকে লোভ দেখিয়ে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা করতে পারে। সেখানে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত রোজা রাখবার পরে ঈসার খিদে পেল। (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:১,২ আয়াত)*

*ইবলিস অর্থ মিথ্যা দোষারোপকারী এবং নিন্দাকারী।

হযরত ঈসা কোন খাবার না খেয়েই ৪০ দিন কাটিয়ে দিলেন। এরপরে শয়তান এসে তাঁকে বলল--

"তুমি যদি ইব্‌নুল্লাহ্ হও তবে এই পাথরগুলোকে রুটি হয়ে যেতে বল।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:৩ আয়াত)

একটি পরামর্শ

শয়তান হযরত ঈসাকে তাঁর দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর পরামর্শ দিয়েছিল যাতে প্রমাণ হয় তিনি আসলে কে। যদি তিনি ইব্‌নুল্লাহ্ হন তাহলে আল্লাহ্ যেভাবে শুধুমাত্র তাঁর মুখের কথা দ্বারা এই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই একই ভাবে পাথরগুলোকে রুটিতে পরিণত করাও হযরত ঈসার জন্য সহজ কাজ হবে। কিন্তু শয়তানের হুকুম মেনে চলার অর্থ তো শয়তানের কাছে সমর্পিত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অমান্য করা।

তাই ঈসা জবাবে বললেন, "পাক-কিতাবে লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু আল্লাহ্‌র মুখের প্রত্যেকটি কালামেই বাঁচে।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:৪ আয়াত)

হযরত ঈসার দেওয়া পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি

শয়তানের পরামর্শের উত্তরে মসীহ্ ঈসা আল্লাহ্‌র লিখিত কালাম, অর্থাৎ পাক-কিতাবের কথা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছিলেন দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর চেয়েও বরং আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়া আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। অনেক লোক তাদের দৈহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে এত বেশী চিন্তা করে যে, তারা রূহানী কল্যাণের বিষয়কে এড়িয়ে চলে।

“যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কোন লাভ নেই।” *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৮:৩৬ আয়াত)*

শয়তানের ব্যবহৃত পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি

তখন ইবলিস ঈসাকে পবিত্র শহর জেরুজালেমে নিয়ে গেল এবং বায়তুল মোকাদ্দসের চূড়ার উপর তাঁকে দাঁড় করিয়ে বলল, “তুমি যদি ইব্‌নুল্লাহ্‌ হও তবে লাফ দিয়ে নীচে পড়, কারণ পাক-কিতাবে লেখা আছে, আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেশতাদের তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন; তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।” *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:৫,৬ আয়াত)*

শয়তান হযরত ঈসার প্রতি এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, প্রমাণ কর তুমি ইব্‌নুল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌ যদি সত্যিই তোমার পিতা হন, তাহলে তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন!

হযরত ঈসাকে ফাঁদে ফেলানোর জন্য সে পাক-কিতাবের জবুর শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিল। সে কেবল আল্লাহ্‌র কালামের একটি অংশ বেছে নিয়েছিল যাতে তার ইচ্ছাপূরণে তা সহায়ক হয়। সে আদন বাগানে আদম ও বিবি হাওয়ার সাথেও এই কৌশলটি ব্যবহার করেছিল, আর এখন সে এটা হযরত ঈসার বেলায়ও ব্যবহার করছে।

পাক-কিতাব থেকে দেওয়া হযরত ঈসার পাল্টা উদ্ধৃতি

আরেকবার হযরত ঈসা সঠিক ভাবে পাক-কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে শয়তানের প্রলোভনের উত্তর দিয়েছিলেন।

ঈসা ইবলিসকে বললেন, “আবার এই কথাও লেখা আছে, তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কে তুমি পরীক্ষা করতে যেয়ো না।”
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:৭ আয়াত)

একটি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

তখন ইবলিস আবার তাঁকে (ঈসাকে) খুব উঁচু একটা পাহাড়ে নিয়ে গেল এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ও তাঁদের জাঁকজমক দেখিয়ে বলল, “তুমি যদি মাটিতে পড়ে আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই আমি তোমাকে দেব।” *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:৮,৯ আয়াত)*

হযরত ঈসা কেবল তার এবাদত করলেই শয়তান তাঁকে দুনিয়ার সব জাতিদের উপর বাদশাহী দান করবে। হযরত ঈসা কি তা চান নি? তিনি কি চান নি সব লোকেরা তাঁকে অনুসরণ করুক? শয়তান তো তাঁকে তা-ই দেবার কথা বলছে। কিন্তু শয়তানের কথার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। শয়তান বলে নি যে, হযরত ঈসা যদি তাঁর এবাদত করেন, তবে তাঁকে তার (শয়তানের) সেবা করতে হবে। এবাদত ও সেবার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। আমরা এ দু'টিকে আলাদা করতে পারি না। কিন্তু শয়তানের চালাকীটি ব্যর্থ হয়েছিল।

আবারও হযরত ঈসা পাক-কিতাবের কথা ব্যবহার করেছিলেনঃ

> *তখন ঈসা তাকে বললেন, "দূর হও, শয়তান। পাক-কিতাবে লেখা আছে, তুমি তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।"*
>
> *তখন ইবলিস তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর ফেরেশতারা এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:১০,১১ আয়াত)*

শয়তান প্রতারণা করে হযরত ঈসাকে ফাঁদে ফেলতে পারে নি। হযরত ঈসা কিন্তু আপোস করেন নি। প্রলোভনকে প্রতিরোধ করে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। অবশেষে ইবলিস শয়তান পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরও সে হযরত ঈসাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

তবে অন্য একজনের উপর শয়তান কিন্তু সফলতা লাভ করেছিল। তরিকাবন্দীদাতা হযরত ইয়াহিয়াকে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছিল।[১]

> *পরে ঈসা শুনলেন ইয়াহিয়াকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। তখন তিনি গালীলে চলে গেলেন এবং নাসরত গ্রাম ছেড়ে সবূলূন ও নপ্তালি এলাকার মধ্যে সাগর পারের কফরনাহূম শহরে গিয়ে রইলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৪:১২,১৩ আয়াত)*

নিষ্পাপ

ভাল ও খারাপের মধ্যে যুদ্ধ সমান সমান হয় না। হযরত ঈসা শয়তানের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু শয়তান একজন সৃষ্ট। যদিও হযরত ঈসাকে প্রলোভন দেখানো হয়েছিল তবুও তিনি প্রলোভন ও গুনাহের কাছে সমর্পিত হন নি। তিনি ছিলেন নিখুঁত। এই দুনিয়াতে সত্য নবী ও ভণ্ড নবীদের আগমন হয়েছিল, আবার তারা চলেও গিয়েছিল। এসব নবীদের কেউ নিজেদেরকে নিষ্পাপ বলে দাবী করে নি। পাক-কিতাব অনেক লোকের বিষয়ে শিক্ষা দেয়। সবাই গুনাহ্‌গার ছিল। অনেকে প্রকাশ্যে তাদের গুনাহ্‌ স্বীকার করেছিল। কিন্তু হযরত ঈসা কখনও তা করেন নি। এমনকি হযরত ঈসার কাছের সাহাবী হযরত পিতর বলেছিলেন যে, তিনি...

> *কোন গুনাহ্‌ করেন নি কিংবা যাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ পিতর ২:২২ আয়াত)*

হযরত ঈসাও পরীক্ষায় পড়েছিলেন। আমাদের মানুষের মত তাঁরও একই আবেগ-অনুভূতি ছিল। যখন আল্লাহ্‌ সব মানুষের বিচার করবেন তখন

কেউই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না, *“প্রভু, তুমি কিছু বুঝ না! তুমি তো একটি রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছ আর আমি জন্মেছি মাটির ঘরে। তুমি তো কখনও প্রলোভন ও পরীক্ষার মুখে পড় নি, কিন্তু আমি পড়েছি। যেহেতু তুমি আমার মত পরীক্ষায় পড় নি, তাই কিভাবে তুমি আমার বিচার করতে পার?”* কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস হযরত ঈসার বিষয়ে বলে যে, তিনি এমন নন--

> *...যিনি আমাদের দুর্বলতার জন্য আমাদের সংগে ব্যথা পান না, কারণ আমাদের মত করে তিনিও সব দিক থেকেই গুনাহের পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন অথচ গুনাহ্‌ করেন নি।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৪:১৫ আয়াত)*

২ ক্ষমতা ও খ্যাতি

> *ইয়াহিয়া জেলখানায় বন্দী হাওয়ার পরে ঈসা গালীল প্রদেশে গেলেন। সেখানে তিনি এই কথা বলে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করতে লাগলেন, “সময় হয়েছে, আল্লাহ্‌র রাজ্য কাছে এসে গেছে। আপনারা তওবা করুন এবং এই সুসংবাদের উপর ঈমান আনুন।”*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:১৪,১৫ আয়াত)*

যেহেতু বনি-ইসরাইলরা মানুষের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক কি, তা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই হযরত ঈসা একটি নতুন রাজ্যের প্রস্তাব দিতে এসেছিলেন। তিনি এমন কোন রাজনৈতিক রাজ্যের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন না, যে রাজ্যটি পাথরে খোদিত আইন-কানুনের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যে আইন-কানুন পালন করা অসম্ভব। বরং তিনি একটি রূহানী রাজ্যের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, যে রাজ্যটি সবার জন্য উন্মুক্ত, মানুষের অন্তরের মধ্যে লেখা এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত।

হযরত ঈসা লোকদেরকে *তওবা করার* জন্য বলছিলেন। তওবা বা মনের পরিবর্তন দিলের মধ্যে ঘটে। আর হযরত ঈসা সেখানটাতেই তাঁর রাজত্ব শুরু করতে চেয়েছিলেন।

> *একদিন ঈসা গালীল সাগরের পার দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে সাগরে জাল ফেলতে দেখলেন। সেই দু'জন ছিলেন জেলে। ঈসা তাঁদের বললেন, “আমার সংগে চল। আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।” তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে ঈসার সংগে গেলেন।*
>
> *সেখান থেকে কিছু দূরে গেলে পর তিনি সিবদিয়ের দুই ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের নৌকায় বসে জাল ঠিক*

করছিলেন। ঈসা তাঁদের দেখামাত্র ডাক দিলেন, আর তাঁরা তাঁদের বাবা সিবদিয়কে মজুরদের সংগে নৌকায় রেখে ঈসার সংগে গেলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:১৬-২০ আয়াত)

অধিকার

ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা কফরনাহূম শহরে গেলেন। পরে বিশ্রামবারে ঈসা মজলিস-খানায় গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল, কারণ তিনি আলেমদের মত শিক্ষা দিচ্ছিলেন না বরং যাঁর অধিকার আছে সেই রকম লোকের মতই শিক্ষা দিচ্ছিলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:২১,২২ আয়াত)

হযরত ঈসার শিক্ষা মানুষের মনোযোগ কেড়েছিল। তাঁর শ্রোতারা জানত তারা একজন অসাধারণ লোকের কথা শুনছিল। এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না যে, তারা স্বয়ং আল্লাহ্‌র কথাই শুনছিল। হযরত ঈসা যে শুধু অধিকার সহকারে কথা বলেছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি তাঁর অধিকারও দেখিয়েছিলেন।

সেই সময় ভূতে পাওয়া একজন লোক সেই মজলিস-খানার মধ্যে ছিল। সে চিৎকার করে বলল, "ওহে নাসরতের ঈসা, আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে; আপনিই তো আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:২৩,২৪ আয়াত)

শয়তানের সঙ্গী ফেরেশতাদের অন্যতম একজন দুষ্ট রূহ্‌ বা ভূত সেই মানুষটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। সেই ভূতটি জানত হযরত ঈসা কে ছিলেন। তাই সে তাঁকে "আল্লাহ্‌র সেই পবিত্র জন" বলে ডেকেছেন!

ঈসা তখন সেই ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হয়ে যাও।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:২৫ আয়াত)*

ভূতেরা সব সময় নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সত্যকে বিকৃত করে নেয়। এজন্য হযরত ঈসা চান নি ভূতেরা অন্যদের বলুক তিনি কে ছিলেন। সেই ভূতকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনিই সেই *ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*।

সেই ভূত তখন লোকটাকে মুচ্‌ড়ে ধরল এবং জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।

এই ঘটনা দেখে লোকেরা এমন আশ্চর্য হল যে, তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল, "এই সব কি ব্যাপার? এই অধিকার-ভরা নতুন শিক্ষাই বা কি? এমন কি, ভূতদেরও তিনি হুকুম দেন আর তারা তাঁর কথা শুনতে বাধ্য হয়।" এতে গালীল প্রদেশের সব জায়গায় ঈসার কথা খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ল। *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:২৬-২৮ আয়াত)*

এই সময় থেকে লোকেরা হযরত ঈসা সম্বন্ধে বলাবলি করতে লাগল। হযরত ঈসা তাঁর অবিশ্বাস্য শক্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁর সুনাম কেবল ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

> *পরে একজন চর্মরোগী ঈসার কাছে এসে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বলল, "আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।"*
>
> *লোকটির উপর ঈসার খুব মমতা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন, "আমি তা-ই চাই, তুমি পাক-সাফ হও।" আর তখনই তার চর্মরোগ ভাল হয়ে গেল।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১:৪০-৪২ আয়াত)*

সেই সময়ে চর্মরোগ ছিল ভয়ংকর রোগ। চিকিৎসা করা না হলে এর দরুন ভীষণ অঙ্গ-বিকৃতি এবং ধীরে ধীরে মৃত্যু পর্যন্ত হত। পাক-কিতাব বলে হযরত ঈসা সব ধরনের অসুস্থতা এবং পঙ্গুত্ব সুস্থ করেছিলেন। "এই রোগ ভাল করা যাবে না" বলে কাউকে তিনি ফেরত পাঠান নি। এমনকি হযরত ঈসা মৃত লোকদেরও জীবিত করেছিলেন!

আমাদের বুঝতে হবে হযরত ঈসা কোন যাদু দেখাচ্ছিলেন না বা লোকদেরকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করছিলেন না। লোকদের জন্য তাঁর মমতা হয়েছিল এবং তিনি তাদের সাহায্য করছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন লোকেরা যেন জানে যে, তিনি এবং যে কথা তিনি বলেন, সেই বাণী বেহেশত থেকে এসেছে। তাঁর হুকুম পালনের জন্য কোন বিশেষ ঘোড়া, রথ বা সৈন্যবাহিনী দরকার ছিল না। তিনি কেবল মুখেই বলতেন। স্মরণ করে দেখুন, তিনিই সেই কালাম... *সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*, যাঁর বিষয়ে সব নবীরা লিখেছিলেন।

দুষ্ট রূহ্ বা ভূতগণ

সমস্ত সৃষ্টির উপরেই হযরত ঈসার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। ভাল কিংবা খারাপ ফেরেশতারাও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয়...

> *কারণ আসমান ও জমীনে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আসমানে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ১:১৬,১৭ আয়াত)*

কোন লোক যদি ভূতদের ভয় পায়, তাহলে তার জানা দরকার যে, সেই ভয় থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যই হযরত ঈসা এসেছিলেন। কিভাবে হযরত ঈসা আমাদের জন্য এই কাজটি করেছেন সেই বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা এই বইটিতে দেখব।

৩ নীকদীম

ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে ইহুদীদের একজন নেতা ছিলেন। একদিন রাতে তিনি ঈসার কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আমরা জানি আপনি একজন শিক্ষক হিসাবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছেন, কারণ আপনি যে সব অলৌকিক কাজ করছেন, আল্লাহ্‌ সংগে না থাকলে কেউ তা করতে পারে না।"*

*ইহুদী ধর্ম-শিক্ষকদের সম্মান করে রব্বি বা হুজুর ডাকা হত।

ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১-৩ আয়াত)

নীকদীম ছিলেন ইহুদী সমাজের একজন মর্যাদাবান লোক। তিনি ইহুদী মহাসভার (সেনহেড্রিনের) একজন সদস্য ছিলেন। একজন ফরীশী হিসাবে তিনি হযরত মূসার শরীয়ত সূক্ষ্ম ভাবে পালন করতেন। একজন ইহুদী হিসাবে তিনি নিজেকে হযরত ইব্রাহিমের বংশধর, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির সদস্য মনে করতেন। তাঁর জন্ম ভাল বংশেই হয়েছিল। কিন্তু হযরত ঈসা তাঁর এই জন্মের মধ্যে ত্রুটি দেখতে পেলেন। তিনি নীকদীমকে বললেন, *"আপনাকে অবশ্যই আবার জন্ম গ্রহণ করতে হবে।"* এই কথা শুনে নীকদীম তো নির্ঘাত ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে একজন লোকের আবার জন্ম হতে পারে?

তখন নীকদীম তাঁকে (ঈসাকে) বললেন, "মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? দ্বিতীয় বার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে সে কি আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে?"

জবাবে ঈসা বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, পানি এবং পাক-রূহ্‌ থেকে জন্ম না হলে কেউই আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারে না। মানুষ থেকে যা জন্মে তা মানুষ, আর যা পাক-রূহ্‌ থেকে জন্মে তা রূহ্‌। আমি যে আপনাকে বললাম, আপনাদের নতুন করে জন্ম হওয়া দরকার, এতে আশ্চর্য হবেন না।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:৪-৭ আয়াত)*

এখানে হযরত ঈসা যখন *পানি এবং মানুষ থেকে জন্মের* বিষয় বলছিলেন তখন তিনি নীকদীমের প্রথম জন্ম অর্থাৎ আবার শিশু হয়ে জন্মগ্রহণের কথা বলছিলেন না। এখানে তিনি দ্বিতীয় জন্মের কথা বলছিলেন। দ্বিতীয় জন্ম মানে রূহানী জন্ম বা রূহানী জীবনের শুরু। হযরত ঈসার পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে, বেহেশতে যাওয়ার জন্য তাকে কেবল শারীরিক নয় কিন্তু দ্বিতীয় বারের মত রূহানী ভাবেও জন্ম নেওয়া দরকার। কিন্তু কিভাবে একজন লোক রূহানী ভাবে জন্ম গ্রহণ করতে পারে? হযরত ঈসা বললেন-

"মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইব্‌নে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে, যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে আখেরী জীবন পায়।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৪,১৫ আয়াত)*

হযরত ঈসা নীকদীমকে বলছিলেন যে, আবার জন্মগ্রহণ করার জন্য তাঁকে অবশ্যই মূসা নবীর সময়কার লোকদের মত হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই প্রথমে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি একজন গুনাহ্‌গার। তারপরে তাঁকে অবশ্যই তওবা করতে হবে। তিনি চিন্তা করেছিলেন ইহুদী হিসাবে তাঁর জন্ম এবং ফরীশী হিসাবে তাঁর মর্যাদা তাঁকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দরকার শুধুমাত্র হযরত ঈসার উপর ঈমান আনা। হযরত ঈসা বেহেশত থেকে এসেছিলেন সব মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথ দান করার জন্য। যদি নীকদীম হযরত ঈসার উপরেই ঈমান আনেন, তাহলে আল্লাহ্ বলেছেন তিনি তাঁকে অনন্ত জীবন দেবেন।

ঈমান এবং নির্ভরতা

'ঈমান আনা' শব্দের অর্থ মানুষের মনের সম্মতির চেয়েও বেশী কিছু। একজন ইসরাইল লোক বলতে পারত যে, হযরত মূসার সেই ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকালেই সে সুস্থ হবে, কিন্তু সেই খুঁটির দিকে *তাকিয়ে* সে যদি আল্লাহ্‌র উপর তার ঈমান না দেখাত, তাহলে সে মারা যেত। সত্যিকারের ঈমানের মধ্যে কাজও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

যে জিনিষ বা লোকের উপর ঈমান আনা হচ্ছে তাও গুরুত্বপূর্ণ। আসলে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়! কয়েক বছর আগে একজন বিকৃত-মনা লোক একটি ব্যথা নিরাময়কারী ক্যাপসুলের মধ্যে বিষ দিয়েছিল। এই ঔষধটির বিজ্ঞাপনে বিশ্বাস করে পরবর্তীতে কয়েকজন লোক তা খেয়ে মারা যায়। তারা আন্তরিকভাবে সেই ঔষধকে বিশ্বাস করেছিল। ঔষধ কোম্পানীটির সততার উপরে তাদের আস্থা ছিল, কিন্তু তারা আসলে ভুল জিনিষে বিশ্বাস করেছিল।

একজন লোক অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে পারে যে, একজন মিথ্যা দেবতা তাকে গুনাহ্ থেকে নাজাত দান করতে পারে। সে আন্তরিক হলেও তার আন্তরিকতার ভিত্তি ভুল বিশ্বাস। কিন্তু তার ঈমান যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার ঈমানের ফল হবে ভিন্ন, কারণ আল্লাহ্ যা বলেন, তা রক্ষা করেন।

> *"আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৬ আয়াত)*

অনন্ত জীবন

যে কেউই তাঁর উপরে ঈমান আনবে, তাদের জন্য হযরত ঈসা অনন্ত জীবনের ওয়াদা করেছেন। জিবরাইল ফেরেশতা বিবি মরিয়ম ও ইউসুফকে বলেছিলেন তাঁদের পুত্র সন্তানের নাম ঈসা রাখার জন্য, কারণ সেই নামের অর্থ ছিল *নাজাতদাতা*। আর তাই এখন হযরত ঈসা বলছেন যে, তিনি মানুষকে গুনাহের পরিণতি অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুনের হ্রদে অনন্ত শাস্তির হাত থেকে রক্ষা করবেন।

"আল্লাহ্‌ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৭ আয়াত)*

হযরত ঈসা এই দুনিয়াতে বিচার করার জন্য আসেন নি। তিনি এসেছিলেন মানুষকে গুনাহ্‌, শয়তান ও মৃত্যুর করুণ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য।

"যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৮ আয়াত)।*

কোন মাঝামাঝি অবস্থান নেই

হযরত ঈসা বলেছিলেন যে, যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, গুনাহ্‌গার হিসেবে তাদের বিচার করা হবে না। কিন্তু যারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তাদেরকে এরই মধ্যে দোষী বলে স্থির করা হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কোন মাঝামাঝি অবস্থান নেই। একজন লোক *"এই বিষয়ে আমি চিন্তা করব,"* বললে লাভ নেই, তাকে কিছু করতে হবে। ঈমান আনার বিষয়ে একজন লোককে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়ার মানে বিপরীত সিদ্ধান্ত নেওয়া, অর্থাৎ অঈমানদার থেকে যাওয়ার পথ বেছে নেওয়া।

তাই আপনাকে অনন্তকালীন নিয়তি সম্বন্ধে জানার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। হযরত ঈসা সুস্পষ্ট ভাবে তা বর্ণনা করেছেন। একজন লোক হযরত ঈসার উপরে তাঁর ঈমান না আনা পর্যন্ত সে দোষী বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং সে দোজখে যাওয়ার পথে আছে। কিন্তু হযরত ঈসার উপর ঈমান আনলে আল্লাহ্‌ তাঁর এই ওয়াদা অনুসারে সেই লোককে নাজাত এবং অনন্ত জীবন দান করবেন।

"আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৫:২৪ আয়াত)*

গুনাহের শাস্তিকে হযরত ঈসা উপেক্ষা করছিলেন না। তিনি জানতেন যে, সব লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না।

"তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে। যে কেউ অন্যায় কাজ করতে থাকে সে নূর ঘৃণা করে। তার অন্যায় কাজগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে সে নূরের কাছে আসে না।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৯,২০ আয়াত)*

হযরত ঈসা রূহানী নূর ও অন্ধকার সম্বন্ধে কথা বলছিলেন। তিনি বলেছিলেন অনেকেই নূরকে ঘৃণা করে, কারণ নূর তাদের গুনাহ্‌কে প্রকাশ করে দেয়।

তাদের গুনাহ্ প্রকাশ পাক তা লোকেরা চায় না। তারা যে গুনাহ্গার তা তারা অন্য লোকদেরকে জানতে দিতে চায় না। হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার মত করে তারা তাদের গুনাহ্ লুকাতে চায় বা তাদের গুনাহের জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে চায়। পাক-কিতাব বলে এ ধরনের লোক অন্ধকার পছন্দ করে। কিন্তু সেই নূর কি?

পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন, "আমিই দুনিয়ার নূর ... ।"
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮:১২ক আয়াত)

সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ নূর বা আলো সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আমরা বাস্তব দুনিয়ায় পথ দেখতে পাই। আর এখন আল্লাহ্ আমাদের রূহানী পথের আলো হওয়ার জন্য দুনিয়াতে এসেছেন।

"যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮ঃ১২খ আয়াত)*

4 প্রত্যাখ্যান

কয়েকদিন পরে ঈসা আবার কফরনাহূমে গেলেন। লোকেরা শুনল তিনি ঘরে আছেন। তখন এত লোক সেখানে জমায়েত হল যে, ঘর তো দূরের কথা, দরজার বাইরেও আর জায়গা রইল না। ঈসা লোকদের কাছে আল্লাহ্র কালাম তবলিগ করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন লোক একজন অবশ-রোগীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসল। চারজন লোক তাকে বয়ে আনছিল। *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:১-৩ আয়াত)*

হযরত ঈসা যেখানেই যেতেন, সেখানেই লোকদের ভীড় হত। যেই তিনি একটি গ্রামে ঢুকতেন তখন অসুস্থ ও খোঁড়া রোগীরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করত। এই সময় চারজন লোক তাদের অবশ বন্ধুকে বয়ে এনেছিল।

কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা তাকে ঈসার কাছে নিয়ে যেতে পারল না। এইজন্য ঈসা যেখানে ছিলেন ঠিক তার উপরের ছাদের কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেলল। তারপর সেই খোলা জায়গা দিয়ে মাদুর সুদ্ধই সেই অবশ-রোগীকে নীচে নামিয়ে দিল। *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:৪ আয়াত)*

সেই সময়কার বাড়ী-ঘরের ছাদ ছিল সমতল। সন্ধ্যার সময় লোকেরা স্বাচ্ছন্দ্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠত। যখন সেই চারজন লোক হযরত ঈসার কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হল, তখন তারা তাদের বন্ধুটিকে নিয়ে সিঁড়ি বেঁয়ে উপরের ছাদে উঠে গেল এবং সেই ছাদের টালি উঠিয়ে তাদের অবশ-রোগী বন্ধুটিকে হযরত ঈসার সামনা-সামনি নামিয়ে দিল। এতে নীচে থাকা লোকদের উপর ধুলা-ময়লা পড়ল। হযরত ঈসাকে তাঁর শিক্ষাদান কিছু সময়ের জন্য থামিয়ে রাখতে হয়েছিল। লোকেরা অবশ্যই সেই ফাঁকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা হয়ত জিজ্ঞেস করেছিল, "কি হচ্ছে?" যখন তারা ছাদের উপরের

লোকদের দেখতে পেল তখন তারা হয়ত চিৎকার করে বলেছিলঃ *"তোমাদের কি আক্কেল নেই? আমাদের উপরে তো ময়লা ও ধুলা পড়ছে।"* কিন্তু হযরত ঈসা সেই ঘটনাকে ভিন্ন ভাবে দেখেছিলেন।

> *তারা ঈমান এনেছে দেখে ঈসা সেই অবশ-রোগীকে বললেন, "বাছা, তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:৫ আয়াত)*

অন্তর

হযরত ঈসা প্রথমে অবশ-রোগীটির অন্তর সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। তিনি সেই লোকটির গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘরে অবস্থান করা কিছু লোক তাঁর কথাগুলো মানতে চায় নি। তাদের অন্তরে হযরত ঈসার বিরুদ্ধে সমালোচনার চিন্তা ছিল।

> *সেখানে কয়েকজন আলেম বসে ছিলেন। তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন, "লোকটা এই রকম কথা বলছে কেন? সে তো কুফরী করছে। একমাত্র ৩আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে?"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:৬,৭ আয়াত)*

হ্যাঁ, একটি বিষয়ে এই লোকেরা সঠিক কথাই বলেছিল- একমাত্র আল্লাহ্ই গুনাহ্ মাফ করতে পারেন!

> *তাঁরা যে ঐ সব কথা ভাবছেন তা ঈসা নিজের অন্তরে তখনই বুঝতে পারলেন। এইজন্য তিনি তাঁদের বললেন, "আপনারা কেন মনে মনে ঐ সব কথা ভাবছেন?।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:৮ আয়াত)*

হযরত ঈসা তাদের চিন্তা জানতেন এবং তাদেরকে তা বলেছিলেন। তাতে সেই আলেমরা লজ্জা পেয়েছিল এবং অবাক হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা তাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তাদেরকে এই প্রশ্নটি করলেন-

> *"এই অবশ-রোগীকে কোন্‌টা বলা সহজ– 'তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল,' না, 'ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও'?"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:৯ আয়াত)*

একজন উকিলের পক্ষেও এর চেয়ে বেশী কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা সম্ভব ছিল না। সেই আলেমরা চিন্তা করেছিল, "আমরা নিশ্চিত জানি সেই মানুষটি অবশ-রোগী। এরকম একজন অসুস্থ লোককে সুস্থ করাটা অসম্ভব। শুধুমাত্র আল্লাহ্ই এই ধরনের একজন লোককে সুস্থ করতে পারেন। কিন্তু হযরত ঈসা যদি তা করেন তাহলে তিনি অবশ্যই...।" না, এটা অচিন্তনীয়! আল্লাহ্ কি দুনিয়াতে এসে হযরত ঈসার মত জীবনযাপন করতে পারেন? তাদের মতে হযরত ঈসা সাধারণ গ্রাম থেকে আসা একজন সাধারণ লোক। হযরত ঈসা কি বলতে চাচ্ছেন তিনি আল্লাহ্? এমনকি আলেমরা এই প্রশ্নটি না করলেও তিনি এই বলে তাদের প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন...

"কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন দুনিয়াতে গুনাহ্ মাফ করবার ক্ষমতা ইব্‌নে-আদমের আছে"– এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই অবশ-রোগীকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।" তখনই সেই লোকটি উঠে তার মাদুর তুলে নিল এবং সকলের সামনেই বাইরে চলে গেল। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলল, "আমরা কখনও এই রকম দেখি নি।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:১০-১২ আয়াত)

লোকদের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করেন নি। কিন্তু হযরত ঈসা যে আসলে কে ছিলেন, তাঁর করা অলৌকিক কাজগুলো তা-ই প্রমাণ করেছিল।

অসহায় গুনাহ্‌গার

পরে ঈসা আবার গালীল সাগরের ধারে গেলেন। ...তিনি পথে যেতে যেতে দেখলেন আল্‌ফেয়ের ছেলে লেবি খাজনা আদায় করবার ঘরে বসে আছেন। ঈসা তাঁকে বললেন, "এস, আমার উম্মত হও।' তখন লেবি উঠে ঈসার সংগে গেলেন।" (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:১৩,১৪ আয়াত)

জাতিতে একজন ইহুদী হলেও লেবি রোমীয় সরকারের খাজনা-আদায়কারী ছিলেন। সেসময় অনেক খাজনা-আদায়কারী নির্ধারিত খাজনার বাইরে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। প্রায় সময়ই তারা নিজেদের লাভের জন্য লোকদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় করত। আর সেজন্যই লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করত, কারণ তারা ছিল লোভী ও দুর্নীতিবাজ এবং তারা রোমীয় সরকারের হয়ে কাজ করত। হযরত ঈসা লেবির বিষয়ে এসব কথা জানা সত্ত্বেও তিনি লেবিকে তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন।

পরে ঈসা লেবির বাড়ীতে খেতে বসলেন। তখন অনেক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকেরাও ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের সংগে খেতে বসল, কারণ অনেক লোক ঈসার সংগে সংগে যাচ্ছিল।

ফরীশী দলের আলেমেরা যখন দেখলেন ঈসা খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের সংগে খাচ্ছেন তখন তাঁরা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "উনি খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করেন কেন?"

এই কথা শুনে ঈসা সেই আলেমদের বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। আমি ধার্মিকদের ডাকতে আসি নি বরং গুনাহ্‌গারদেরই ডাকতে এসেছি।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ২:১৫-১৭ আয়াত)

হযরত ঈসা কেবল সেসব লোকদেরই সাহায্য করতে পারেন যারা বুঝতে পারে তাদের মধ্যে গুনাহ্ আছে। এটাই হল আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম ধাপ।

বিশ্রামবারে কাজ করা

হযরত ঈসা প্রায়ই ফরীশীদেরকে তিরস্কার করতেন। এতে তাদের সুনাম নষ্ট হয়েছিল। তাই তারা সব সময় চেষ্টা করত ঈসার আচরণ ও কথাবার্তায় খুঁত ধরতে।

এর পরে ঈসা আবার মজলিস-খানায় গেলেন। সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন ঈসাকে দোষ দেবার অজুহাত খুঁজছিলেন। বিশ্রামবারে ঈসা লোকটাকে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার জন্য তাঁরা তাঁর উপর ভাল করে নজর রাখতে লাগলেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:১,২ আয়াত)*

শরীয়ত অনুসারে বিশ্রামবারে কোন লোকের কাজ করার নিয়ম ছিল না। এই দিনে কাজ করা মানে আল্লাহ্‌র শরীয়ত অমান্য করা, আর তা গুনাহ্‌। ফরীশীদের মতে সেই দিন চিকিৎসকেরাও কাজ করতে পারবে না। আসলে শরীয়ত বলে নি বিশ্রামবারে সুস্থ করা যাবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিশেষ দশটি হুকুমকে রক্ষা করার জন্য ফরীশীরা নতুন নতুন নিয়ম তৈরী করেছিল। তাদের মতে পাক-কিতাব যেরকম ক্ষমতাশালী, এসব নতুন নিয়মও একই রকম ক্ষমতাশালী। তাই তারা লক্ষ্য করছিল হযরত ঈসা বিশ্রামবারে কাউকে সুস্থ করেন কিনা। কিন্তু বিশ্রামবার পালনের হুকুমটি দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হযরত ঈসা জানতেন। তিনি এও জানতেন ফরীশীরা তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য চেষ্টা করে চলছে। তিনি তাদের সাথে দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি তাদের মুখোমুখি হয়েছেন।

ঈসা সেই শুকনা-হাত লোকটিকে বললেন, "সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:৩ আয়াত)*

কল্পনা করুন হযরত ঈসা আস্তে আস্তে ফরীশীদের দিকে ঘুরে তাকালেন। তিনি জানতেন তারা তাঁকে দোষী করার জন্য ফন্দি আঁটছিল।

তারপর ঈসা ফরীশীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত, না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা করা উচিত, না নষ্ট করা উচিত ...?।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:৪ আয়াত)*

ফরীশীরা হযরত ঈসার উপর রেগে গেলেন এবং অসন্তুষ্ট হলেন, কারণ তিনি আর একবার তাদেরকে একটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। সমাজের সম্মানিত শিক্ষক হিসাবে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যেন ধুলায় মিশে গিয়েছিল।

ফরীশীরা কিন্তু কোনই জবাব দিলেন না।

তখন ঈসা বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং তাঁদের অন্তরের কঠিনতার জন্য গভীর দুঃখের সংগে সেই লোকটিকে বললেন,

> *"তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" লোকটি হাত বাড়িয়ে দিলে পর তার হাত একেবারে ভাল হয়ে গেল।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:৪,৫ আয়াত)*

ফরীশীরা যা চেয়েছিল তা-ই হয়েছে! তারা বিশ্রামবারে হযরত ঈসাকে সুস্থ করতে দেখতে পেলেন। তারা প্রমাণ পেয়েছেন তিনি তাদের দেওয়া শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন।

> *তখন ফরীশীরা বাইরে গেলেন এবং কিভাবে ঈসাকে হত্যা করা যায় সেই বিষয়ে বাদশাহ্ হেরোদের দলের লোকদের সংগে পরামর্শ করতে লাগলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:৬ আয়াত)*

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাদশাহ্ হেরোদের দলের লোকদের (হেরোদীয়দের) সাথে ফরীশীদের মতের মিল অচিন্তনীয় ছিল। হেরোদীয়রা ছিল একটা রাজনৈতিক দল। তারা বাদশাহ্ হেরোদের শাসন ও রোমীয়দের সমর্থন করত। অন্যদিকে ফরীশীরা রোমীয়দের ঘৃণা করত। রোমীয়দের চেয়েও তারা হযরত ঈসাকে আরও বেশী ঘৃণা করত। কিন্তু হযরত ঈসাকে খুন করতে চাইলে তো রোমীয়দের সাহায্য দরকার হবে। ধর্মীয় নেতারা হযরত ঈসাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারা বিশ্বাস করত তিনি ওয়াদা-করা মসীহ্ নন।

বারজন সাহাবী

> *এর পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের সংগে সাগরের ধারে গেলেন। গালীল প্রদেশের অনেক লোক তাঁর পিছনে পিছনে চলল। ঈসা যে সব কাজ করছিলেন সেগুলোর কথা শুনে... অনেক লোক তাঁর কাছে আসল।*
>
> *এর পরে ঈসা পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং নিজের ইচ্ছামত কিছু লোককে তাঁর কাছে ডেকে নিলেন। তাঁরা ঈসার কাছে আসলে পর তিনি বারোজনকে সাহাবী-পদে নিযুক্ত করলেন...।*
>
> *যে বারোজনকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন শিমোন, যাঁর নাম তিনি দিলেন পিতর; সিবদিয়ের দুই ছেলে ইয়াকুব ও ইউহোন্না (এঁদের নাম তিনি দিলেন বোয়ানের্গিস, অর্থাৎ বজ্রধ্বনির পুত্রেরা); আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের ছেলে ইয়াকুব, থদ্দেয়, মৌলবাদী শিমোন, আর এহুদা ইষ্কারিয়োৎ, যে ঈসাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৩:৭,৮,১৩-১৯ আয়াত)*

যে হাজার হাজার লোকেরা হযরত ঈসাকে অনুসরণ করেছিল তাদের মধ্য থেকে তিনি বিশেষ করে ১২জন সাহাবীকে বেছে নিয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই ১২জন লোকের মধ্যে রোমীয় সরকারের নিযুক্ত ইহুদী খাজনা-আদায়কারী যেমন ছিল, তেমনি ছিল রোমীয় সরকারকে উৎখাত করতে চাওয়া দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক ব্যক্তি। এছাড়াও কয়েকজন ছিল জেলে। যদিও তারা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি থেকে এসেছিলেন, তবুও (একজন ছাড়া) তাঁরা সবাই

বিভিন্ন ভাল-খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও হযরত ঈসাকে অনুসরণের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন।

৫ জীবন-রুটি

এর পরে ঈসা গালীল সাগরের অন্য পারে চলে গেলেন। এই সাগরকে টিবেরিয়াস সাগরও বলা হয়। অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কারণ রোগীদের উপর তিনি চিহ্ন হিসাবে যে সব অলৌকিক কাজ করছিলেন তারা তা দেখেছিল। ঈসা তাঁর

সাহাবীদের নিয়ে একটা পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। সেই সময় ইহুদীদের উদ্ধার-ঈদ কাছে এসেছিল।

ঈসা চেয়ে দেখলেন অনেক লোক তাঁর কাছে আসছে। তিনি ফিলিপকে বললেন, "এই লোকদের খাওয়াবার জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব?" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:১-৫ আয়াত)*

হযরত ঈসা আবার প্রশ্ন করলেন।

ফিলিপকে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি ঐ কথা বললেন, কারণ কি করবেন তা তিনি জানতেন।

ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "ওরা যদি প্রত্যেকে অল্প করেও পায় তবু দু'শো দীনারের রুটিতেও কুলাবে না।"

ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল আন্দ্রিয়। ইনি ছিলেন শিমোন-পিতরের ভাই। আন্দ্রিয় ঈসাকে বললেন, "এখানে একটা ছোট ছেলের কাছে পাঁচটা যবের রুটি আর দু'টা মাছ আছে, কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে কি হবে?।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৬-৯ আয়াত)

হয়ত সাহাবী আন্দ্রিয়ের আশা ছিল হযরত ঈসা এই ব্যাপারে কিছু একটা করতে পারবেন।

ঈসা বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও।" সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। লোকেরা তারই উপর বসে গেল। সেখানে পুরুষের সংখ্যাই ছিল কমবেশি পাঁচ হাজার। এর পরে ঈসা সেই রুটি কয়খানা নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং যারা বসে ছিল তাদের ভাগ করে দিলেন। সেইভাবে তিনি মাছও দিলেন। যে যত চাইল তত পেল।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:১০,১১ আয়াত)

কিতাবুল মোকাদ্দস খুবই সাধারণ ভাবে এই ঘটনাটি বর্ণনা করে। হযরত ঈসা একটি ছোট ছেলের দুপুরের খাবার দিয়ে হাজার হাজার লোককে পেট

ভরে খাইয়েছিলেন। তিনি তাঁর ১২জন সাহাবীর মধ্যে সেই রুটি ও মাছ ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং সেই সাহাবীরা তা দিয়ে মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন। সেই পাঁচটা রুটি আর দু'টা মাছ কী আশ্চর্যভাবে যে বেড়ে গিয়েছিল! এছাড়াও এত খাবার অবশিষ্ট ছিল যে, সাহাবীরা তা ১২টি ঝুড়িতে পূর্ণ করেছিলেন।

ঈসার এই অলৌকিক কাজ দেখে লোকেরা বলতে লাগল, "দুনিয়াতে যে নবীর আসবার কথা আছে ইনি সত্যিই সেই নবী।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:১৪ আয়াত)

লোকেরা হযরত ঈসার শক্তি ও যোগান-ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা তাঁকে জোর করে তাদের বাদশাহ্ বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু হযরত ঈসা একটি দুনিয়াবী রাজ্য শুরু করতে চান নি। তবে ভবিষ্যতে তিনি সেরকম রাজ্য স্থাপন করবেন। এখন তিনি লোকদের অন্তরে রাজত্ব করতে চান।

এতে ঈসা বুঝলেন, লোকেরা তাঁকে জোর করে তাদের বাদশাহ্ করবার জন্য ধরতে আসছে। সেইজন্য তিনি একাই আবার সেই পাহাড়ে চলে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে খুঁজে পেয়ে বলল, "হুজুর, আপনি কখন এখানে এসেছেন?"

ঈসা জবাব দিলেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আপনারা অলৌকিক কাজ দেখেছেন বলেই যে আমার খোঁজ করছেন তা নয়, বরং পেট ভরে রুটি খেতে পেয়েছেন বলেই খোঁজ করছেন"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:১৫,২৫,২৬ আয়াত)

লোকেরা কেন তা চাচ্ছিল, হযরত ঈসা তা বুঝেছিলেন। তারা বিনা পয়সায় খাবার পেতে চেয়েছিল। যদিও এসব অলৌকিক কাজ প্রকাশ করেছিল হযরত ঈসাই সেই *ওয়াদা-করা নাজাতদাতা*, তবুও অনেকে আগ্রহী ছিলেন না। হযরত ঈসা বলেছেন...

"কিন্তু যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় সেই খাবারের জন্য ব্যস্ত হয়ে লাভ কি? যে খাবার নষ্ট হয় না বরং অনন্ত জীবন দান করে তারই জন্য ব্যস্ত হন। সেই খাবারই ইব্‌নে-আদম আপনাদের দেবেন, কারণ পিতা আল্লাহ্ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাজ করবার অধিকার কেবল তাঁরই আছে" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:২৭ আয়াত)*

লোকেরা যে খাবার খেয়েছিল, সেই খাবার তাদেরকে চিরকালের জন্য জীবন দান করতে পারে নি। একদিন না একদিন তারা সবাই মারা যাবে। তাই হযরত ঈসা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, মানুষের উচিত অনন্ত জীবন দানকারী লক্ষ্যের পেছনে ছুটে চলা।

এতে লোকেরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আল্লাহ্‌র কাজ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?"

ঈসা তাদের বললেন, "আল্লাহ্‌ যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনাই হল আল্লাহ্‌র কাজ" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:২৮,২৯ আয়াত)

লোকেরা জানতে চেয়েছিল অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য তাদের কি করতে হবে। হযরত ঈসা লোকদেরকে শুধু তাঁর উপর নির্ভর করতে, অর্থাৎ তাদের নাজাতদাতা হিসাবে তাঁর উপর ঈমান আনতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটি ছিল খুবই সহজ একটি বিষয়।

তখন তারা তাঁকে (ঈসাকে) জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কি এমন অলৌকিক কাজ আপনি করবেন যা দেখে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতে পারি? আপনি কি কাজ করবেন।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৩০ আয়াত)

কী আশ্চর্য বিষয়! একটি ছোট ছেলের সামান্য খাবার দিয়ে হযরত ঈসা পাঁচ হাজার লোককে খাইয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপরও যাঁর বিষয়ে সব নবীরা লিখে গেছেন, হযরত ঈসাই যে সেই লোক তা প্রমাণের জন্য তারা আরও চিহ্ন চাইছিল। তারা হযরত ঈসার কাছে আরও খাবার চাইতে থাকল।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো মরুভূমিতে মান্না খেয়েছিলেন। পাক-কিতাবে লেখা আছে, "আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে তাদের রুটি খেতে দিলেন" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৩১ আয়াত)

যিনি এই নির্জন জায়গায় তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই তিনিই যে মরু-এলাকায় তাদের পূর্ব-পুরুষদের মান্না দিয়েছিলেন, সে কথা তারা বুঝতে চাইল না। তারা বিনামূল্যে খাবার পেতে চেয়েছিল বলে লক্ষ্য করে নি হযরত ঈসা আসলে তাদেরকে অনন্ত জীবন দিতে চেয়েছিলেন। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তারা রূহানী সত্যের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না।

ঈসা তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, বেহেশত থেকে যে রুটি আপনারা পেয়েছিলেন তা মূসা নবী আপনাদের দেন নি, কিন্তু আমার পিতা সত্যিকারের রুটি বেহেশত থেকে আপনাদের দিচ্ছেন। বেহেশত থেকে নেমে এসে যিনি মানুষকে জীবন দেন তিনিই আল্লাহ্‌র দেওয়া রুটি।"

লোকেরা তাঁকে বলল, "হুজুর, তাহলে সেই রুটিই সব সময় আমাদের দিন।"

*ঈসা তাদের বললেন, "**আমিই সেই জীবন-রুটি**। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৩২-৩৫ আয়াত)*

দ্বাদশ অধ্যায়

১ নোংরা কাপড়

২ সেই পথ

৩ সেই পরিকল্পনা

৪ লাসার

৫ দোজখ

৬ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান

১ নোংরা কাপড়

হযরত ঈসা খুবই চমৎকার ভাবে গল্প বলতে পারতেন। রূহানী মূলনীতির উপর জোর দেওয়ার জন্য তিনি প্রায়ই বিভিন্ন রূপক গল্প ব্যবহার করতেন। এসব গল্পের মধ্য দিয়ে হযরত ঈসা সেসব লোকদের উপর দৃষ্টি দিতেন, যারা চিন্তা করত আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল নিখুঁত। আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার পরিবর্তে বরং তারা নিজেদের ভাল ব্যবহারের উপর নির্ভর করেছিল।

> *যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে অন্যদের তুচ্ছ করত তাদের শিক্ষা দেবার জন্য ঈসা এই কথা বললেনঃ "দু'জন লোক মুনাজাত করবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরীশী ও অন্যজন খাজনা-আদায়কারী।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৮:৯,১০ আয়াত)*

সেই সময়কার ইহুদী সংস্কৃতিতে ফরীশীদেরকে নির্ভুল ভাবে হযরত মূসার শরীয়ত পালনকারী হিসাবে দেখা হত। তুলনাগত দিক দিয়ে খাজনা-আদায়কারীদেরকে চোর বা ডাকাত হিসাবে গণ্য করা হত। এই গল্পে দেখা যায়, একজন ফরীশী ও একজন খাজনা-আদায়কারী উভয়েই একই জায়গায় মুনাজাত করছে।

ফরীশী

> *"সেই ফরীশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে এই মুনাজাত করলেন, 'হে আল্লাহ্‌, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে, আমি অন্য লোকদের মত ঠগ, অসৎ ও জেনাকারী নই, এমন কি, ঐ খাজনা-আদায়কারীর মতও নই। আমি সপ্তায় দু'বার রোজা* রাখি এবং আমার সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ তোমাকে দিই'।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৮:১১,১২ আয়াত)*

*তার রোজা রাখাটা ছিল সম্ভবতঃ মুনাজাতে সময় দেওয়ার জন্য। এছাড়াও কোন ভাল কাজে নিজের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ সে দিত।

মুনাজাতের সময় ফরীশীটি তার নিজের প্রশংসা করেছিল। সে যেভাবে মুনাজাত করেছিল তাতে তার অন্তরের ভাব প্রকাশ পেয়েছিল। নিজেকে আল্লাহ্‌র সামনে ধার্মিক দেখানোর জন্য সেই ফরীশীটি নিজের ভাল কাজগুলোর উপর ভরসা করছিল। সে বুঝতে পারে নি যে, আল্লাহ্‌র মানদণ্ড হল নিখুঁততা।

খাজনা-আদায়কারী

> *"সেই সময় সেই খাজনা-আদায়কারী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। আসমানের দিকে তাকাবারও তার সাহস হল না; সে বুক চাপ্‌ড়ে বলল, 'হে আল্লাহ্‌! আমি গুনাহ্‌গার; আমার প্রতি মমতা কর'।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৮:১৩ আয়াত)*

সেই খাজনা-আদায়কারীটি তার নিজ গুনাহের ভারে নীচু হয়ে পড়েছিল। সে

জানত আল্লাহ্‌র সাহায্য তার ভীষণ দরকার। সে যে আল্লাহ্‌র শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, সেকথা বুঝতে পেরে সে আল্লাহ্‌র কাছে রহমত চেয়েছিল। হযরত ঈসা বলে গেলেন-

"আমি তোমাদের বলছি, সেই খাজনা-আদায়কারীকে আল্লাহ্ ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন আর সে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন না। যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৮:১৪ আয়াত)*

*ধার্মিক বলে গ্রহণ মানে নির্দোষ বলে ঘোষিত হওয়া।

তওবা

হযরত ঈসা তওবা ও নম্রতাকে একসঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। পাক-কিতাব স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয় যে, শয়তানের অহংকার তাকে গুনাহের দিকে পরিচালিত করেছিল। অহংকারী লোকেরা স্বীকার করতে চায় না তারা অসহায় গুনাহ্‌গার এবং তাদের দরকার আল্লাহ্‌র রহমত। সেই ফরীশী লোকটি তার সৎ কাজের বিষয়ে এতটাই অহংকারী ছিলেন যে, তাঁর নিজের মাফ পাওয়ার অভাবটি সে দেখতে পায় নি। তার চিন্তা ছিল যদি সে বিশ্বস্ত ভাবে সব শরীয়ত পালন ও সৎ কাজ করে তাহলে আল্লাহ্ খুশী হবেন। হযরত ঈসা বলেছেন-

"...আপনারা ভণ্ড! আপনাদের বিষয়ে নবী ইশাইয়া ঠিক কথাই বলেছিলেন। তাঁর কিতাবে লেখা আছে: এই লোকেরা মুখেই আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের দিল আমার কাছ থেকে দূরে থাকে। তারা মিথ্যাই আমার এবাদত করে, তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র। আপনারা তো আল্লাহ্‌র দেওয়া হুকুমগুলো বাদ দিয়ে মানুষের দেওয়া চলতি নিয়ম পালন করছেন"

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৭:৬-৮ আয়াত)

ফরীশীরা নিজেদেরকে ধার্মিক হিসাবে দেখাত। কিন্তু তাদের অন্তর ছিল গুনাহে ভরা। তাদের নিজেদের তৈরী নিয়ম যোগ করে তারা আল্লাহ্‌র দশটি হুকুমের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে নি। হযরত ঈসা বলেছেন-

"এইভাবে আপনারা আপনাদের চলতি নিয়ম শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম বাতিল করেছেন। এছাড়া আপনারা আরও এই রকম অনেক কাজ করে থাকেন।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৭:১৩ আয়াত)*

ফরীশীরা বিশ্বাস করত তাদের *ধর্মীয়* অনুশীলন, তাদের *ভাল ভাল কাজ* এবং ইহুদী হিসাবে তাদের *জন্মের* ব্যাপারে আল্লাহ্ খুবই অভিভূত।

হযরত ঈসা বলেছেন এই সবের দ্বারা তারা আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হবে না, কারণ...

"...এই সব খারাপী মানুষের ভিতর থেকেই বের হয়ে আসে এবং মানুষকে নাপাক করে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ৭:২৩ আয়াত)*

কিতাবুল মোকাদ্দস পরিষ্কারভাবে এই শিক্ষা দেয় যে, কোন রকম সৎ কাজই আল্লাহ্‌র সাথে সঠিক সম্পর্ক অর্জন করতে পারে না। আসলে কিতাবুল মোকাদ্দস বলে-

...আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপড়ের মত...।

(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৬৪:৬খ আয়াত)

কিছু কিছু লোক নিজেদেরকে নিখুঁততার আদর্শ হিসাবে দেখায়। কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস এর ঠিক উল্টো ধারণা শিক্ষা দেয়। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে সব লোক...

গুনাহের গোলাম হয়ে মরবে...। *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬:১৬খ আয়াত)*

গুনাহ্‌ শিকল দিয়ে মানুষের চারপাশটাকে জড়িয়ে রেখেছে। হযরত ঈসা বলেছেন-

"...আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, যারা গুনাহে্‌ পড়ে থাকে তারা সবাই গুনাহের গোলাম।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮:৩৪ আয়াত)*

আমরা বিভিন্ন সঠিক কাজ করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হই। যখন আমরা একটি বিষয় সঠিক ভাবে করি, তখন আমরা আরেকটি জায়গায় ভুল করি। যদিও আমরা সঠিক ভাবে চলার চেষ্টা করি তবুও আমাদের গুনাহ্‌-স্বভাব আমাদের সব প্রচেষ্টার বিপরীতে কাজ করে।

আল্লাহ্‌র কালামও আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, শয়তান মানুষকে একজন গোলাম বানিয়েছে। তার খারাপ উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করার জন্য সে মানুষকে প্রলোভন ও অহংকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। তারপরে সে মানুষকে প্রাণপণ বোঝাতে চেষ্টা করে যে, সে আসলেই ভাল। পাক-কিতাব বলে...

...তার ফলে তারা ইবলিসের ফাঁদ থেকে পালিয়ে আসবে, কারণ ইবলিস তার ইচ্ছা পালন করবার জন্য তাদের ধরেছিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, ২ তীমথিয় ২:২৫,২৬ আয়াত)

মানুষ গুনাহ্‌ ও শয়তানের গোলাম, কিন্তু একথা খারাপ জীবনযাপন করার অজুহাত নয়। মানুষ তার জীবনের সমস্ত পছন্দ ও সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী। সমস্যা হল একটি নিখুঁত জীবন অর্জন করা অসম্ভব।

নবী হযরত আয়ুইব এই পুরাতন প্রশ্নটি করেছিলেন-

আল্লাহ্‌র চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে?।

(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৯:২ আয়াত)

কেমন করে আমরা আমাদের গুনাহ্‌ থেকে মুক্ত হতে পারি? আল্লাহ্‌ যাতে আমাদের গ্রহণ করেন সেজন্য আল্লাহ্‌র নির্দোষিতার সমান নির্দোষিতা কিভাবে আমরা পেতে পারি?

আমি একজন ঈসায়ী হয়ে জন্মেছিলাম...

'ঈসায়ী' শব্দের অর্থ হল *মসীহের পরিবারের সদস্য*। এ বিষয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসের অর্থ বিকৃত করা ও ভুল বুঝানো হয়েছে। কিছু কিছু লোক বলে তারা *ঈসায়ী হয়ে জন্মগ্রহণ* করেছে; একথা সঠিক নয়। একটি *ঈসায়ী পরিবারে* জন্মগ্রহণ করলেই কোন লোক ঈসায়ী হয়ে যায় না। অর্থাৎ শারীরিক জন্ম আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে না বা আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের ভবিষ্যত অবস্থানকে নিশ্চিত করে না।

যদিও কিছু কিছু দেশকে "ঈসায়ী" জাতির দেশ বলে ডাকা হয়, কিন্তু তাও সঠিক নয়। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই হযরত ঈসা মসীহের উম্মত হতে পারে। কিছু কিছু নামধারী "ঈসায়ী দেশ" মসীহের নামে মানবতার বিরুদ্ধে ভয়ানক অপরাধ করেছে। আবার কিছু কিছু *"ঈসায়ী দেশ"* নৈতিক ভাবে কলুষিত।

২ সেই পথ

রূহানী সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য হযরত ঈসা প্রায়ই প্রতিদিনকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেছেন। এখন এই গল্পে তিনি একটি সাধারণ ভেড়ার খোঁয়াড়ের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। সেই ভেড়ার খোঁয়াড়ের চারপাশটায় ছিল পাথরের দেয়াল। পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে কাঁটাযুক্ত লতাগাছ লাগানো হয়েছিল যাতে বন্য প্রাণী ও চোর দেয়াল বেঁয়ে উপরে উঠতে না পারে। সেই ভেড়ার খোঁয়াড়ে একটা মাত্র দরজা ছিল।

দিনের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পালকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য মাঠে নিয়ে যেত। রাতে ভেড়ারা তাদের নিরাপদ খোঁয়াড়ে ফিরে আসত। আর রাখাল সেই খোঁয়াড়ের মুখে ঘুমাত। সেই রাখালের ঘুম ভাংগানো ছাড়া কেউই খোঁয়াড়ের ভিতরে ঢুকতে পারত না আর ভেড়াগুলোও বাইরে যেতে পারত না। আসলে সেই রাখাল ছিল ভেড়ার খোঁয়াড়ের জন্য একটি দরজার মত।

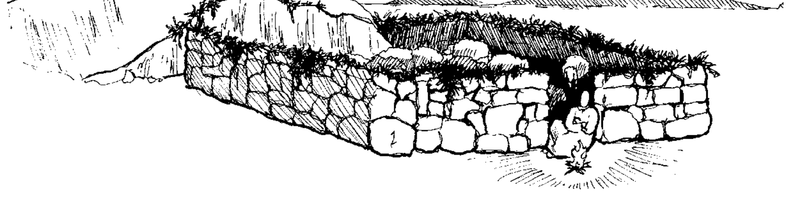

সেইজন্য ঈসা আবার বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, মেষগুলোর জন্য আমিই দরজা।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:৭ আয়াত)*

যারা তাঁর উপর ঈমান আনে, তাদেরকে হযরত ঈসা তাঁর মেষ বা ভেড়া হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা খোঁয়াড়ের ভিতরেই নিরাপদে থাকে।

"আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে...।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:৯ আয়াত)*

হযরত ঈসা বলেছিলেন যে, একমাত্র তিনিই দরজা। অন্য আর কোন দরজা নেই। কোন লোক যদি গুনাহের ভয়ানক পরিণতির হাত থেকে নাজাত পেতে চায়, তাহলে তাকে তাঁর মধ্য দিয়েই তা পেতে হবে। শুধুমাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই একজন লোক অনন্ত জীবন পেতে পারে।

"চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:১০ আয়াত)*

চোরেরা ভেড়ার ভালোর বিষয়ে চিন্তা করে না। পাক-কিতাবে এসব 'চোরদেরকে' ভণ্ড শিক্ষক বলা হয়েছে। প্রায়ই তারা ক্ষমতা বা অর্থলাভের জন্য আল্লাহ্‌র কালাম ব্যবহার করে। অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য এই চোরেরা নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে। তাদের ধারণা সমূহ শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু সেসব ধারণার ফলাফল হল রূহানী মৃত্যু।

একটা পথ আছে যেটা মানুষের চোখে ঠিক মনে হয়, কিন্তু সেই পথের শেষে থাকে মৃত্যু। *(নবীদের কিতাব, মেসাল ১৪:১২ আয়াত)*

যেসব লোক হযরত ঈসার উপর ঈমান আনে, তাদেরকে পরিপূর্ণ জীবন দান করতেই তিনি এসেছিলেন। তিনি বলেছেন...

"...আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৪:৬ আয়াত)*

ভাল করে বুঝুন। হযরত ঈসা বলেছেন-

তিনিই আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার *একমাত্র* পথ।

একমাত্র তাঁর কালামই ***সত্য***।

একমাত্র তাঁর সাথে সম্পর্ক দ্বারা অনন্ত ***জীবন*** পাওয়া যায়।

হযরত ঈসা জোর দিয়ে বলেছেন যে, আর অন্য কোন পথ দিয়ে একজন লোক আল্লাহ্‌র কাছে আসতে পারে না। ভেড়ার খোঁয়াড়ের জন্য সেই রাখাল যেমন একমাত্র দরজা, সেভাবে হযরত ঈসাই আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ।

৩ সেই পরিকল্পনা

হযরত ঈসার জীবনী অধ্যয়ন করার সময় আপনি দেখতে পাবেন তিনি ধাপে ধাপে এই দুনিয়াতে তাঁর আগমনের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন।

> *সেই সময় থেকে ঈসা তাঁর সাহাবীদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে জেরুজালেমে যেতে হবে এবং বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান ইমামদের ও আলেমদের হাতে অনেক দুঃখভোগ করতে হবে। পরে তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৬:২১ আয়াত)*

হযরত ঈসা এমন কিছু কাজ করেছিলেন যা অন্য কোন মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব ছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন কিভাবে, কখন, কোথায় এবং কেন তিনি মারা যাবেন। হযরত ঈসার এসব কথা পিতর নামে তাঁর একজন সাহাবীর ভাল লাগে নি।

> *তখন পিতর তাঁকে (ঈসাকে) একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "হুজুর এ দূর হোক। আপনার উপর কখনও এমন হবে না।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৬:২২ আয়াত)*

সাহাবী পিতর বর্তমান কালের অনেক লোকের মত। বর্তমান কালের লোকেরাও চিন্তা করে যে, যদি হযরত ঈসা আসলে ইব্‌নুল্লাহ্‌ হন তাহলে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে না। কিন্তু হযরত ঈসা কঠোর ভাষায় পিতরকে জবাব দিয়েছিলেন।

> *"...আমার কাছ থেকে দূর হও, শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা আল্লাহ্‌র তা তুমি ভাবছ না কিন্তু যা মানুষের তা-ই ভাবছ।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৬:২৩ আয়াত)*

হযরত ঈসা পিতরকে বলেছিলেন শয়তান তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করছিল বলে সে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে পারছে না। আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল এই...

> *...পরে তাঁকে (ঈসাকে) হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৬:২১ আয়াত)*

কিন্তু হযরত ঈসা কেন এই কথাগুলো বলছিলেন? আরো পড়ে গেলে আমরা আল্লাহ্‌র সেই উদ্দেশ্য আরও ভাল করে বুঝতে পারব।

হযরত ঈসার চেহারা পরিবর্তন

এক সপ্তাহ পরে হযরত ঈসা তাঁর তিনজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে একটা পাহাড়ের উপরে গেলেন যাতে তিনি তাঁদেরকে দেখাতে পারেন তিনি আসলে কে।

> *এর ছয় দিন পরে ঈসা কেবল পিতর, ইয়াকুব এবং ইয়াকুবের ভাই ইউহোন্নাকে সংগে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন। তাঁদের সামনে ঈসার চেহারা বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৭:১,২ আয়াত)

হযরত ঈসার বাইরের চেহারা বদলে গিয়েছিল- তাঁর মুখমণ্ডল সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাপড়ে সাদা আলোক ছটা ছড়িয়েছিল। প্রাচীন কালে আল্লাহ্‌ যখন আবাস-তাম্বুর মহা-পবিত্র স্থানের ভিতরে নামতেন তখন তাঁর উপস্থিতিতে এই একই আলোক ছটা বের হত। হযরত ঈসার মধ্যে সব সময় এই মহিমা ছিল, কিন্তু লোকেরা তা দেখতে পেত না।

> *আর দু'জন লোককে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন ছিলেন নবী মূসা এবং নবী ইলিয়াস। তাঁরা মহিমার সঙ্গে দেখা দিলেন। জেরুজালেমে যে মৃত্যুর সামনে ঈসা উপস্থিত হতে যাচ্ছিলেন তাঁরা সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন।* (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ৯:৩০,৩১ আয়াত)

সাহাবী পিতর সব কিছু দেখে খুব অবাক হয়ে গেলেন এবং বোকার মত একটি পরিকল্পনার কথা বললেন।

> *তখন পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, ভালই হয়েছে যে, আমরা এখানে আছি। আপনি যদি চান তবে আমি এখানে তিনটা কুঁড়ে-ঘর তৈরী করব– একটা আপনার, একটা মূসার ও একটা ইলিয়াসের জন্য।" পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একটা উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট। তোমরা এঁর কথা শোন'।"*
> (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৭:৪,৫ আয়াত)

পিতা আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে কথা বলেছিলেন।

> *এই কথা শুনে সাহাবীরা খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়লেন। তখন ঈসা এসে তাঁদের ছুঁয়ে বললেন, "ওঠো, ভয় কোরো না।" তখন তাঁরা উপরের দিকে তাকিয়ে কেবল ঈসা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। যখন তাঁরা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসছিলেন তখন ঈসা তাঁদের এই হুকুম দিলেন, "তোমরা যা দেখলে, ইব্‌নে-আদম*

মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকে বোলো না।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১৭:৬-৯ আয়াত)

কী ভয়ানক ঘটনা! যদিও সেই সময় সাহাবীরা এই ঘটনাটির তাৎপর্য বুঝে নি, কিন্তু সাহাবী পিতর এ ঘটনা সম্পর্কে পরবর্তীতে লিখেছিলেন-

আমাদের হযরত ঈসা মসীহের শক্তি ও তাঁর আসবার বিষয় তোমাদের কাছে জানাতে গিয়ে আমরা কোন বানানো গল্প বলি নি; আমরা তাঁর মহিমা নিজেদের চোখেই দেখেছি। 'ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপরে আমি খুব সন্তুষ্ট,' বেহেশত থেকে বলা এই কথার মধ্য দিয়ে মসীহ্‌ পিতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব লাভ করেছিলেন। আমরা যখন তাঁর সংগে সেই পবিত্র পাহাড়ে ছিলাম তখন বেহেশত থেকে বলা এই কথাগুলো শুনেছিলাম। (ইঞ্জিল শরীফ, ২ পিতর ১:১৬-১৮ আয়াত)

4 লাসার

লাসার নামে বেথানিয়া গ্রামের একজন লোকের অসুখ হয়েছিল। মরিয়ম ও তাঁর বোন মার্থা সেই গ্রামে থাকতেন। ...যে লাসারের অসুখ হয়েছিল তিনি ছিলেন এই মরিয়মের ভাই। এইজন্য তাঁর বোনেরা ঈসাকে এই কথা বলে পাঠালেন, "হুজুর, আপনি যাকে মহব্বত করেন তার অসুখ হয়েছে।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:১-৩ আয়াত)

লাসার, মরিয়ম ও মার্থা ছিলেন হযরত ঈসার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরা জেরুজালেমের খুব কাছাকাছি বাস করত। যখন লাসার অসুস্থ হয়ে পড়ল তখন হযরত ঈসা জর্ডান নদীর অন্য পারে ছিলেন। বেথানিয়া গ্রাম থেকে সেটা ছিল একদিনের পথ।

মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে ঈসা মহব্বত করতেন। যখন ঈসা লাসারের অসুখের কথা শুনলেন তখন তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আরও দু'দিন রয়ে গেলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৫,৬ আয়াত)

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে না যাওয়ার কোন অর্থই ছিল না। প্রত্যেকেই জানে যখন কেউ একজন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন দেরী করাটা মারাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে। কিন্তু হযরত ঈসা সেখানে আরও দু'দিন থেকে গেলেন! তিনি কি চিন্তা করছিলেন?

তিনি সাহাবীদের বললেন, "চল, আমরা আবার এহুদিয়াতে যাই।"

সাহাবীরা তাঁকে বললেন, "হুজুর, এই কিছুদিন আগে নেতারা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিলেন, আর আপনি আবার সেখানে যাচ্ছেন?" ...

ঈসা তখন স্পষ্ট করেই বললেন, "লাসার মারা গেছে, কিন্তু আমি তোমাদের কথা ভেবে খুশী হয়েছি যে, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস করতে পার। চল, আমরা লাসারের কাছে যাই।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৭,৮,১৪,১৫ আয়াত)

চারদিনের মরা

ঈসা সেখানে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, চার দিন আগেই লাসারকে দাফন করা হয়েছে। জেরুজালেম থেকে বেথানিয়া প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে ছিল। ইহুদীদের মধ্যে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মকে তাঁদের ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনা দিতে এসেছিল। ঈসা আসছেন শুনে মার্থা তাঁর সংগে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরে বসে রইলেন।

মার্থা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনি যদি এখানে থাকতেন তবে আমার ভাই মারা যেত না। কিন্তু আমি জানি, আপনি এখনও আল্লাহ্‌র কাছে যা চাইবেন আল্লাহ্‌ তা আপনাকে দেবেন।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:১৭-২২ আয়াত)

পাক-কিতাব মার্থার গভীর আশার কথা বলে না, কিন্তু হযরত ঈসার উপর তার ঈমান ছিল।

ঈসা তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত হয়ে উঠবে।"

তখন মার্থা তাঁকে বললেন, "আমি জানি, শেষ দিনে মৃত লোকেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন সেও উঠবে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:২৩,২৪ আয়াত)

ঈসা মসীহের কথা শুনে মার্থা অবাক হন নি। মার্থা জানতেন পাক-কিতাব অনুসারে দুনিয়ার শেষ সময়ে যখন আল্লাহ্‌ সব মানুষের বিচার করবেন, তখন সকলে আবার জীবিত হয়ে উঠবে। সেই সময় পর্যন্ত একজন লোক মাত্র একবারই মরবে।

ঈসা মার্থাকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমার উপর ঈমান আনে সে মরলেও জীবিত হবে। আর যে জীবিত আছে এবং আমার উপর ঈমান আনে সে কখনও মরবে না। তুমি কি এই কথা বিশ্বাস কর?।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:২৫,২৬ আয়াত)*

এই কথাগুলো ছিল খুবই শক্তিশালী। হযরত ঈসা মার্থাকে বলেছিলেন লাসারকে সেই বিচারের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। তাঁকে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করা হবে এবং সে বাঁচবে। হযরত ঈসাই জীবন দান করেন। তাই যেকোন সময়ে লাসারকে মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত করে তোলার ক্ষমতা

তাঁর ছিল। মার্থা কি হযরত ঈসার সেই কথায় ঈমান এনেছেন?

মার্থা তাঁকে বললেন, "জ্বী হুজুর, আমি ঈমান এনেছি যে, দুনিয়াতে যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই সেই মসীহ্ ইব্‌নুল্লাহ্।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:২৭ আয়াত)

মার্থা কেবল হযরত ঈসার কথায় ঈমানই আনেন নি, তিনি নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে, তিনিই সেই মসীহ্, অর্থাৎ সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা।

তিনি তাদের বললেন, "লাসারকে কোথায় রেখেছ?" তারা বলল, "হুজুর, এসে দেখুন।" তখন ঈসা কাঁদলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৩৪,৩৫ আয়াত)

কেন হযরত ঈসা কেঁদেছিলেন? হয়ত তাঁর চারপাশের লোকদের শোক দেখে তাঁর দুঃখ হয়েছিল। নতুবা তাঁর সৃষ্ট নিখুঁত দুনিয়াতে গুনাহের ভীষণ পরিণতি নিজের চোখে দেখতে পেয়ে তাঁর মন কেঁদেছিল। যদিও আমরা কেবল কারণটা অনুমান করতে পারি, কিন্তু আমরা দেখতে পাই হযরত ঈসার মানুষের মত গভীর অনুভূতি ছিল।

তাতে ইহুদীরা বলল, "দেখ, উনি লাসারকে কত মহব্বত করতেন।"

কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "অন্ধের চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন তিনি কি এমন কিছু করতে পারতেন না যাতে লোকটি মারা না যেত?"

এতে ঈসা দিলে আবার অস্থির হলেন এবং কবরের কাছে গেলেন। কবরটা ছিল একটা গুহা। সেই গুহার মুখে একটা পাথর বসানো ছিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৩৬-৩৮ আয়াত)

ইহুদী ধর্মীয় রীতি অনুসারে মৃত ব্যক্তির দেহকে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে একটি গুহার মত কবরের মধ্যে রাখা হত। সেই গুহাটিকে এমন ভাবে কাটা হত যাতে তার মধ্যে মৃত দেহ রাখা যায়। বংশের পর বংশ ধরে একটি পরিবারের সদস্যদেরকে সেই একই কবরে কবর দেওয়া হত। সেই কবর যথেষ্ট বড় ছিল। আপনি সেখানে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন। সেই গুহার ন্যায় কবরের মধ্যে ছিল ❶ কান্নাকাটি ও বিলাপের কামরা। কবরের মধ্যে ❷ খোদাই করে

শেলফ কাটা হত যার উপরে ❸ মৃত দেহগুলো শোয়ানো হত। ❹ কয়েক টন ওজনের চাকা-আকৃতির একটি পাথর দিয়ে কবরের মুখটি শক্ত করে বন্ধ করে রাখা হত। ❺ একটি খাদের মধ্যে বসানো থাকায় দরজার ন্যায় এই পাথরটি সামনে-পেছনে টানা যেত। যখন বন্ধ করা হত তখন দরজাটি ঢোকার মুখের সামনে একটি ছোট ফাঁকের মধ্যে বসত। এতে সেই পাথরটি এমনি এমনি গড়িয়ে পড়ত না এবং সরে যেত না।

ঈসা বললেন, "পাথরখানা সরাও।" যিনি মারা গেছেন তাঁর বোন মার্থা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, এখন দুর্গন্ধ হয়েছে, কারণ চার দিন হল সে মারা গেছে।"

ঈসা মার্থাকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলি নি, যদি তুমি বিশ্বাস কর তবে আল্লাহ্‌র মহিমা দেখতে পাবে?"

তখন লোকেরা পাথরখানা সরিয়ে দিল। ঈসা উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি। অবশ্য আমি জানি সব সময়ই তুমি আমার কথা শুনে থাক। কিন্তু যে সব লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ, সেইজন্যই এই কথা বললাম।"

এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে ডাক দিয়ে বললেন, "লাসার, বের হয়ে এস।" যিনি মারা গিয়েছিলেন তিনি তখন কবর থেকে বের হয়ে আসলেন। তাঁর হাত-পা কবরের কাপড়ে জড়ানো ছিল এবং তাঁর মুখ রুমালে বাঁধা ছিল। ঈসা লোকদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে দাও আর ওকে যেতে দাও।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৩৯-৪৪ আয়াত)*

হযরত ঈসা কেবল লাসারের নাম ধরে ডেকে ভালই করেছিলেন। কেননা যদি তিনি কেবল বলতেন, "বেরিয়ে আস...", তাহলে হয়ত সেই কবরের সব মৃত লোকেরাই জীবিত হয়ে উঠত। লাসার জীবিত হয়ে উঠেছেন! কবর থেকে হেঁটে বের হয়ে আসার সময় লাসারের বন্ধুরা তার গায়ে জড়ানো কাফনের লম্বা লম্বা কাপড়ের ফালিগুলোকে খুলে দিয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটা হযরত ঈসার করা খুবই বড় একটি অলৌকিক কাজ।

মরিয়মের কাছে যে সব ইহুদীরা এসেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ঈসার এই কাজ দেখে তাঁর উপর ঈমান আনল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফরীশীদের কাছে গিয়ে ঈসা যা করেছিলেন তা বলল। তখন প্রধান ইমামেরা ও ফরীশীরা মহাসভার লোকদের একত্র করে বললেন,[১] "আমরা এখন কি করি? এই লোকটা তো অনেক অলৌকিক চিহ্ন কাজ করছে। আমরা যদি তাকে এইভাবে চলতে দিই তবে সবাই

তার উপর ঈমান আনবে, আর রোমীয়রা এসে আমাদের এবাদত-খানা এবং আমাদের জাতিকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

সেই দিন থেকে ইহুদী নেতারা ঈসাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১১:৪৫-৪৮,৫৩ আয়াত)*

কিছু লোক হযরত ঈসার উপর ঈমান এনেছিল। কিন্তু অন্যেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল। লাসারের মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠাটাও মহা-ইমামদের ও ফরীশীদেরকে হযরত ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত করতে পারে নি, কারণ হযরত ঈসার দরুন তাঁরা ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন- তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা ও গর্ব হারাতে বসেছিলেন।

ইনি কি রকম লোক?

হযরত ঈসা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করেছিলেন তিনি কে। একবার সাহাবীরা গালীল সাগরে একটি ভীষণ ঝড়ের মধ্যে পড়লেন। হযরত ঈসা নৌকার মধ্যে গভীর ভাবে ঘুমাচ্ছিলেন। মারা পড়বেন ভয়ে সাহাবীরা হযরত ঈসাকে জাগিয়ে তুললেন এবং নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে জানালেন। হযরত ঈসা...

উঠে বাতাস ও সাগরকে ধমক দিলেন। তখন সব কিছু খুব শান্ত হয়ে গেল। এতে সাহাবীরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ইনি কি রকম লোক যে, বাতাস এবং সাগরও তাঁর কথা শোনে!"
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৮:২৬খ,২৭ আয়াত)

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌র কথামত যেভাবে নদ-নদী ও সাগর সৃষ্টি হয়েছিল সেভাবে হযরত ঈসার কথামত সাগর শান্ত হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্ বললেন আর প্রাণ সৃষ্টি হয়েছিল, একইভাবে হযরত ঈসা তাঁর হুকুম দ্বারা প্রাণ দান করতে পারতেন। ইঞ্জিল শরীফে তিনি বলেছেন...

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।" *(ইউহোন্না ১১:২৫ আয়াত)*

৫ দোজখ

তিন বছর ধরে হযরত ঈসা লোকদের শিক্ষা দিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু ঘটেছিল। তিনি শিক্ষা দিতে গিয়ে বিভিন্ন গল্প ও বাস্তব লোকদের কথা বলতেন। তিনি লোকদের সান্ত্বনা দিতেন এবং ভর্ৎসনাও করতেন। একবার তিনি নীচের এই গল্পটি বলেছিলেন-

"একজন ধনী লোক ছিল। সে বেগুনে কাপড় ও অন্যান্য দামী দামী কাপড়-চোপড় পরত। প্রত্যেক দিন খুব জাঁকজমকের সংগে সে আমোদ-প্রমোদ করত। সেই ধনী লোকের দরজার কাছে লাসার নামে একজন ভিখারীকে প্রায়ই এনে রাখা হত। লাসারের সারা গায়ে ঘা ছিল। সেই ধনী লোকের টেবিল থেকে যে খাবার পড়ত তা-ই খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত, আর কুকুরেরা তার ঘা চেটে দিত"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:১৯-২১ আয়াত)

ভিখারীটি মারা গেল

"একদিন সেই ভিখারীটি মারা গেল। তখন ফেরেশতারা এসে তাকে নবী ইব্রাহিমের কাছে নিয়ে গেলেন...।" *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২২ আয়াত)*

এই গল্পে ব্যবহৃত 'ইব্রাহিমের কাছে' শব্দের অর্থ বেহেশত সমকক্ষীয় কোন একটি স্থান। এই গল্পের ভিখারী লাসার আর হযরত ঈসা যে লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন সেই লাসার এক নয়। এই লাসার গরীব ছিল বলে যে সে স্থানে গিয়েছিল তা নয়; বরং হযরত ঈসার উপর ঈমান আনার দরুন সে বেহেশতে গিয়েছিল।

ধনী লোকটি মারা গেল

তারপর একদিন সেই ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হল। কবরে [দোজখে] খুব যন্ত্রণার মধ্যে থেকে সে উপরের দিকে তাকাল এবং দূর থেকে ইব্রাহিম ও তাঁর পাশে লাসারকে দেখতে পেল। তখন সে চিৎকার করে বলল, "পিতা ইব্রাহিম, আমাকে দয়া করুন। লাসারকে পাঠিয়ে দিন যেন সে তার আংগুলের আগাটা পানিতে ডুবিয়ে আমার জিভ্ ঠাণ্ডা করে। এই আগুনের মধ্যে আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।" *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২২-২৪ আয়াত)*

সেই ধনী লোকটি দোজখের ন্যায় যন্ত্রণার স্থানে গিয়েছিল, কারণ সে জীবনকালে আল্লাহ্‌র কালামকে উপেক্ষা করেছিল এবং স্বার্থপর ভাবে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিল। কিন্তু দোজখে সে হযরত ইব্রাহিমের সাহায্য চেয়েছিল।

কিন্তু ইব্রাহিম বললেন, "মনে করে দেখ, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন কত সুখ ভোগ করেছ আর লাসার কত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন একটা বিরাট ফাঁক রয়েছে যাতে ইচ্ছা করলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের কাছে যেতে না পারে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২৫,২৬ আয়াত)

শেষ সুযোগ

আল্লাহ্‌র কালাম পরিষ্কার ভাবে শিক্ষা দেয় একজন লোক কেবল তার জীবনকালেই গুনাহ্ থেকে মন ফেরাতে পারে। মৃত্যুর পরে তার আর তওবা করার কোন সুযোগ থাকে না। দোজখ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই জীবনে যে লোকের সঙ্গে আল্লাহ্‌র সঠিক সম্পর্ক থাকে না, সে লোক মারা যাওয়ার পরে চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে কেউই দুঃখ-কষ্টের জায়গা থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবে না। যদিও সেই ধনী লোকটি যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য চিৎকার করেছিল, কিন্তু তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। শুধুমাত্র এই জীবনকালেই রহমত পাওয়া সম্ভব। সেই ধনী লোকটি আরও বলেছিল...

> *"... তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে আমার পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন, যেন সে আমার পাঁচটি ভাইকে সাবধান করতে পারে; তা না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২৭,২৮ আয়াত)*

যদিও সেই ধনী লোকটি ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে ছিল, তারপরও এই দুনিয়াতে তার জীবনযাপনের কথা সে স্মরণ করে দেখেছিল। তার মনে পড়ল তার পাঁচটি ভাইয়েরও আল্লাহ্‌র সাথে কোন সম্পর্ক নেই। তাই সে চেয়েছিল কেউ একজন গিয়ে যাতে তাদেরকে সাবধান করে দিয়ে আসে।

> *কিন্তু ইব্রাহিম বললেন, "মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে। ওরা তাঁদের কথায় মনোযোগ দিক।"*
>
> *সেই ধনী লোকটি বলল, "না, না, পিতা ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।"*
>
> *তখন ইব্রাহিম বললেন, "মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:২৯-৩১ আয়াত)*

স্মরণ করে দেখুন, যখন হযরত ঈসা মরিয়ম ও মার্থার ভাই লাসারকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তাঁর মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন তখনও অনেক লোক তাদের নাজাতদাতা ও বাদশাহ্ হিসাবে ঈসাকে গ্রহণ করে নি। এর পরিবর্তে তারা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। একই ভাবে নবীরা অনেক বছর ধরে নাজাতের বাণী ঘোষণা করেছেন। পাক-কিতাব বলে যদি লোকেরা এই বাণীর উপর ঈমান আনতে না চায় তাহলে...

> *"মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৬:৩১ আয়াত)*

৬ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান

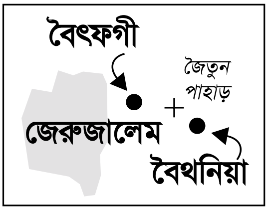

তাঁরা জেরুজালেমের কাছাকাছি পৌঁছে জৈতুন পাহাড়ের গায়ে বৈৎফগী ও বেথানিয়া গ্রামের কাছে আসলেন। সেখানে পৌঁছে ঈসা তাঁর দু'জন সাহাবীকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। গ্রামে ঢুকবার সময় দেখতে পাবে একটা গাধার বাচ্চা সেখানে বাঁধা আছে। তার উপরে কেউ কখনও চড়ে নি।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১১:১,২ আয়াত)*

তাঁরা সেই গাধার বাচ্চাটা ঈসার কাছে এনে তার উপর তাঁদের গায়ের চাদর পেতে দিলেন। ঈসা তার উপরে বসলেন। অনেক লোক তাদের গায়ের চাদর রাস্তার উপরে বিছিয়ে দিল, আর অন্যেরা মাঠের গাছপালা থেকে পাতা সুদ্ধ ডাল কেটে এনে পথে ছড়িয়ে দিল। যারা ঈসার সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "মারহাবা! মাবুদের নামে যিনি আসছেন তাঁর প্রশংসা হোক। আমাদের পিতা দাউদের যে রাজ্য আসছে তার প্রশংসা হোক। বেহেশতেও মারহাবা!।"
(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১১:৭-১০ আয়াত)

জনতা নিজে থেকেই হযরত ঈসাকে বিজয়ী বীরের সম্বর্ধনা দিয়েছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে বিজয়ী একজন রোমীয় সেনাপতিকে সম্বর্ধনা জানাতে এই ধরনের বিজয় যাত্রা আয়োজন করা হত। হযরত ঈসার উচ্চ প্রশংসা করতে করতে লোকদের আশা ছিল তিনি তাদেরকে রোমীয় সরকারের অত্যাচারী শাসনের হাত থেকে মুক্ত করবেন।

কিন্তু সেই লোকেরা বুঝতে পারে নি যে, এই কাজ করতে গিয়ে তারা ৫০০ বছর আগে করা একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করছিল। জাকারিয়া নবী লিখেছিলেন যে, হযরত ঈসা এই ধরনের সম্বর্ধনা পাবেন।

"হে সিয়োন-কন্যা, খুব আনন্দ কর। হে জেরুজালেম, তুমি জয়ধ্বনি কর। দেখ, তোমার বাদশাহ্ তোমার কাছে আসছেন; তিনি ন্যায়বান ও তাঁর কাছে উদ্ধার আছে; তিনি নম্র, তিনি গাধার উপরে, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।" *(নবীদের কিতাব, জাকারিয়া ৯:৯ আয়াত)*

শুধুমাত্র এই বারই হযরত ঈসা লোকদেরকে এধরনের স্মরণীয় সম্বর্ধনা আয়োজনের অনুমতি দিয়েছিলেন। এর পেছনে তাঁর একটি কারণ ছিল। আসলে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর শত্রুরা যাতে তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনা অতি দ্রুত পূর্ণ করে।

উদ্ধার-ঈদ ও খামিহীন রুটির ঈদের তখন মাত্র আর দু'দিন বাকী। প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা গোপনে ঈসাকে ধরে হত্যা করবার উপায় খুঁজছিলেন। তাঁরা বললেন, "ঈদের সময়ে নয়; লোকদের মধ্যে গোলমাল হতে পারে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:১,২ আয়াত)*

আনন্দে উত্তেজিত জনতা আশা করেছিল যে, হযরত ঈসা ঘোষণা করবেন তিনিই বনি-ইসরাইলদের সত্যিকারের বাদশাহ্। যেসব ধর্মীয় নেতারা হযরত ঈসাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছিল তারা একটি কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। কেননা যদি তারা তাঁকে হত্যা করে তাহলে লোকেরা ক্ষোভে ফেটে পড়বে। হযরত ঈসা আসলেই একজন জনপ্রিয় লোক ছিলেন।

সেই সময় উদ্ধার-ঈদের সময় ছিল বলে শহরটা লোকে ভরে গিয়েছিল। অনেক লোকের আশা ছিল হযরত ঈসা রোমীয়দেরকে উৎখাত করবেন। কিন্তু সময় শেষ হলেও হযরত ঈসা নিজেকে ইহুদীদের দুনিয়াবী বাদশাহ্ বলে ঘোষণা দেন নি।

উদ্ধার-ঈদের ভোজ

হযরত ঈসা তাঁর দু'জন সাহাবীকে বললেন উদ্ধার-ঈদের ভোজ উপলক্ষ্যে একটা কামরা প্রস্তুত করতে।

সন্ধ্যা হলে পর ঈসা সেই বারোজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন। তাঁরা যখন বসে খাচ্ছিলেন তখন ঈসা বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে ধরিয়ে দেবে, আর সে আমার সংগে খাচ্ছে।"

সাহাবীরা দুঃখিত হলেন এবং একজনের পরে আর একজন বলতে লাগলেন, "সে কি আমি, হুজুর?"

ঈসা তাঁদের বললেন, "সে এই বারোজনের মধ্যে একজন, যে আমার সংগে পাত্রের মধ্যে রুটি ডুবাচ্ছে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:১৭-২০ আয়াত)*

তিন বছর আগে হযরত ঈসা যখন তাঁর ১২জন সাহাবীকে বেছে নিয়েছিলেন তখনই তিনি জানতেন তাদের মধ্যে একজন হবেন বেঈমান।

সেই সময়েরও ১০০০ বছর আগে নবী ও বাদশাহ্ হযরত দাউদ হযরত ঈসার সাথে বেঈমানীর বিষয়ে লিখেছেন...

"এমন কি, যে আমার প্রাণের বন্ধু, যার উপর আমার এত বিশ্বাস, যে আমার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করে, সে-ও আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে।"
(জবুর শরীফ ৪১:৯ আয়াত)

বেঈমানী করা হল

সেই বেঈমানের নাম ছিল এহুদা ইষ্কারিয়োত। সাহাবীদের মধ্যে তার দায়িত্ব ছিল টাকা-পয়সা জমা রাখা, কিন্তু এ ব্যাপারে সে অবিশ্বস্ত ছিল। বোঝা যায়

সে সাহাবীদের থলে থেকে টাকা চুরি করত। অন্য সাহাবীরা এই বিষয়টা জানতেন না, কিন্তু হযরত ঈসা তা জানতেন। শয়তানও তা জানত। শয়তান সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতাকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করার সুযোগ খুঁজছিল। এখন শয়তান তার সেই সুযোগ দেখতে পেল। এহুদাও ইচ্ছুক ছিল। তাই উদ্ধার-ঈদের রুটি যখন পরিবেশন করা হচ্ছিল তখন শয়তান তার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

রুটির টুকরাটা নেবার পরেই শয়তান এহুদার মধ্যে ঢুকল।

ঈসা তাকে বললেন, "যা করবে তাড়াতাড়ি কর।" যাঁরা ঈসার সংগে খাচ্ছিলেন তাঁরা কেউই বুঝলেন না কেন তিনি এহুদাকে এই কথা বললেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৩:২৭,২৮ আয়াত)

কেমন করে ঈসাকে প্রধান ইমামদের ও বায়তুল-মোকাদ্দসের কর্মচারীদের হাতে ধরিয়ে দেবে এই বিষয়ে সে গিয়ে তাঁদের সংগে পরামর্শ করল। এতে তাঁরা খুব খুশী হয়ে এহুদাকে টাকা দিতে স্বীকার করলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২২:৪,৫ আয়াত)

তখন সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে এহুদা ইষ্কারিয়োৎ নামে সাহাবীটি প্রধান ইমামদের কাছে গিয়ে বলল, "ঈসাকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিলে আপনারা আমাকে কি দেবেন? প্রধান ইমামেরা ত্রিশটা রূপার টাকা গুনে তাকে দিলেন।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৬:১৪,১৫ আয়াত)*

পাঁচশত বছর আগে একজন নবী বলেছিলেন যে, মসীহ্‌কে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হবে।

"...ত্রিশটা রূপার টুকরা।" *(নবীদের কিতাব, জাকারিয়া ১১:১২ আয়াত; এছাড়াও দেখুন, ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭:৩-১০ আয়াত)*

টুকরা রুটি এবং পেয়ালা

ভোজের মাঝামাঝি সময়ে এহুদার সাথে হযরত ঈসার কথাবার্তা হয়েছিল। সেই বেঈমান যখন তার খারাপ কাজটি করার জন্য বেরিয়ে পড়ল তখনও ভোজ শেষ হয় নি। পরবর্তীতে যা হয়েছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় ঈসা রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা টুকরা করে সাহাবীদের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও, এটা আমার শরীর।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:২২ আয়াত)*

উপরের আয়াতটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সাহাবীরা হযরত ঈসার শরীর খাচ্ছিলেন না। কিন্তু হযরত ঈসা বলছিলেন যে, উদ্ধার-ঈদের ভোজের রুটি দ্বারা তাঁর শরীরকেই বোঝায়। সাহাবীরা নিশ্চয়ই ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন। হযরত ঈসা যে একবার বলেছিলেন তিনিই জীবন-রুটি, সেই কথার সাথে কি এর কোন সম্পর্ক আছে?

তারপর তিনি পেয়ালা নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং সাহাবীদের দিলেন। তাঁরা সবাই সেই পেয়ালা থেকে খেলেন।

তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত যা অনেকের জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র নতুন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:২৩,২৪ আয়াত)*

আবারও সেই চিহ্ন ছিল একই। উদ্ধার-ঈদের ভোজের রস দ্বারা হযরত ঈসার রক্তকেই বুঝিয়েছিল। সেই রক্ত অনেক লোকের জন্য দেওয়া হবে। আমরা এই রক্তের তাৎপর্য সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বুঝতে পারব।

এর পরে তাঁরা একটা কাওয়ালী গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:২৬ আয়াত)*

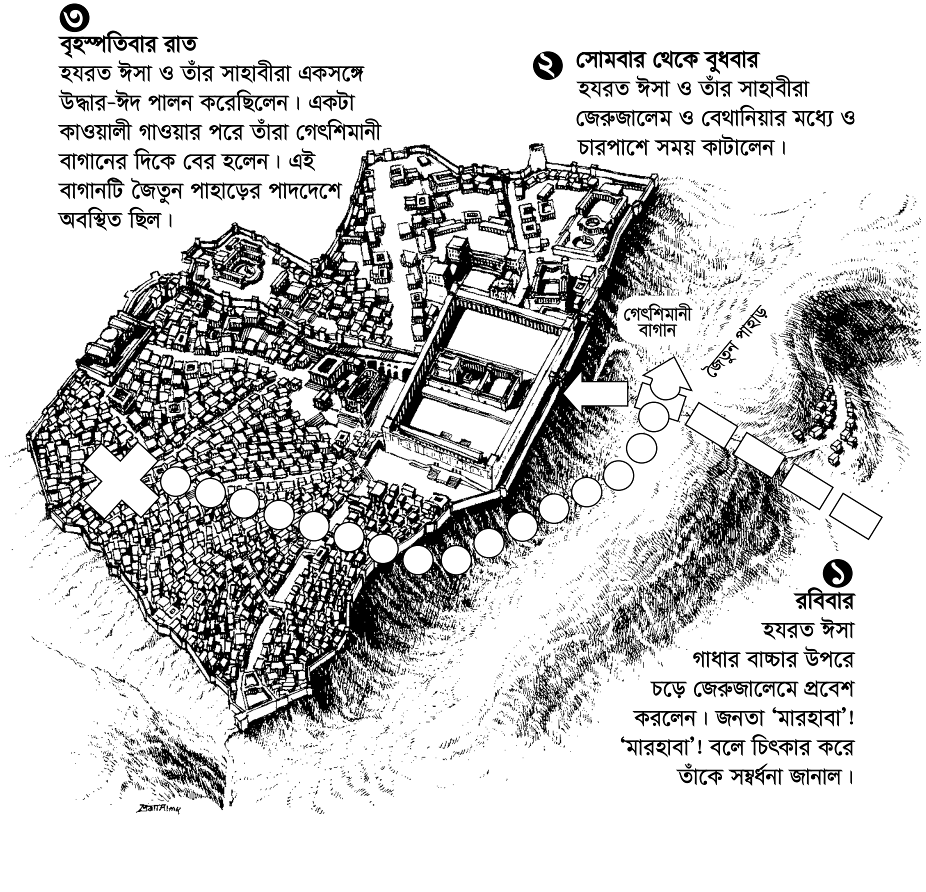

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১ বাগান

২ মাথার খুলির স্থান

৩ শূন্য কবর

১ বাগান

এর পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা গেৎশিমানী নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেখানে ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "আমি যতক্ষণ মুনাজাত করি ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক।" এই বলে তিনি পিতর, ইয়াকুব ও ইউহোন্নাকে নিজের সংগে নিলেন এবং মনে খুব ব্যথা ও কষ্ট পেতে লাগলেন। তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে যেন আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এখানে জেগে থাক।"

তারপরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে মুনাজাত করলেন যেন সম্ভব হলে এই দুঃখের সময়টা তাঁর কাছ থেকে দূর হয়। তিনি বললেন, "আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।"

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৩২-৩৬ আয়াত)

হযরত ঈসা তাঁর প্রিয় পিতার সাথে কথা বললেন, *আব্বা, পিতা দয়া করে অন্য একটি উপায় বের করুন*। কিন্তু তারপরে তাঁর পিতার পরিকল্পনার কাছে সমর্পিত হয়ে বললেন, *"আমি চাই যাতে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হয়।"*

ঈসা তখনও কথা বলছেন, এমন সময় এহুদা সেখানে আসল। সে সেই বারোজন সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল। তার সংগে অনেক লোক ছোরা ও লাঠি নিয়ে আসল। প্রধান ইমামেরা, আলেমেরা ও বৃদ্ধ নেতারা এই লোকদের পাঠিয়েছিলেন।

ঈসাকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সে ঐ লোকদের সংগে একটা চিহ্ন ঠিক করেছিল। সে বলেছিল, "যাকে আমি চুমু দেব, সে-ই সেই লোক। তোমরা তাকেই ধোরো এবং পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।"

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৪৩,৪৪ আয়াত)

তাঁর নিজের উপর যা ঘটবে ঈসা তা সবই জানতেন। এইজন্য তিনি বের হয়ে এসে সেই লোকদের বললেন, "আপনারা কাকে খুঁজছেন?"

তারা বলল, "নাসরতের ঈসাকে।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৪,৫ক আয়াত)*

তিনি কথা বললেন

*ঈসা তাদের বললেন, **"আমিই সেই।"***

ঈসাকে যে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই এহুদাও তাদের সংগে দাঁড়িয়েছিল *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৫ আয়াত)*

'সেই' শব্দটি মূল গ্রীক ভাষায় দেখা যায় না। কিন্তু হযরত ঈসা স্পষ্ট করে জোরালো শব্দ *"আমিই আছি!"* ব্যবহার করে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন।

আমরা জানি *"আমি আছি"* আল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত নাম, যার অর্থ *যিনি নিজ শক্তিতে বেঁচে আছেন*। আল্লাহ্‌ নিজেই একথা বলেছেন। এই কথাগুলোর প্রভাব ভাল ভাবে লক্ষ্য করুনঃ

> *ঈসা যখন তাদের বললেন, "আমিই সেই," তখন তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৬ আয়াত)*

সেই লোকেরা কেবল মাটিতে পড়ে যায় নি। তারা পিছিয়ে গিয়ে একেবারে পড়ে গেল। হযরত ঈসা তাঁর গৌরবের ছোট্ট একটি অংশ প্রকাশ করেছিলেন এবং তা সেই মানুষদেরকে দমিয়ে দিয়েছিল। হতভম্ব হয়ে গিয়ে সেই লোকেরা আস্তে আস্তে মাটি থেকে উঠেছিল।

> *"আপনারা কাকে খুঁজছেন?" তারা বলল, "নাসরতের ঈসাকে"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৭ আয়াত)*

আমরা তাদের ভয় ও মহা সম্মানের কথা বুঝতে পারি। হযরত ঈসা তাদের সাহসহীন করেছিলেন। তাঁকে গ্রেফতার করা স্বাভাবিক ছিল না। হযরত ঈসা আরও বেশী করে তাদের আঘাত করলেন যখন তিনি প্রকাশ করেছিলেন এই বেঈমানীর পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি আগে থেকে জানতেন।

> *তখন ঈসা তাকে বললেন, "এহুদা, চুমু দিয়ে কি ইব্‌নে-আদমকে ধরিয়ে দিচ্ছ?।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২২:৪৮ আয়াত)*

> *তাই এহুদা সোজা ঈসার কাছে গিয়ে বলল, "হুজুর!" এই কথা বলেই সে তাঁকে চুমু দিল।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৪৫ আয়াত*

এটা দেখে অন্য ১১জন সাহাবী সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। সাহাবী পিতর তাঁর ছোরা বের করলেন...

> *যাঁরা ঈসার সংগে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোরা বের করলেন এবং তার আঘাতে মহা-ইমামের গোলামের একটা কান কেটে ফেললেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৬:৫১ আয়াত)*

> *ঈসা বললেন, "থাক্‌, আর নয়।" এই বলে তিনি লোকটির কান ছুঁয়ে তাকে ভাল করলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২২:৫১ আয়াত)*

কী আশ্চর্য মহব্বত! এই ভীষণ পরিস্থিতির মধ্যেও হযরত ঈসা অন্যদের বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি মহা-ইমামের সেই গোলামকে সুস্থ করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের থামিয়েছিলেন। সংখ্যায় সাহাবীরা ছিলেন কম। কিন্তু আমরা সাহাবী পিতরের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না। তিনি যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলেন, তবে সে সাহসের মধ্যে দক্ষতা ও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার জ্ঞান ছিল না। ছোরা নয় বরং মাছ ধরার জাল ব্যবহারে তিনি আরও দক্ষ ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম।

প্রশ্ন, প্রশ্ন আর প্রশ্ন

এরপরে হযরত ঈসা ইমামদের একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন করলেন।

> *পরে ঈসা লোকদের বললেন, "আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন? আমি প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে বসে শিক্ষা দিতাম, আর তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি।* ***কিন্তু এই সব ঘটল যাতে পাক-কিতাবে নবীরা যা লিখেছেন তা পূর্ণ হয়।।"*** *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৬:৫৫,৫৬ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র প্রশ্নগুলো সব সময় মানুষের আসল চিন্তা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। যদি মহা-ইমামের লোকেরা চিন্তা করার জন্য সময় নিত, তাহলে তারা বুঝতে পারত তাদের কাজগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু তারা হযরত ঈসাকে নির্মূল করার ব্যাপারে মনস্থির করে রেখেছিল। যদিও হযরত ঈসা তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তা তাদেরকে আদৌ বিরত রাখে নি। হযরত ঈসা দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই লোকেরা আগের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পরিপূর্ণ করছিল। একথাও তাদেরকে বিরত করে নি। কেননা তারা তাদের রক্তপিপাসু পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করবেই।

নিজেদের জীবন বাঁচাবার জন্য সাহাবীরা অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

> *সেই সময় সাহাবীরা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৫০ আয়াত)*

> *তখন সেই সৈন্যেরা আর তাদের সেনাপতি ও ইহুদী নেতাদের কর্মচারীরা ঈসাকে ধরে বাঁধল। (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:১২ আয়াত)*

মাত্র একজন লোককে ধরতে এতগুলো লোক পাঠানো! ঈসাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রায় ৩০০ থেকে ৬০০জন সৈন্য পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও ইহুদী নেতারা, ইমামেরা এবং কর্মচারীরাও এসেছিল। সম্ভবতঃ ইহুদী নেতারা শক্তির অভাব অনুভব করেছিল।

বিচারসভায়

> *সেই লোকেরা ঈসাকে নিয়ে মহা-ইমামের কাছে গেল। সেখানে প্রধান ইমামেরা, বৃদ্ধ নেতারা ও আলেমেরা একসংগে জমায়েত হলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৫৩ আয়াত)*

বায়তুল-মোকাদ্দসের এবাদতখানায় রাতে কখনও বিচার-কাজ করা হত না। ইহুদী মহাসভায় ৭১জন সদস্য ছিলেন। মাঝরাতে এত দ্রুত সকলে মিলিত হওয়াটা দেখায় অন্যায় পন্থায় হলেও তাঁরা হযরত ঈসার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। অবৈধ বিচার সভা করে তাঁরা হযরত ঈসাকে হত্যা করার জন্য স্বেচ্ছাচারী ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা সব

আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছিলেন। তাঁরা হযরত ঈসাকে মেরেই ফেলবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

> *প্রধান ইমামেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা ঈসাকে হত্যা করবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষির খোঁজ করছিলেন, কিন্তু কোন সাক্ষিই তাঁরা পেলেন না। ঈসার বিরুদ্ধে অনেকেই মিথ্যা সাক্ষি দিয়েছিল কিন্তু তাদের সাক্ষি মিলল না।*
>
> *তখন কয়েকজন উঠে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষি দিল, "আমরা ওকে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরী এই এবাদত-খানা আমি ভেংগে ফেলব এবং তিন দিনের মধ্যে এমন একটা এবাদত-খানা তৈরী করব যা মানুষের তৈরী নয়।'" কিন্তু তবুও তাদের সাক্ষি মিলল না।*
>
> *তখন মহা-ইমাম সকলের সামনে দাঁড়িয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন জবাবই দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এই লোকেরা এই সব কি সাক্ষি দিচ্ছে?" ঈসা কিন্তু জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলেন।*
>
> *মহা-ইমাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি গৌরবময় আল্লাহ্‌র পুত্র মসীহ্?'"* *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৫৫-৬১ আয়াত)*

সেই প্রশ্নটি ছিল পরিষ্কারঃ "তুমিই কি বেহেশত থেকে আসা সেই ***ওয়াদা-করা মসীহ্?***" এবার-

> *ঈসা বললেন, "আমিই সেই। আপনারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ডান দিকে ইব্‌নে-আদমকে বসে থাকতে দেখবেন এবং আসমানের মেঘের সংগে আসতে দেখবেন।"*
>
> *এতে মহা-ইমাম তাঁর কাপড় ছিঁড়ে বললেন, "আর সাক্ষীর আমাদের কি দরকার? আপনারা তো শুনলেনই যে, ও কুফরী করল। আপনারা কি মনে করেন?"*
>
> *তাঁরা সবাই ঈসাকে মৃত্যুর শাস্তি পাবার উপযুক্ত বলে স্থির করলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৪:৬২-৬৪ আয়াত)*

মহা-ইমাম কাইয়াফা হযরত ঈসার দেওয়া উত্তরটি বুঝতে পারলেন। হযরত ঈসা দাবী করছিলেন তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সমান। যদি একজন সাধারণ লোক দাবী করে সে আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন পুত্র, তাহলে তা হবে আল্লাহ্-নিন্দা। কিন্তু হযরত ঈসা কেবল একজন মানুষই ছিলেন না। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র অনন্ত কালাম এবং সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতা। নবীরা তাঁর বিষয়েই লিখেছিলেন! কিন্তু মহা-ইমাম কাইয়াফা ও অন্যান্য ইহুদী নেতারা সেই কথা বিশ্বাস করলেন না। তাই তাঁরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের দোষে দোষী সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু এতে একটি সমস্যা ছিল। মহাসভার মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না; শুধুমাত্র রোমীয় সরকারই তা দিতে পারত।

২ মাথার খুলির স্থান

রাতে বিচার কাজ করা বেআইনী ছিল বলে মহাসভা পরদিন ভোরে আবার সভা করার জন্য একত্র হল। হযরত ঈসা নিশ্চয়ই শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন। একদিকে তিনি সারা রাত ঘুমান নি, অন্যদিকে সৈন্যেরা তাঁকে নির্মম ভাবে প্রহার করেছিল। তারা হযরত ঈসাকে দেখাতে চেয়েছিল তাদের শক্তি ও ক্ষমতা কম নয়।

> *তখন সেই সভার সকলে উঠে ঈসাকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের কাছে নিয়ে গেলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:১ আয়াত*

পন্তীয় পীলাত

এহুদিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা পন্তীয় পীলাতের হাতে রোমীয় সরকারের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। যদিও ইহুদীরা হযরত ঈসার মৃত্যু চেয়েছিল কিন্তু কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আইনগত ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এজন্য তাঁদের রোমীয় শাসনকর্তার অনুমতি দরকার ছিল। জেরুজালেমের এবাদত-ঘরের নেতারা জানতেন পীলাত ছিলেন দুর্বল ধরনের মানুষ, তাই তাঁকেই প্ররোচিত করতে হবে হযরত ঈসাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য।

> *তাঁরা এই বলে ঈসার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে লাগলেন, "আমরা দেখেছি, এই লোকটা সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লোকদের নিয়ে যাচ্ছে। সে সম্রাটকে খাজনা দিতে নিষেধ করে এবং বলে সে নিজেই মসীহ্, একজন বাদশাহ্।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:২ আয়াত)*

এটা ছিল একটি চরম মিথ্যা অপবাদ। হযরত ঈসা কখনও তাঁর সাহাবীদেরকে খাজনা দিতে নিষেধ করেন নি। সত্য কথা হল তিনি খাজনা দিতে বলেছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, তিনি নিজেকে 'মসীহ্' বলে দাবী করেছিলেন।

> *পীলাত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ইহুদীদের বাদশাহ্?।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৩ আয়াত)*

> *ঈসা বললেন, "আমার রাজ্য এই দুনিয়ার নয়। যদি আমার রাজ্য এই দুনিয়ার হত তবে আমি যাতে ইহুদী নেতাদের হাতে না পড়ি সেইজন্য আমার লোকেরা যুদ্ধ করত; কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।"*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৩৬ আয়াত)*

হযরত ঈসার বাদশাহী মানুষের অন্তরে শুরু হয়েছিল। তাঁর মধ্যে কোন রাজনৈতিক পদ লাভের উচ্চাকাংখা ছিল না।

> *পীলাত ঈসাকে বললেন, "তাহলে তুমি কি বাদশাহ্?"*

> *ঈসা বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন যে, আমি বাদশাহ্। সত্যের পক্ষে সাক্ষি দেবার জন্য আমি জন্মেছি আর সেইজন্যই আমি দুনিয়াতে এসেছি। যে কেউ সত্যের সে আমার কথা শোনে।"*

পীলাত তাঁকে বললেন, "সত্য কি?।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৩৭,৩৮ক আয়াত)

বর্তমানেও লোকেরা ঠিক একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। কিন্তু পীলাত হযরত ঈসার উত্তর শোনার অপেক্ষা করেন নি।

এই কথা বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদী নেতাদের কাছে গিয়ে বললেন, "আমি এর কোনই দোষ দেখতে পাচ্ছি না।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৮:৩৮খ আয়াত)

পীলাত ইমামদের অবিশ্বাস করতেন। রোমীয় শাসনকর্তা হিসেবে তিনি জানতেন ইহুদীরা তাঁকে ঘৃণা করে। তিনি এও জানতেন সম্রাট সিজারের হুকুম পালনের ইচ্ছা তাদের ছিল না। তাই ঈসাকে মেরে ফেলার ব্যাপারে মহাসভার নিশ্চয়ই আরেকটা কারণ থাকবে।

তখন পীলাত প্রধান ইমামদের ও সমস্ত লোকদের বললেন, "আমি তো এই লোকটির কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।"

কিন্তু তাঁরা জিদ করে বলতে লাগলেন, "এহুদিয়া প্রদেশের সব জায়গায় শিক্ষা দিয়ে এ লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। গালীল প্রদেশ থেকে সে শুরু করেছে, আর এখন এখানে এসেছে।"

এই কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন ঈসা গালীল প্রদেশের লোক কি না। শাসনকর্তা হেরোদের শাসনের অধীনে যে প্রদেশ আছে, ঈসা সেই জায়গার লোক জানতে পেরে পীলাত তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় হেরোদও জেরুজালেমে ছিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৪-৭ আয়াত)

হযরত ঈসার মামলাটির বিচার করবার অধিকার পীলাতেরই ছিল। কিন্তু পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠেছিল। ইহুদী নেতারা হযরত ঈসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উস্‌কে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল। যদি হযরত ঈসা সত্যিই দাঙ্গা সৃষ্টিতে প্ররোচিত করে থাকেন, তাহলে কিভাবে তিনি তা রোমস্থিত তাঁর উচ্চ পদস্থদের কাছে ব্যাখ্যা করবেন? তাই তিনি চিন্তা করলেন বিষয়টি বাদশাহ্‌ হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলে ভাল হবে। আবার হেরোদ ও পীলাতের মধ্যেকার বন্ধুত্বও ভাল ছিল না, এজন্য তিনি এই বিষয়টি হেরোদের উপরে ছেড়ে দিলেন।

হেরোদ আন্তিপাস

হেরোদ আন্তিপাস ছিলেন মহান হেরোদের ছেলে। রোমীয় সরকারের যে প্রদেশে হযরত ঈসার গ্রাম ছিল তিনি সেই গালীল প্রদেশের উপর রাজত্ব করতেন। হেরোদ উদ্ধার-ঈদ উপলক্ষ্যে জেরুজালেমে এসেছিলেন।

ঈসাকে দেখে হেরোদ খুব খুশী হলেন। তিনি ঈসার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। হেরোদ আশা করেছিলেন ঈসা তাঁকে কোন কেরামতী কাজ করে দেখাবেন। তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ঈসা কোন কথারই জবাব দিলেন না। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৮,৯ আয়াত)

নীরব

হযরত ঈসা জানতেন হেরোদ সত্য জানতে চান না, বরং একটি কেরামতী কাজ দেখে কেবল মুগ্ধ হতে চান। তাই হযরত ঈসা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন নি। তিনি বরং নীরব রইলেন।

প্রধান ইমামেরা এবং আলেমেরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঈসাকে দোষ দিতে লাগলেন। তখন হেরোদ ঈসাকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর সৈন্যেরাও তা-ই করল। তার পরে ঈসাকে জমকালো একটা পোশাক পরিয়ে তিনি তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে হেরোদ ও পীলাতের মধ্যে শত্রুতা ছিল, কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:১০-১২ আয়াত)

ঈসাকে ক্রুশে দাও

হযরত ঈসাকে বন্দী করার পর থেকে তিনি পাঁচবার আদালত সভার মুখোমুখি হন। এর মধ্যে তিনবার ইহুদী আদালতের আর দু'বার রোমীয় আদালতের। ষষ্ঠ ও শেষ বিচারটি হবে আবার পীলাতের সামনে। সারা শহরে এই খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত ঈসার আবার বিচার করা হবে। যে জনতা হযরত ঈসাকে "মারহাবা, মারহাবা" বলে চিৎকার করেছিল, সেই একই জনতা এখন জোরে জোরে চিৎকার করে বলছে "ওকে ক্রুশে দাও!" শাসনকর্তা পীলাত উভয় সংকটে পড়ে গেলেন। যতই তিনি হযরত ঈসার সাথে কথা বললেন ততই দেখতে পেলেন হযরত ঈসা একজন অসাধারণ লোক।

পীলাত তখন প্রধান ইমামদের, নেতাদের এবং সাধারণ লোকদের ডেকে একত্র করে বললেন, "আপনারা এই লোকটিকে এই দোষ দিয়ে আমার কাছে এনেছেন যে, লোকদের সে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে আমি আপনাদের সামনেই জেরা করেছি। আপনারা তার বিরুদ্ধে যে সব দোষ দিচ্ছেন তার একটাতেও সে দোষী বলে আমি প্রমাণ পাই নি। হেরোদও নিশ্চয় তার কোন দোষ পান নি, কারণ তিনি তাকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হত্যা করবার মত এমন কোন অন্যায় কাজও সে করে নি। তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:১৩-১৬ আয়াত)

❸ ❹ **শুক্রবার খুব ভোরে**
পন্তীয় পীলাতের সামনে হাজির হওয়ার জন্য হযরত ঈসাকে রোমীয় দুর্গে নেওয়া হল

বৃহস্পতিবার মাঝরাতে
গেৎশিমানী বাগানে হযরত ঈসাকে বন্দী করা হল এবং তাঁকে মহা-ইমামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হল। চিন্তা করা হয় যে, এবাদতখানার ভীড় এড়ানোর জন্য তারা উত্তর দিকের দেয়াল দিয়ে ভ্রমণ করেছিলেন
❶ ❷

শুক্রবার সকাল
পীলাত হযরত ঈসাকে হেরোদের কাছে পাঠালেন। হেরোদ আবার তাঁকে পীলাতের কাছে ফেরত পাঠালেন
❹ ❺ ❹

❷ ❸
শুক্রবার সূর্যোদয়ের সময়
হযরত ঈসার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক দোষ দেওয়ার জন্য তাঁকে মহাসভার সামনে একটি দ্রুত আদালতে হাজির করা হয়েছিল। সেই আদালতে হাজির করার আগে মাঝরাতের একটি অধিবেশনে তাঁকে অননিয়, মহা-ইমাম কাইয়াফা ও সেনহেদ্রিনের সামনে হাজির করা হয়েছিল।

বাদশাহ্ হেরোদ কিংবা শাসনকর্তা পীলাত কেউই হযরত ঈসার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পেলেন না। তাঁরা দু'জনেই জানতেন তিনি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য নন। কেউই তাঁকে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন নি। শেষে পীলাত একটি আপোসের পরামর্শ দিলেন। সেই আপোসের মধ্যে দু'টি বিষয় ছিল।

১। তিনি হযরত ঈসাকে চাবুক মারবেন

এটা কোন সাধারণ প্রহার ছিল না। যে চাবুকটি দিয়ে প্রহার করা হত সেটি ছিল এমন একটি লাঠি, যেটির নীচের মাথায় চামড়ার সরু ফালি লাগানো থাকত। প্রত্যেক ফালির সাথে লাগানো থাকত হাড় বা লোহার টুকরা। অভিযুক্ত ব্যক্তির দু'হাত বেঁধে মাথার উপর তুলে খুঁটির সাথে বাধা হত। তার সমস্ত পিঠে যাতে চাবুক পড়ে সেজন্য এটা করা হত। যখন চাবুক মারা হত তখন সেই চামড়ার ফিতার সঙ্গে যুক্ত হাড় বা লোহার টুকরা মানুষটির মাংসে ঢুকে যেত। যখন চাবুকটা টান মেরে আনা হত তখন তার সাথে সাথে মাংস উঠে আসত। এই ধরনের শাস্তির ফলে প্রায়ই শাস্তি ভোগকারীর মৃত্যু ঘটত।

আইন অনুসারে শুধুমাত্র একজন দোষী সাব্যস্ত লোককে এ ধরনের চাবুক মারা হত। পীলাত নিজে বলেছিলে হযরত ঈসার কোন দোষ নেই। হয়ত তাঁর আশা ছিল হযরত ঈসাকে এরকম ভীষণ চাবুকের শাস্তি দেয়া হলে তাঁর বিরোধীরা সন্তুষ্ট হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আপোসটি গ্রহণ করবে।

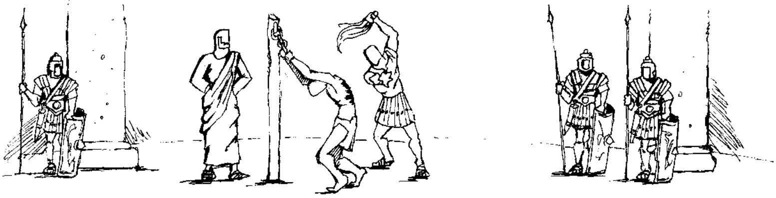

২। তিনি হযরত ঈসাকে মুক্তি দেবেন

রোমীয় সরকারের স্থানীয় নিয়ম ছিল উদ্ধার-ঈদের সময় একজন দোষী সাব্যস্ত কয়েদীকে দয়াপূর্বক মুক্তিদান। পীলাত হযরত ঈসাকে ভীষণ প্রহার করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু জনতা এতে প্রচণ্ড ভাবে অসম্মতি জানাল।

কিন্তু লোকেরা একসংগে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "ওকে দূর করুন, বারাব্বাকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিন।"

পীলাত কিন্তু ঈসাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি লোকদের আবার সেই একই কথা বললেন।

কিন্তু লোকেরা এই বলে চেঁচাতেই থাকল, "ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।"

পীলাত তৃতীয়বার লোকদের বললেন, "কেন, এই লোকটি কি দোষ করেছে? আমি তো তার কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না যাতে তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া যায়। সেইজন্য তাকে আমি অন্য শাস্তি দেবার পর ছেড়ে দেব।" *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:১৮,২০-২২ আয়াত)*

"তখন পীলাত ঈসাকে নিয়ে গিয়ে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিলেন।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:১ আয়াত)*

এই ঘটনার ৭০০ বছর আগে নবী ইশাইয়া হযরত ঈসা মসীহ্ যে নিজের ইচ্ছায় এই দুঃখভোগ করবেন, সে বিষয়ে লিখেছিলেন-

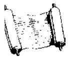

যারা আমাকে মেরেছে আমি তাদের কাছে আমার পিঠ পেতে দিয়েছি আর যারা আমার দাড়ি উপ্‌ড়িয়েছে তাদের কাছে আমার গাল পেতে দিয়েছি। যখন আমাকে অপমান করা ও আমার উপর থুথু ফেলা হয়েছে তখন আমি আমার মুখ ঢেকে রাখি নি।

(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫০:৬ আয়াত)

সৈন্যরা হযরত ঈসাকে নিষ্ঠুর ভাবে চাবুক মেরেই সন্তুষ্ট ছিল না। তারা তাঁকে

নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপও করেছিল।

সৈন্যেরা কাঁটা-লতা দিয়ে একটা তাজ গেঁথে ঈসার মাথায় পরিয়ে দিল। পরে তাঁকে বেগুনে কাপড় পরাল এবং তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "ওহে ইহুদীদের বাদশাহ্, মারহাবা (ধন্য)!" এই বলে সৈন্যেরা তাঁকে চড় মারতে লাগল। (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:২,৩ আয়াত)

তারা একটা লাঠি দিয়ে ঈসার মাথায় বারবার মারতে লাগল এবং তাঁর গায়ে থুথু দিল (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৫:১৯ আয়াত)

পীলাত কিন্তু হযরত ঈসাকে নিষ্ঠুর ভাবে অপমান করার জন্য সৈন্যদের আদেশ দেন নি। সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহ্‌রা বেগুনী রঙের কাপড় পরত। কিন্তু মাথায় কাঁটার মুকুট পরানোর অর্থ ছিল নিষ্ঠুর পরিহাস করা। এই ঘটনার বিষয়েও ৭০০ বছর আগে ইশাইয়া নবী লিখেছিলেন-

লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; ... আমরা তাঁকে সম্মান করি নি। (নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫৩:৩ আয়াত)

পীলাত আবার বাইরে এসে লোকদের বললেন, "দেখ, আমি ওকে তোমাদের কাছে বের করে আনছি যাতে তোমরা বুঝতে পার যে, আমি ওর কোন দোষই পাচ্ছি না।" ঈসা সেই কাঁটার তাজ আর বেগুনে কাপড় পরা অবস্থায় বাইরে আসলেন। তখন পীলাত লোকদের বললেন, "এই দেখ, সেই লোক।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৪,৫ আয়াত)

পীলাত তাঁর অন্তর থেকেই জানতেন তিনি ন্যায়বিচার করছেন না। সম্ভবতঃ তিনি আশা করেছিলেন রক্তাক্ত ও আহত ঈসাকে দেখে তাঁর উপর লোকদের মমতা হবে। কিন্তু

ঈসাকে দেখে প্রধান ইমামেরা আর কর্মচারীরা চেঁচিয়ে বললেন, "ক্রুশে দিন, ওকে ক্রুশে দিন।" পীলাত লোকদের বললেন, "তোমরাই ওকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশে দাও, কারণ আমি ওর কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৬ আয়াত)

পীলাত খুব ভাল করে জানতেন লোকেরা এ ধরনের কাজ করতে পারবে না। ইহুদী আদালতও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত না।

ইব্‌নুল্লাহ্‌

ইহুদী নেতারা পীলাতকে বললেন, "আমাদের একটা আইন আছে, সেই আইন মতে তার মৃত্যু হওয়া উচিত, কারণ সে নিজেকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলেছে।"

পীলাত যখন এই কথা শুনলেন তখন তিনি আরও ভয় পেলেন। তিনি আবার বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" ঈসা কিন্তু পীলাতকে কোন জবাব দিলেন না।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৭-৯ আয়াত)

হযরত ঈসা গালীলের লোক শুনেই পীলাত তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পীলাত আবার হযরত ঈসাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" পীলাত সম্ভবতঃ খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন, কার
হযরত ঈসা নিজেকে ইব্‌নুল্লাহ্‌ বলে দাবী করে বলে
থেকে এসেছেন! গ্রীকেরা বিশ্বাস করত দেবতারা
অলিম্পাস পর্বত থেকে নেমে আসত। হয়ত পীল
ঈসা গ্রীক দেবতাদের মত। পীলাত জানতে
ব্যক্তি ছিলেন না। কিন্তু হযরত ঈসা এম
করেছিলেন, যা পীলাতকে সমস্যায় ফে
থেকে এসেছেন সে বিষয়ে তিনি চিন্তা

*...ঈসা কিন্তু পীলাতকে কোন জ
ঈসাকে বললেন, "তুমি কি আমার
জান যে, তোমাকে ছেড়ে দেবার
ক্ষমতা আমার আছে?"*

ঈসা জবাব দিলেন, "উপর থেকে আপনাকে ক্ষমতা দেওয়া না হলে আমার উপরে আপনার কোন ক্ষমতাই থাকত না। সেইজন্য যে আমাকে আপনার হাতে দিয়েছে তারই গুনাহ্‌ বেশী।"

এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ইহুদী নেতারা চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি যদি এই লোকটাকে ছেড়ে দেন তবে আপনি সম্রাট সিজারের বন্ধু নন। যে কেউ নিজেকে বাদশাহ্‌ বলে দাবি করে সে তো সম্রাট সিজারের শত্রু।"

এই কথা শুনে পীলাত ঈসাকে বাইরে আনলেন এবং পাথরে বাঁধানো নামে একটা জায়গায় বিচারের আসনে বসলেন। হিব্রু ভাষায় সেই জায়গাটাকে গাব্বাথা বলা হত। সেই দিনটা ছিল উদ্ধার-ঈদের আয়োজনের দিন... *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৯-১৪ আয়াত)*

উদ্ধার-ঈদ আয়োজনের দিনেই উদ্ধার-ঈদের ভেড়া জবাই করা হত। পীলাত ইহুদীদের বললেন--

"এই দেখ, তোমাদের বাদশাহ্‌।" এতে তাঁরা চিৎকার করে বললেন, "দূর করুন, দূর করুন! ওকে ক্রুশে দিন!"

পীলাত তাঁদের বললেন, "তোমাদের বাদশাহ্‌কে কি আমি ক্রুশে দেব?"

প্রধান ইমামেরা জবাব দিলেন, "সম্রাট সিজার ছাড়া আমাদের আর কোন বাদশাহ্‌ নেই।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:১৪,১৫ আয়াত)*

বনি-ইসরাইলরা এই শেষবারের মত হযরত ঈসাকে নিজেদের বাদশাহ্‌ হিসাবে অস্বীকার করল। আল্লাহ্‌র প্রেরিত্‌ ওয়াদা-করা নাজাতদাতার বদলে তারা রোমীয় সম্রাট সিজারকে বেছে নিয়েছিল।

তখন পীলাত ঈসাকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য তাঁদের হাতে দিয়ে দিলেন। তখন সৈন্যেরা ঈসাকে নিয়ে গেল। ঈসা নিজের ক্রুশ নিজে বয়ে নিয়ে মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় গেলেন। সেই জায়গার হিব্রু নাম ছিল গল্‌গথা।[১] সেখানে তারা ঈসাকে ক্রুশে দিল– ঈসাকে মাঝখানে আর তাঁর দু'পাশে অন্য দু'জনকে দিল।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:১৬-১৮ আয়াত)

রোমীয় সরকারের দেওয়া সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ক্রুশে দেওয়া। ক্রীতদাস ও সবচেয়ে জঘন্য ও নীচু ধরনের অপরাধীদের জন্য ব্যবহৃত এই শাস্তিটি মৃতুদণ্ড হিসাবে পরিচিত ছিল। ইতিহাসে শত শত লোককে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করার কথা লেখা আছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, ক্রুশে দেওয়ার কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল, যেমন-

দণ্ডায়মান গাছঃ দণ্ডপ্রাপ্তকে গাছের সাথে পেছন করে বাঁধা হত। তাঁর হাত ও পাগুলো সেই গাছের সাথে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করা হত। যোষেফাস নামে প্রথম শতাব্দীর একজন ইহুদী ইতিহাসবিদ্‌ লিখেছেন যে, বন্দীদের অস্বাভাবিক ভাবে ক্রুশে দিয়ে রোমীয় সৈন্যরা আনন্দ পেত।[২]

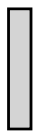

I-আকৃতিঃ এই পদ্ধতিতে একটি সোজা খুঁটিকে মাটিতে খাড়া ভাবে পোঁতা হত। দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটির মাথার উপরে দুই হাত নিয়ে পেরেক মারা হত।

X-আকৃতিঃ এই পদ্ধতিতে দু'টি কাঠের টুকরাকে X-আকৃতির মত করে মাটিতে পুঁতা হত। সেই X-আকৃতির ক্রুশের মাঝখান বরাবর দেহটি রেখে তার দুই হাত ও দুই পা সেই X-আকৃতির ক্রুশের চার দিকে ছড়িয়ে পেরেক মারা হত।

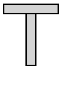

T-আকৃতিঃ খুঁটির উপরে একটি বড় কাঠের টুকরা আড়াআড়িভাবে বসানো হত। গাছে টাংগিয়ে মারাটা ছিল সবচেয়ে বেশী পরিচিত প্রথম রূপ, আর এটা ছিল সবচেয়ে বেশী পরিচিত দ্বিতীয় রূপ। এই পদ্ধতিতে দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটির হাতগুলো কাঠের বড় টুকরার সাথে লাগিয়ে পেরেক মারা হত।

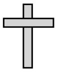

t-আকৃতিঃ এই আকৃতির ক্রুশ কুখ্যাত অপরাধীদের জন্য ব্যবহৃত হত। দণ্ডপ্রাপ্ত লোকটির মাথার উপরে তার অপরাধের কথা লিখে টাঙ্গিয়ে দেয়া হত। সম্ভবতঃ এই ধরনের ক্রুশের উপরেই হযরত ঈসার মৃত্যু হয়েছিল।

অপরাধীর হাত দু'টি দু'দিকে ছড়িয়ে তারপরে ক্রুশের সাথে পেরেক মারা হত। প্রায়ই তার গায়ে কাপড়-চোপড় থাকত না। পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের কব্জির হাড়ের মধ্য দিয়ে পেরেক মারা হত।

কিভাবে মসীহের মৃত্যু হবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একটি কাওয়ালী লেখার জন্য ১০০০ বছর আগে আল্লাহ্‌ দাউদ নবীকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন। পাক-কিতাব এই বলে মসীহের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে-

...তারা আমার হাত ও পা বিঁধেছে। আমার হাড়গুলো আমি গুণতে পারি; সেই লোকেরা আমাকে হাঁ করে দেখছে আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। *(জবুর শরীফ ২২:১৬,১৭ আয়াত)*

রোমীয়রা ক্ষমতায় আসার অনেক আগে এবং মৃত্যুদণ্ড দানের জন্য ক্রুশ ব্যবহারের ৮০০ বছর আগে এই কাওয়ালীটি লেখা হয়েছিল।

বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রুশে দিয়ে মেরে ফেলার পদ্ধতিকে সবচেয়ে বেশী পাশবিক পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়। এই পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে মৃত্যু হত। এতে শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হত। মাঝে মাঝে দণ্ডপ্রাপ্তের মৃত্যু হতে কয়েক দিন লেগে যেত। শরীরের মধ্যচ্ছদার উপরে বাড়ন্ত চাপের কারণে ভাল ভাবে শ্বাস নেওয়া যেত না। শ্বাস নেওয়ার জন্য পা দিয়ে নিজেকে নিজে উপরের দিকে ঠেলা মারত। এতে হাত ও পায়ে মারা পেরেকগুলো আরও ব্যথা বাড়িয়ে দিত। পরে লোকটি খুব বেশী পরিশ্রান্ত হয়ে শ্বাসরোধে মারা যেত।

এটাই নিদারুণ যন্ত্রণার একমাত্র কারণ ছিল না। ক্রুশে দেওয়া লোকটির খুব পিপাসা পেত এবং তাকে অনেক সময় ধরে সূর্যের আলোর মধ্যে থাকতে হত। লোকেরা তার কাছে এসে তাকে বিদ্রূপ করত।

*পীলাত একটা দোষনামা লিখে ঈসার ক্রুশের উপরে লাগিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, **"নাসরতের ঈসা, ইহুদীদের বাদশাহ্‌।"** যেখানে ঈসাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল সেই জায়গাটা শহরের কাছে ছিল বলে*

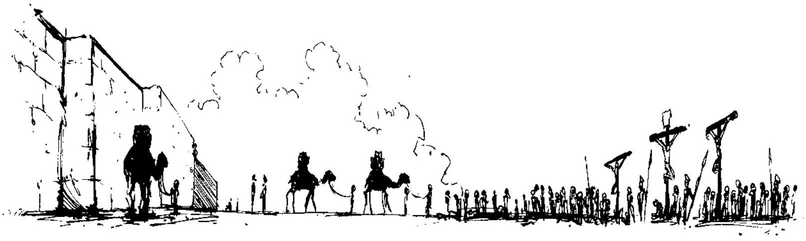

ইহুদীদের অনেকেই সেই দোষনামা পড়ল। সেটা হিব্রু, রোমীয় আর গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:১৯-২০ আয়াত)

ঈসাকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যেরা তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে নিজেদের মধ্যে চার ভাগে ভাগ করল। পরে তারা ঈসার কোর্তাটাও নিল। সেই কোর্তায় কোন সেলাই ছিল না, উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই বোনা ছিল। তা দেখে সৈন্যেরা একে অন্যকে বলল, 'এটা না ছিঁড়ে বরং ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি এটা কার হবে'।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:২৩,২৪ আয়াত)

তাদের সমস্ত পাশবিক কাজ শেষ করে সৈন্যেরা হযরত ঈসার কাপড় নিয়ে বাজি ধরেছিল। সেই নিষ্ঠুর সৈন্যেরা কিন্তু জানত না তারা একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করছিল।

এটা ঘটেছিল যাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়, "তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড় ভাগ করছে, আর আমার কাপড়ের জন্য তারা ভাগ্য পরীক্ষা করছে।" আর সত্যিই সৈন্যেরা এই সব করেছিল।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:২৪ আয়াত; জবুর শরীফ ২৫:১৮ আয়াতের সাথে এই আয়াতের তুলনা করুন)

ধর্ম-নেতারা ঈসাকে ঠাট্টা করে বললেন, "সে তো অন্যদের রক্ষা করত। যদি সে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌, তাঁর বাছাই-করা বান্দা হয় তবে নিজেকে রক্ষা করুক!।" (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৩৫ আয়াত)

১০০০ বছর আগে আল্লাহ্‌ বাদশাহ্‌ দাউদের মধ্য দিয়ে বলেছিলেন যে, সেই ওয়াদা-করা নাজাতদাতার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হবে।

কিন্তু আমি তো কেবল একটা পোকা, মানুষ নই; লোকে আমাকে টিট্‌কারি দেয় আর মানুষ আমাকে তুচ্ছ করে। যারা আমাকে দেখে তারা সবাই আমাকে ঠাট্টা করে। তারা আমাকে মুখ ভেংগায়, আর মাথা নেড়ে বলে...। (জবুর শরীফ ২২:৬,৭ আয়াত)

ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীরা ঠিক কি কি বলবে, সেসব কথার বিষয়েও নবী দাউদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

"ও তো মাবুদের উপর ভরসা করে, তাহলেই তিনিই ওকে রক্ষা করুন; তিনিই ওকে উদ্ধার করুন, কারণ ওর উপর তিনি সন্তুষ্ট।"

(জবুর শরীফ ২২:৮ আয়াত)

সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা ঈসাকে খেতে দেবার জন্য তাঁর কাছে সিরকা নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি যদি ইহুদীদের বাদশাহ্‌ হও তবে নিজেকে রক্ষা কর।"

যে দু'জন দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে টিট্‌কারি দিয়ে বলল, "তুমি নাকি মসীহ্? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা কর।"

তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, "তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয় কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।"

তারপর সে বলল, "ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।"

জবাবে ঈসা তাকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।"
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৩৬,৩৭,৩৯-৪৩ আয়াত)

হযরত ঈসা দ্বিতীয় দোষী লোকটিকে (ডাকাতকে) আশ্বস্ত করে বলেছিলেন যে, মারা যাওয়ার সাথে সাথে সে জান্নাতুল ফেরদৌসে (বেহেশতে) চলে যাবে। হযরত ঈসার পক্ষে এমনটি বলা সম্ভব ছিল, কারণ তিনি জানতেন এই লোকটি নিজের গুনাহের ও অনন্ত শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাঁর উপর ঈমান এনেছে।

তখন বেলা প্রায় দুপুর। সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং সারা দেশ অন্ধকার হয়ে গেল। *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৪৪ আয়াত)*

বেলা তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন, "এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী," অর্থাৎ "আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৫:৩৪ আয়াত)*

হযরত ঈসা এসব কথা বলার সময় অন্য আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল। ১০০০ বছর আগে বাদশাহ্ দাউদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মসীহের মুখ থেকে এই একই কথা উচ্চারিত হবে।

"আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ।"
(জবুর শরীফ ২২:১ আয়াত)

হযরত ঈসার জোরে চিৎকার করে উঠার পেছনে কারণ ছিল। পরবর্তীতে এই চিৎকার করে উঠার অর্থ আমরা দেখতে পাব।

আসুন আমরা ক্রুশের উপরে হযরত ঈসার জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে চিন্তা করি, কারণ সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাক-কিতাব বলে-

ঈসা চিৎকার করে বললেন, "পিতা, আমি তোমার হাতে আমার রূহ তুলে দিলাম।" এই কথা বলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন।
(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৪৬ আয়াত)

আবার ইউহোন্না ১৯:৩০ আয়াতে লেখা আছে-

> *ঈসা সেই সিরকা খাওয়ার পরে বললেন, "শেষ হয়েছে।" তারপর তিনি মাথা নীচু করে তাঁর রূহ্‌ সমর্পণ করলেন।*

মার্ক ১৫:৩৮ আয়াতে লেখা আছে-

> *তখন বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল।*

হযরত ঈসা মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তান কি আল্লাহ্‌র উপর বিজয়ী হয়েছিলেন? এবাদতখানার পর্দাটা কেন উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে গিয়েছিল? কেন হযরত ঈসা প্রচণ্ড চিৎকারে বলেছিলেন "*শেষ হয়েছে*"?

চিরে-যাওয়া পর্দা

স্মরণ করুন, এবাদত-খানা ছিল আসল আবাস-তাম্বুরই হুবহু নকল। একটি মোটা পর্দা পবিত্র স্থান থেকে মহাপবিত্র স্থানকে পৃথক করেছিল। আর পর্দাটি হঠাৎ চিরে দু'ভাগ হয়ে গেল। এটা কোন ছোটখাট ব্যাপার ছিল না।

প্রথমতঃ পাক-কিতাব বলে, এই পর্দাটির দরুন লোকেরা মহাপবিত্র স্থানের ভিতরটায় দেখতে পেত না। সেই পর্দার পিছনের দিকে তাকানোর মানে ছিল মারা যাওয়া। আল্লাহ্‌ হযরত মূসাকে শত শত বছর আগে বলেছিলেন...

> *"তোমার ভাই হারুনকে বল, শাহাদাত-সিন্দুকের উপরকার ঢাকনার সামনে যে পর্দা রয়েছে তার পিছনে সেই পবিত্র জায়গায় সে যেন তার খুশীমত যখন-তখন না যায়। তা করলে সে মারা যাবে, কারণ সেই ঢাকনার উপরে মেঘের মধ্যে আমি প্রকাশিত থাকি।"*
>
> *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১৬:২ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ এবাদতখানার মধ্যেকার পর্দাটি চিরে যাওয়া ছিল খুব বড় একটা ব্যাপার। এই পর্দাটা ছিল ৬০ ফুট উঁচু এবং ৩০ ফুট চওড়া। এটা একজন মানুষের হাতের ন্যায় ৪ ইঞ্চি পুরু ছিল।[৩]

তৃতীয়তঃ সেই পর্দাটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে যাওয়ায় বুঝা যায় যে, কোন মানুষ নয়, বরং আল্লাহ্‌ই সেটি চিরে দিয়েছেন।

ইহুদীদের সময় অনুসারে হযরত ঈসা দুপুর তিনটায় মারা গিয়েছিলেন। সেই সময় এবাদতখানায় ইমামেরা কাজ করছিলেন। এটা ছিল বৈকালীন কোরবানীর সময়। এ সময় ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হত। এছাড়াও সেই সময়টা ছিল উদ্ধার-ঈদের সময়। সেই মহা-পবিত্র স্থানের মধ্যেকার পর্দাটি চিরে যাওয়ার খবরটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। এটা ভুলে যাওয়ার মত ঘটনা ছিল না।

আমি এই পুরো ঘটনার তাৎপর্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব।

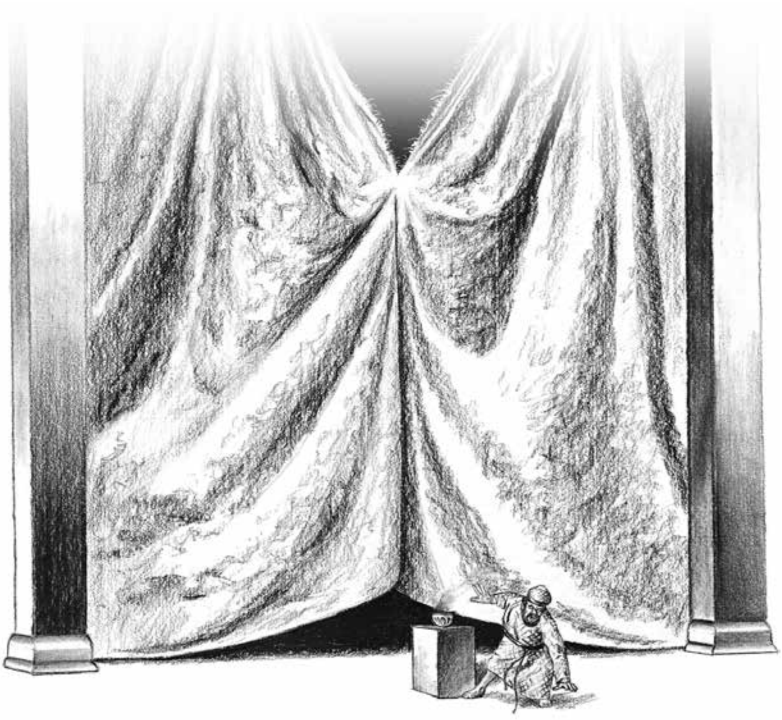

বিজয়ের চিৎকার

"শেষ হয়েছে" শব্দগুচ্ছটি অনুবাদ করা হয়েছে গ্রীক শব্দ তেতেলেস্টাই (Tetelestai) থেকে। তেতেলেস্টাই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ[৪]

১। একটি কাজ শেষ করে একজন গোলাম তার মনিবকে বলত *তেতেলেস্টাই*, অর্থাৎ "আপনি আমাকে যে কাজটি করতে দিয়েছিলেন তা আমি শেষ করেছি।"

২। তেতেলেস্টাই ছিল গ্রীক ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত একটি শব্দ। যখন দেনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হত, তখন তা আদান-প্রদান সম্পন্ন হওয়া নির্দেশ করত। যখন শেষ মূল্যটি পরিশোধ করা হত তখন একজন লোক বলতে পারত 'তেতেলেস্টাই' অর্থাৎ 'দেনা পরিশোধ করা হয়েছে'। প্রাচীন খাজনা পরিশোধের রশিদের মধ্যে *তেতেলেস্টাই* কথাটি পাওয়া গিয়েছে, যার অর্থ 'সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে'।

৩। কোরবানীর জন্য অবশ্যই একটি উপযুক্ত ভেড়া বেছে নিতে হবে। ভেড়ার পাল থেকে খোঁজাখুঁজির পর একটি নিখুঁত ভেড়া পাওয়া গেলে পর একজন লোক বলত *তেতেলেস্টাই*, অর্থাৎ কাজটি শেষ হয়েছে।

যখন হযরত ঈসা চিৎকার করে বলেছিলেন "শেষ হয়েছে", তখন তিনি বুঝিয়েছিলেন "তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ তা শেষ হয়েছে, দেনা

পরিশোধ করা হয়েছে এবং কোরবানীর ভেড়া পাওয়া গিয়েছে।”

এই সব দেখে রোমীয় শত-সেনাপতি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, “সত্যিই লোকটি ধার্মিক ছিল।” *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৪৭ আয়াত)*

একজন শত-সেনাপতির উপর ১০০জন সৈন্যের ভার ছিল। এই সেনাপতি হযরত ঈসার চিৎকারে সাড়া দিয়েছিলেন। সৈন্য হিসাবে নিশ্চয়ই তিনি পরাজয়ের নাভিশ্বাস এবং বিজয়ের আনন্দ চিৎকারের মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে জানতেন।

সেই দিনটা ছিল ঈদের আয়োজনের দিন। পরের দিন ছিল বিশ্রামবার, আর সেই বিশ্রামবারটা একটা বিশেষ দিন ছিল বলে ইহুদী নেতারা চেয়েছিলেন যেন সেই দিনে লাশগুলো ক্রুশের উপরে না থাকে। এইজন্য তাঁরা পীলাতের কাছে অনুরোধ করলেন যেন ক্রুশে যারা আছে তাদের পা ভেংগে ক্রুশ থেকে তাদের সরিয়ে ফেলা হয়।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৩১ আয়াত)

পা দু’টি ভেঙ্গে ফেলা

সেই সময়টা ছিল উদ্ধার-ঈদের সপ্তাহ। আর এই দিনটি ছিল উদ্ধার-ঈদের চরম মূহুর্ত। এই দিনেই ভেড়ার বাচ্চাকে জবাই করা হত। মহা-ইমামেরা হযরত ঈসাকে ক্রুশে দেওয়ার কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন যাতে উদ্ধার-ঈদ বাধাপ্রাপ্ত না হয়। তারা হযরত ঈসার পা দু’টো ভেঙ্গে দিতে বলেছিলেন যাতে তিনি শ্বাস নেওয়ার জন্য উপরের দিকে উঠতে না পারেন। এর ফলে হয় তিনি শ্বাসরোধে মারা যাবেন, না হয় ভাঙ্গা হাড়গুলোর যন্ত্রণায় মারা যাবেন।

তখন সৈন্যেরা এসে ঈসার সংগে যাদের ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তাদের দু’জনের পা ভেংগে দিল। পরে ঈসার কাছে এসে সৈন্যেরা তাঁকে মৃত দেখে ***তাঁর পা ভাংল না****। কিন্তু একজন সৈন্য তাঁর পাঁজরে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল, আর তখনই সেখান থেকে রক্ত আর পানি বের হয়ে আসল।”* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৩২-৩৪ আয়াত)*

একজন রোমীয় সৈন্য হযরত ঈসার পাঁজরে বর্শা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যাতে হযরত ঈসার মৃত্যু হয়েছে কিনা তা জানতে পারে । সেই সৈন্যটা জানত ঠিক কোথায় বর্শাটা ঢুকিয়ে দিলে ঈসা মারা যাবে। রক্ত ও পানি বের হয়ে এসেছিল। চিকিৎসকদের মতে হযরত ঈসা যে সত্যিই মারা গিয়েছিলেন, এটা ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ।

যিনি নিজের চোখে এটা দেখেছিলেন তিনিই সাক্ষি দিয়ে বলেছেন, আর তাঁর সাক্ষি সত্যি। তিনি জানেন যে, তিনি যা বলছেন তা সত্যি, যেন তোমরাও বিশ্বাস করতে পার। ***এই সব ঘটেছিল যাতে পাক-কিতাবের এই কথা পূর্ণ হয়,*** *“তাঁর একখানা হাড়ও ভাংগা হবে না।”*

আবার কিতাবের আর একটা কথা এই– "যাঁকে তারা বিঁধেছে তাঁর দিকে তারা তাকিয়ে দেখবে।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৩৫-৩৭ আয়াত)

৩ শূন্য কবর

শুক্রবারঃ শেষ দুপুর

এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। ইউসুফ ছিলেন ঈসার গোপন সাহাবী, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। আগে যিনি রাতের বেলায় ঈসার কাছে এসেছিলেন সেই নীকদীমও প্রায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন। পরে তাঁরা ঈসার লাশটি নিয়ে ইহুদীদের দাফন করবার নিয়ম মত সেই সমস্ত খোশবু জিনিসের সংগে লাশটি কাপড় দিয়ে জড়ালেন। ঈসাকে যেখানে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছিল সেই জায়গায় একটা বাগান ছিল আর সেখানে একটা নতুন কবর ছিল। সেই কবরের মধ্যে কাউকে কখনও দাফন করা হয় নি। সেই দিনটা ছিল ইহুদীদের ঈদের আয়োজনের দিন, আর কবরটাও কাছে ছিল বলে তাঁরা ঈসাকে সেই কবরেই দাফন করলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৩৮-৪২ আয়াত)

যে স্ত্রীলোকেরা ঈসার সঙ্গে গালীল থেকে এসেছিলেন তাঁরা ইউসুফের পিছনে পিছনে গিয়ে কবরটি দেখলেন এবং ঈসার লাশ কিভাবে দাফন করা হল তাও দেখলেন। তারপর তাঁরা ফিরে গিয়ে তাঁর লাশের জন্য খোশবু মসলা এবং মলম তৈরী করলেন। এর পরে তাঁরা মূসার হুকুম মত বিশ্রামবারে বিশ্রাম করলেন। (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:৫৫,৫৬ আয়াত)

ইউসুফ ও নীকদীম মহাসভার সদস্য হলেও তাঁরা ছিলেন ঈসার গোপন ঈমানদার। ইহুদী রীতি অনুসারে তাঁরা হযরত ঈসার দেহ কাফনের কাপড় দিয়ে মুড়িয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর শরীরে ৩৪ কেজি সুগন্ধি মশলা মাখিয়েছিলেন। তারপরে তাঁকে কবরে শোওয়ালেন। কবরের মুখটা হয়ত ২টন ওজনের একটি বড় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রীলোকেরা হযরত ঈসাকে দাফন করতে দেখেছিল। তারপর তারা ঘরে ফিরে গিয়েছিল চূড়ান্ত দাফনের জন্য অতিরিক্ত মশলা প্রস্তুত করতে। সেটা ছিল শুক্রবার রাতের বেলা।

শনিবার

পরের দিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরের দিন প্রধান ইমামেরা এবং ফরীশীরা পীলাতের কাছে জমায়েত হয়ে বললেন, "হুজুর, আমাদের মনে পড়েছে, সেই ঠগটা বেঁচে থাকতে বলেছিল, আমি তিন দিন পরে বেঁচে উঠব। সেইজন্য হুকুম দিন যেন তিন দিন পর্যন্ত কবরটা পাহারা দেওয়া হয়। না হলে তাঁর উম্মতেরা হয়তো এসে তাঁর লাশটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লোকদের বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন। তাহলে প্রথম ছলনার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরও খারাপ হবে।"

তখন পীলাত তাঁদের বললেন, "পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন সেইভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।" তখন তাঁরা গিয়ে পাথরের উপরে সীলমোহর করলেন এবং পাহারাদারদের সেখানে রেখে কবরটা কড়াকড়িভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৭:৬২-৬৬ আয়াত)

কবর পাহারা দেওয়ার জন্য দক্ষ পাহারাদার সৈন্যদল পাঠানো হয়েছিল। তারা ছিল খুবই প্রশিক্ষিত সৈন্যদল। প্রতি দলে ৪ থেকে ১৬জন সৈন্য

ছিল। প্রত্যেক সৈন্য ৬ ফুট করে জায়গা রক্ষার ব্যাপারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। এই সৈন্যদলটি একটি সৈন্যবাহিনীর[৫] বিপরীতে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম ছিল।

পীলাত প্রধান ইমাম ও ফরীশীদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কবরের মুখখানা সীল করে দেওয়ার জন্য। সেই বিশাল পাথরের দরজাটিকে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল। তারপর সেই দড়িগুলো ভেজা কাদামাটি দিয়ে সীল করা হয়েছিল এবং তার উপর পীলাতের সীলমোহর যুক্ত আংটির ছাপ মারা হয়েছিল। কেউ অনধিকারবশতঃ সেই দড়ি টানলে বা খুললে তা সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত।

রবিবার

ইহুদী বিশ্রামবার দিন, অর্থাৎ শনিবারে পাহারাদার সৈন্যদের বসানো হয়েছিল। কিন্তু রবিবার দিন খুব ভোরে আবছা অন্ধকারে...

> *হঠাৎ ভীষণ ভূমিকম্প হল, কারণ মাবুদের একজন ফেরেশতা বেহেশত থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন। তাঁর চেহারা বিদ্যুতের মত ছিল আর তাঁর কাপড়-চোপড় ছিল ধব্‌ধবে সাদা। তাঁর ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।* (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৮:২-৪ আয়াত)

শক্তিশালী ও সাহসী রোমীয় পাহারাদাররা ফেরেশতাটিকে দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। কী করুণ ব্যাপার! এরই মধ্যে...

> *বিশ্রামবার পার হয়ে গেলে পর মগ্‌দলীনী মরিয়ম, ইয়াকুবের মা মরিয়ম এবং শালোমী ঈসার লাশে মাখাবার জন্য খোশবু মলম কিনে আনলেন। সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালে, সূর্য উঠবার সংগে সংগেই তাঁরা কবরের কাছে গেলেন। সেই সময় তাঁরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "কবরের মুখ থেকে কে ঐ পাথরটা সরিয়ে দেবে?" কিন্তু তাঁরা চেয়ে দেখলেন যে, পাথরখানা সরানো হয়েছে। সেই পাথরটা খুব বড় ছিল।* (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬:১-৪ আয়াত)

মগ্‌দলীনী মরিয়ম সেই কবরটি খোলা দেখতে পেয়ে প্রথমে মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তাঁর মনে হল হযরত ঈসার দেহটি হয়ত কেউ নিয়ে গিয়ে নষ্ট করেছে। ফুঁপিয়ে কান্না করতে করতে তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন, আর সে কথা সাহাবীদের কাছে বলার জন্য দৌড়াতে লাগলেন। কিন্তু ইয়াকুবের মা মরিয়ম ও শালোমী সামনের দিকে এগোলেন এবং কবরের মধ্যে ঢুকলেন।

> *কবরের গুহায় ঢুকে তাঁরা দেখলেন, সাদা কাপড়-পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। এতে তাঁরা খুব অবাক হলেন।*
>
> *সেই যুবকটি বললেন, "অবাক হয়ো না। নাসরত গ্রামের ঈসা, যাঁকে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁকেই তোমরা খুঁজছো তো? তিনি এখানে নেই, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন। যেখানে তারা তাঁকে রেখেছিল সেই জায়গা দেখ। তারপর তোমরা গিয়ে তাঁর সাহাবীদের*

ও পিতরকে এই কথা বল যে, তিনি তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তিনি যেমন বলেছিলেন তেমনই তারা তাঁকে সেখানে দেখতে পাবে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৬:৫-৭ আয়াত)

সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সংগে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং ঈসার সাহাবীদের এই খবর দেবার জন্য দৌড়াতে লাগলেন।

এমন সময় ঈসা হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।" তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে তাঁকে সেজদা করলেন।

ঈসা তাঁদের বললেন, "ভয় কোরো না; তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।"

(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৮:৮-১০ আয়াত)

ভোরবেলা এই সংবাদের বিষয়ে যে সংশয় ও উত্তেজনা ছিল, কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনা পড়েঁ আমরা তা বুঝতে পারি। সেই লোকেরা তো ঈসাকে মরতে দেখেছিল; কি করে তাঁরা সেই আনন্দে উত্তেজিত মহিলাদের কথা বিশ্বাস করবে? প্রথমে...

কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:১১ আয়াত)

সেই কবর দেখে আসার জন্য সাহাবী পিতর ও ইউহোন্না দৌড়ে গেলেন। ইউহোন্না আরও দ্রুত দৌড়ে কবরের মুখে এসে থামলেন।

শিমোন-পিতরও তাঁর পিছনে পিছনে এসে কবরের ভিতরে ঢুকলেন এবং কাপড়গুলো পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি আরও দেখলেন, তাঁর মাথায় যে রুমালখানা জড়ানো ছিল তা অন্য কাপড়ের সংগে নেই, কিন্তু আলাদা করে এক জায়গায় গুটিয়ে রাখা হয়েছে।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০:৬,৭ আয়াত)

উপরের আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, কবর থেকে হযরত ঈসার দেহ চুরি হয় নি। যে লম্বা লম্বা কাপড়ের ফালি দিয়ে হযরত ঈসাকে জড়ানো হয়েছিল, সেগুলো তখনও এমন ভাবে জড়ানো অবস্থায় পড়ে ছিল যেন সেগুলো দিয়ে একটি মৃত দেহ জড়ানো আছে, কিন্তু ভিতরে দেহ না থাকায় কাপড়গুলো নুইয়ে পড়েছে। হযরত ঈসার দেহ নেই! সেই কাপড়গুলোর মধ্য দিয়ে দেহ বের হয়ে এসেছে। যে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা হয়েছিল সেটি ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল। বের হওয়ার সময় কেউ একজন তা সুন্দর ভাবে যেন গুছিয়ে রেখেছে। পাক-কিতাবে লেখা আছে সাহাবী পিতর তা দেখেছিলেন, অন্যদিকে সাহাবী

ইউহোন্না তা দেখেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন। হযরত ঈসা যে জীবিত হয়ে উঠেছেন সে ব্যাপারে সাহাবী ইউহোন্নার কোন সন্দেহ ছিল না! কিন্তু সাহাবী পিতরের মাথা ঘুরছিল। এই বিষয়টি নিয়ে তাঁর চিন্তা করার দরকার ছিল।

যখন মগ্‌দলীনি মরিয়ম ফিরে আসলেন তখনও ভোর ছিল।

> *মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে নীচু হয়ে কবরের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, ঈসার লাশ যেখানে শোয়ানো ছিল সেখানে সাদা কাপড় পরা দু'জন ফেরেশতা বসে আছেন–একজন মাথার দিকে আর অন্যজন পায়ের দিকে। তাঁরা মরিয়মকে বললেন, "কাঁদছ কেন?"*
>
> *মরিয়ম তাঁদের বললেন, "লোকেরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে এবং তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০:১১-১৩ আয়াত)*

সেই কবরটি ছিল একটি বাগানের ভিতর। মরিয়ম ভেবেছিলেন হয়ত সেই দু'জন স্বর্গদূত ছিলেন মালী। ঈসার মৃত্যুতে খুবই কাতর হওয়ায় এই লোকেরা কে ছিলেন তা জিজ্ঞেস করার চিন্তা পর্যন্ত তিনি করে নি। ভীষণ দুঃখে কেঁদে কেঁদে তিনি কথা বলছিলেন।

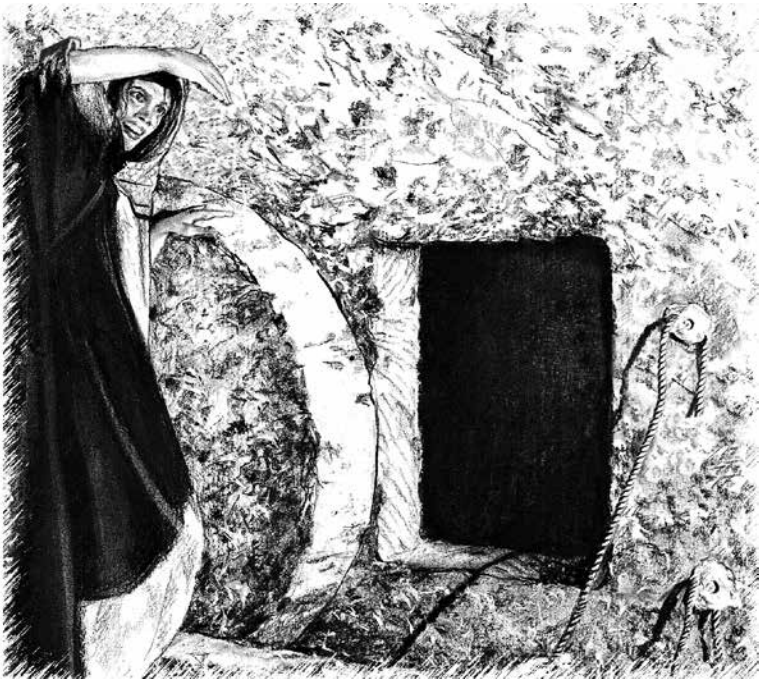

> *এই কথা বলে মরিয়ম পিছনে ফিরে দেখলেন ঈসা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তিনি যে ঈসা তা বুঝতে পারলেন না।*

ঈসা তাঁকে বললেন, "কাঁদছ কেন? কাকে খুঁজছ?"

ঈসাকে বাগানের মালী ভেবে মরিয়ম বললেন, "দেখুন, আপনি যদি তাঁকে (ঈসাকে) নিয়ে গিয়ে থাকেন তবে বলুন কোথায় রেখেছেন। আমিই তাঁকে নিয়ে যাব।"

ঈসা তাঁকে বললেন, "মরিয়ম।" *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০:১৪-১৫ আয়াত)*

মরিয়ম সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসার কণ্ঠ চিনতে পারলেন। এই মমতা-ভরা কণ্ঠ নাজাতদাতার সাথে তাঁর প্রত্যেকটি হৃদয়-লালিত কথাবার্তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

তাতে মরিয়ম ফিরে দাঁড়িয়ে আরামীয় ভাষায় ঈসাকে বললেন, "রব্বুনি।" রব্বুনি মানে ওস্তাদ। *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০:১৬ আয়াত)*

হয়ত তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিলেন এবং হযরত ঈসার পায়ের উপর পড়ে সম্মানপূর্বক তাঁর পা দু'টি আঁকড়ে ধরেছিলেন। হযরত ঈসা মরিয়মকে সাহাবীদের কাছে গিয়ে তাঁর জীবিত হওয়ার কথা বলতে বললেন।

তখন মগ্‌দলীনী মরিয়ম উম্মতদের কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন, তিনি ঈসাকে দেখেছেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ২০:১৮ আয়াত)*

পাহারাদারেরা

একই সময়ে রোমীয় পাহারাদারেরা প্রধান ইমামদের কাছে ছুটে গেল। যদি তারা তাদের গল্প নিয়ে পীলাতের কাছে ফিরে যেত তাহলে তিনি তাদের শাস্তি দিতেন।

সেই স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান ইমামদের জানাল
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৮:১১ আয়াত)

কবরটি ছিল শূন্য- হযরত ঈসার শত্রুরা তা স্বীকার করেছিল।

তখন ইমামেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একত্র হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সেই সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন, "তোমরা বোলো, আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তাঁর উম্মতেরা এসে তাঁকে চুরি করে নিয়ে গেছে।" এই কথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাঁকে শান্ত করব এবং শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব। তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনই বলল। আজও পর্যন্ত সেই কথা ইহুদীদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।
(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ২৮:১২-১৫ আয়াত)

তারা যে ঘুমাচ্ছিল সেই কথা তাদেরকে দিয়ে বলানোর জন্য প্রধান ইমামদেরকে বড় অংকের টাকা দিতে হয়েছিল। (দায়িত্বকালীন সময়ে পাহারাদারদের ঘুমিয়ে

পড়ার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড)। অবশ্যই পাহারাদারদের ঘুম যাওয়ার বিষয়টা সত্য ছিল না। সব রকম মিথ্যার পিতা শয়তান প্রধান ইমামদেরকে দিয়ে এই গল্পটি বানিয়েছিল। শয়তান জানত সে পরাজিত হয়েছে। আদন বাগানে বিবি হাওয়ার কাছে করা আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুসারে সেই ***ওয়াদা করা নাজাতদাতা*** হযরত ঈসা শয়তানের মাথা চুরমার করে দিয়েছিলেন।

জীবন্ত

হযরত ঈসা আবার মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছিলেন এবং তিনি সত্যিই জীবিত। তিনদিন ধরে তাঁর দেহ কবরে মৃত ছিল। কিন্তু তারপরে আল্লাহ্‌তা'লা নাটকীয় ভাবে তাঁর মহাশক্তি দেখিয়েছিলেন। হযরত ঈসাকে নূতন দেহ দিয়ে জীবিত করে তোলা হয়েছিল।

বেঁচে থাকার সময় হযরত ঈসা তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে এই বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন-

> *"পিতা আমাকে এইজন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:১৭,১৮ আয়াত)*

কেন হযরত ঈসাকে মরতে হয়েছিল?

হযরত ঈসার মৃত্যু কোন সাধারণ মৃত্যু ছিল না। আমাদের মত সাধারণ মানুষদের জন্য মৃত্যু হল গুনাহের ফল। আল্লাহ্‌র শরীয়ত ভঙ্গ করার এটাই উচিত শাস্তি। কিন্তু হযরত ঈসা নিখুঁত ভাবে হযরত মূসাকে দেওয়া দশটি বিশেষ হুকুম পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ, তাই তাঁর পাওনা তো মৃত্যু ছিল না। *গুনাহ্ ও মৃত্যুর নিয়ম* অনুসারে হযরত ঈসা চিরকাল ধরে বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু কেন তিনি মারা গিয়েছিলেন? শয়তান কিংবা ইহুদীরা বা রোমীয়রা তাঁকে মারে নি, বরং তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিলেন। এর কারণ কি ছিল? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর পাব।

সেদিন সকালে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলো ছিল মাত্র শুরু। তারপরে পরবর্তী ৪০ দিন ধরে অনেক লোক হযরত ঈসাকে দেখেছিল। তিনি তাঁর সাহাবী ও ঘনিষ্ঠদের দেখা দিয়েছিলেন। হযরত ঈসার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠা বিষয়ক আলোচনা শেষ করার আগে আরেকটি ঘটনার কথা অবশ্যই জানানো দরকার।

যে ৭২ ঘন্টার ঘটনা ইতিহাস পাল্টে দিয়েছিল

*ইহূদী শুক্রবার

বৃহস্পতি সাহাবীরা উদ্ধার-ঈদের ভোজ প্রস্তুত করলেন
উদ্ধার-ঈদের ভোজ
হেঁটে গেৎশিমানী বাগানে যাওয়া
বাগানে ঈসাকে বন্দী করা হল; সাহাবীরা পালিয়ে গেলেন

শুক্র ১ম বিচার — মহা-ইমামের শ্বশুর অননিয়ের সামনে
২য় বিচার — মহা-ইমাম ও মহাসভার সামনে
৩য় বিচার — মহাসভার সামনে (বিচারকে বৈধতা দানের জন্য)
সকাল ৬ঃ৩০ ৪র্থ বিচার — পীলাতের সামনে
৫ম বিচার — হেরোদের সামনে (ঈসাকে বিদ্রূপ করা হল)
৬ষ্ঠ বিচার — পীলাতের সামনে (ঈসাকে চাবুক মারা হল)

সকাল ৯ঃ০০ ক্রুশে দেওয়া

দুপুর ৩ঃ০০ ঈসা চিৎকার করে বললেন, "শেষ হয়েছে।" এবাদতখানার পর্দা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে গেল; দু'জন ডাকাতের পা ভেঙ্গে দেওয়া হল; ঈসার পাঁজরে বর্শা ঢুকানো হল; আরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ দাফনের জন্য ঈসার দেহ চেয়ে নিলেন; ঈসাকে কবরে দাফন করা হল

ইহূদী শনিবার

শনি

রোমীয় পাহারাদার বসানোর অনুরোধ এবং পাহারাদারদেরকে কবরের কাছে বসানো হল
কবরের পাথরের উপর সীলমোহর করে দেওয়া হল

ইহূদী রবিবার

রবি ভূমিকম্প- ফেরেশতারা পাথরটি সরিয়ে দিলেন; পাহারাদারেরা পালিয়ে গেল
স্ত্রীলোকেরা কবরের কাছে গেলেন
ইয়াকুবের মা মরিয়ম ও শালোমীকে হযরত ঈসা দেখা দিলেন
মগ্দলীনী মরিয়মকে ঈসা দেখা দিলেন
সাহাবী পিতরকে ঈসা দেখা দিলেন।

*উলেৱখ্য যে, ইহূদী দিন শুরব হয় সূর্যাস্ত থেকে; এর পরের দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন চলতে থাকে।

চতুর্দশ অধ্যায়

১ অচেনা লোকটি

২ শরীয়ত ও নবীগণ
-হযরত আদম থেকে নূহ নবী পর্যন্ত-

৩ শরীয়ত ও নবীগণ
-হযরত ইব্রাহিম থেকে শরীয়ত দেওয়া পর্যন্ত-

৪ শরীয়ত ও নবীগণ
-আবাস-তাম্বু থেকে ব্রোঞ্জের সাপ পর্যন্ত-

৫ শরীয়ত ও নবীগণ
-হযরত ইয়াহিয়া থেকে হযরত ঈসার পুনরুত্থান পর্যন্ত-

১ অচেনা লোকটি

সেই দিনেই দু'জন উম্মত ইম্মায়ু নামে একটা গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামটা জেরুজালেম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল। যা ঘটেছে তা নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন। সেই সময় ঈসা নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন না।

তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা কি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন?" সেই দু'জন উম্মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:১৩-১৭ আয়াত)

এই দু'জন লোক হযরত ঈসার সাহাবী দলের কেউ ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা ছিলেন হযরত ঈসার উম্মত।

তখন ক্লিয়পা নামে তাঁদের মধ্যে একজন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি জেরুজালেমের একমাত্র লোক যিনি জানেন না এই কয়দিনে সেখানে কি কি ঘটছে?" ঈসা তাঁদের বললেন, "কি কি ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "নাসরত গ্রামের ঈসাকে নিয়ে যা যা ঘটেছে। তিনি নবী ছিলেন। তিনি কাজে ও কথায় আল্লাহ্‌ ও সমস্ত লোকের চোখে শক্তিশালী ছিলেন। আমাদের প্রধান ইমামেরা ও ধর্ম-নেতারা তাঁকে রোমীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়। পরে সেই ইহুদী নেতারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম তিনিই ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করবেন। কেবল তা-ই নয়, আজ তিন দিন হল এই সব ঘটনা ঘটেছে। আবার আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করেছেন। তাঁরা খুব সকালে ঈসার কবরে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে তাঁর লাশ দেখতে পান নি। তাঁরা ফিরে এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দেখা পেয়েছেন আর সেই ফেরেশতারা তাঁদের বলেছেন যে, ঈসা বেঁচে আছেন। তখন আমাদের সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কবরে গিয়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলেন, কিন্তু ঈসাকে দেখতে পেলেন না।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:১৮-২৪ আয়াত)

সেই দু'জন উম্মত সেই দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা সংক্ষেপে বলে গেলেন। অবশ্যই এসব ঘটনা হযরত ঈসার অজানা ছিল না। কিন্তু তারপরও তিনি নীরবে তা শুনে গেলেন। তাঁরও অনেক কথা বলবার ছিল।

*তখন ঈসা তাঁদের বললেন, **"আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন***

না। এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?" এর পরে তিনি মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-কিতাবের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে বললেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:২৫-২৭ আয়াত)

হযরত ঈসা তাঁদের বলেছিলেন *মসীহ্‌কে* কষ্টভোগ করতে ও মরতে হবে এবং আবার মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু হযরত ঈসা এসব বলেই কেবল ক্ষান্ত হন নি। তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব থেকে শুরু করেছিলেন। সেখানে তাঁর বিষয়ে যেসব কথা লেখা আছে তা তাঁদেরকে আবার বললেন এবং শিক্ষা দিলেন। তিনি এসব কিতাব থেকে ধাপের পর ধাপ এবং ঘটনার পর ঘটনা করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা কতই না মনোযোগ আকর্ষণকারী ছিল!

তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের কাছাকাছি আসলে পর ঈসা আরও দূরে যাবার ভাব দেখালেন। তখন তাঁরা খুব সাধাসাধি করে তাঁকে বললেন, "এখন বেলা গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। আপনি আমাদের সংগে থাকুন।" এতে তিনি তাঁদের সংগে থাকবার জন্য ঘরে ঢুকলেন। যখন তিনি তাঁদের সংগে খেতে বসলেন তখন রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা করে তাঁদের দিলেন। তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল; তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন, কিন্তু তার সংগে সংগেই তাঁকে আর দেখা গেল না।

তখন তাঁরা একে অন্যকে বললেন, "রাস্তায় যখন তিনি আমাদের সংগে কথা বলছিলেন এবং পাক-কিতাব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের অন্তর কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?" (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:২৮-৩২ আয়াত)

আল্লাহ্ নিজেই এই দু'জন উম্মতকে বুঝতে সাহায্য করেছিলেন। আর সেজন্যই তাঁরা এখন আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন!

তখনই সেই দু'জন উঠে জেরুজালেমে গেলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪ঃ৩৩ আয়াত)

তাঁরা কিভাবে আগ্রহ নিয়ে আবার জেরুজালেমে ফিরে এসেছিলেন তা কল্পনা করুন। তাঁরা অবশ্যই হযরত ঈসার দেওয়া শিক্ষা আনন্দের সাথে আলোচনা করেছিলেন। সেই এগারজন* সাহাবীর কাছে তাঁরা কিভাবে সব কথাগুলো বর্ণনা করবেন তাও আলোচনা করেছিলেন। তাঁদের যাত্রা ছিল পাহাড়ের উপরের দিকে। তাঁরা নিশ্চয় বড় বড় পা ফেলে উপরের দিকে উঠেছিলেন। তাঁদের কাছে খুবই ভাল খবর ছিল!

*সাহাবী এহুদা ইষ্কারিয়োৎ আত্মহত্যা করেছিলেন।

সেই এগারোজন (বিশেষ) উম্মত ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। হযরত ঈসা যে সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন তা নিয়ে তখন তাঁরা আলোচনা করছিলেন।

সেই দু'জন উম্মত রাস্তায় যা হয়েছিল তা তাঁদের জানালেন। তাঁরা আরও জানালেন, তিনি যখন রুটি টুকরা টুকরা করছিলেন তখন কেমন করে তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন।

সেই উম্মতেরা যখন এই কথা বলছিলেন তখন ঈসা নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবাইকে বললেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।"

তাঁরা ভূত দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন। ঈসা তাঁদের বললেন, "কেন তোমরা অস্থির হচ্ছ আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে? আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি। আমাকে ছুঁয়ে দেখ, কারণ ভূতের তো আমার মত হাড়-মাংস নেই।"

এই কথা বলে ঈসা তাঁর হাত ও পা তাঁদের দেখালেন। কিন্তু তাঁরা এত আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "তোমাদের এখানে কি কোন খাবার আছে?" তাঁরা তাঁকে এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তা নিয়ে তাঁদের সামনেই খেলেন।

তারপর তিনি তাঁদের বললেন, "আমি যখন তোমাদের সংগে ছিলাম তখন বলেছিলাম, ***মূসার তৌরাত শরীফে, নবীদের কিতাবে ও জবুর শরীফের মধ্যে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে তার সব পূর্ণ হতেই হবে।"*** *(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:৩৩-৪৪ আয়াত)*

ইম্মায়ূর পথে সেই দু'জন উম্মতের কাছে যেভাবে হযরত ঈসা পাক-কিতাবের কথাগুলো ব্যাখ্যা করেছিলেন সেভাবে তিনি তাঁর ১১জন সাহাবীর কাছেও নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ব্যাখ্যা করেছিলেন। হযরত ঈসা তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহ থেকে দেখিয়েছিলেন কিভাবে এসব কিতাব তাঁর সম্বন্ধে বলে।

পাক-কিতাব বুঝবার জন্য তিনি উম্মতদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাঁদের বললেন, "লেখা আছে, মসীহ্‌কে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। আরও লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।"

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:৪৫-৪৮ আয়াত)

পাক-কিতাবের কথা পূর্ণ করার জন্য যে তাঁর মৃত্যু, কবরপ্রাপ্তি ও পুনরুত্থান প্রয়োজনীয় ছিল তা হযরত ঈসা ব্যাখ্যা করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বলেছেন যে, এটা ছিল এমন সুসংবাদ, যে সংবাদ জেরুজালেম থেকে শুরু করে দুনিয়ার সব জায়গায় বলা হবে।

চলুন আমরা সৃষ্টির শুরুতে ফিরে যাই। তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহে তাঁর নিজের সম্বন্ধে হযরত ঈসা যা যা ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তা দেখতে চাই।

কেন হযরত ঈসা এই দুনিয়াতে এসেছিলেন? কেন তাঁকে কষ্টভোগ করতে ও মরতে হয়েছিল যদিও আবার তাঁর জীবিত হয়ে উঠার পরিকল্পনা ছিল।

কেন তিনি লোকদের বলেন নি শুধুই তাঁর উপর ঈমান আনতে? কেন তিনি ক্রুশের উপরকার মৃত্যু এড়িয়ে যান নি?

তাঁর মৃত্যু, কবরপ্রাপ্তি এবং পুনরুত্থানের অর্থ কি? এসবের বিষয়ে তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহে কি লেখা ছিল?

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমি ছবি মেলানোর ধাঁধার বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখন আমি ছবির শেষ টুকরাটি লাগাব। যখন আপনি এটি বুঝবেন তখন আপনি পুরো ছবিটি পেয়ে যাবেন।

২ শরীয়ত ও নবীগণ

-হযরত আদম থেকে নূহ নবী পর্যন্ত-

কেন হযরত ঈসাকে মরতে হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসের একেবারে প্রথম থেকে শুরু করব।

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া

সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যেকার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের কথা কি আপনার মনে আছে? মাবুদ আল্লাহ্ মানুষকে রোবট করে সৃষ্টি করেন নি, বরং একটি ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। যেভাবে একজন বাধ্য সন্তান তার বাবাকে সম্মান করে সেভাবে মানুষও বাধ্য হয়ে আল্লাহ্‌কে সম্মান দানের সিদ্ধান্ত নিতে পারত।

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া তাঁদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মহা রহমত লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের সব অভাব পূরণ করেছিলেন এবং তাঁদের দেখাশোনা করেছিলেন। আল্লাহ্ ও মানুষ ছিলেন খুব কাছের বন্ধু।

কিন্তু তারপরে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া নিজেদের ইচ্ছাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে অবাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনাকে ঘিরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর

মধ্যে ধাঁধার সেসব গুরুত্বপূর্ণ টুকরা পাওয়া যায়, যেসব টুকরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করে।

পাক-কিতাব বলে মানুষ ভাবত সে সবচেয়ে ভালটা জানে। তাই সে তার নিজের পথ বেছে নিয়েছিল। আর সেই পথই তাকে রূহানী অন্ধকারের দিকে পরিচালিত করেছিল। এভাবে মানুষ গুনাহে হারিয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র কথা না শুনে মানুষ শয়তানের কথা বিশ্বাস করেছিল এবং শয়তানের সাথে বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। এভাবে মানুষ আল্লাহ্‌র একজন শত্রুতে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু এই ধরনের সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ও মারাত্মক পরিণতি ছিল। পাক-কিতাব আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই গুনাহের দরুন অনেক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

যেখানে নির্ভরতা নেই সেখানে কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যেকার বিশেষ বন্ধুত্ব হঠাৎ করে শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু গুনাহ্‌ মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা করেছিল, তাই মানুষ তার নিখুঁত ও পবিত্র সৃষ্টিকর্তা-মালিকের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল। আল্লাহ্‌ আর কাছে রইলেন না। মনে হয়েছিল তিনি যেন খুব দূরে।

আল্লাহ্‌ যেমনটা পরোপকারী বন্ধু ছিলেন, শয়তান কিন্তু তেমন পরোপকারী বন্ধু ছিল না। মিথ্যা ও চাতুরী ব্যবহার করে সে মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণে কাজে লাগায় যাতে মানুষ তার ইচ্ছা পালন করে। এভাবে মানুষ শয়তান ও গুনাহের গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

নিজের পথ বেছে নেওয়ার দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিল। আর হযরত আদম ও সব লোকদের জন্য এর পরিণতি ছিল ক্ষতিকর। যখনই আমরা কোন শরীয়ত অমান্য করি তখন আমাদেরকে তার পরিণতি ভোগ করতে হয়।

তখন থেকে আল্লাহ্‌ আর মানুষের বন্ধু থাকলেন না বরং মানুষের বিচারক হয়ে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন মানুষ একটি দোষে দোষী, অর্থাৎ মানুষ তাঁর শরীয়ত অমান্য করে তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে।

কল্পনা করুন, এজন্য আল্লাহ্‌তা'লা একটি রায়, অর্থাৎ একটি ঋণপত্র লিখলেন। মানুষ এখন একজন দেনাদার, তাকে একটি মূল্য পরিশোধ করতে হবে। গুনাহের সেই বেতন ছিল মৃত্যু।

আর সেজন্যই প্রত্যেক লোক এখন দৈহিক ভাবে মারা যাবে। মানুষের রূহ্‌ শরীর থেকে *আলাদা হয়ে যাবে* এবং মানুষ পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব থেকে *আলাদা হয়ে যাবে*।

যেহেতু গুনাহের দুর্গন্ধ মানুষের সমগ্র সত্তাকে কলুষিত করেছিল, তাই আল্লাহ্‌ নিজেকে মানুষের কাছ থেকে আলাদা করলেন। মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক

শেষ হয়ে গিয়েছিল- এই সম্পর্ক হয়ে গেল মৃত।

শারীরিক মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় একটি মৃত্যুও হবে। আর সেই মৃত্যুর দরুন মানুষ চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে *আলাদা থাকবে*। মানুষ আর কখনও আল্লাহ্‌র মহব্বতের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে না। মানুষকে আগুনের হ্রদে বন্দী করে রাখা হবে। আল্লাহ্‌ এই আগুনের হ্রদ শয়তান ও তাঁর সংগীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন।

মৃত্যু মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। মৃত্যুর উপরে মানুষের কোন হাত নেই। মানুষ মরে যাওয়া বা না যাওয়া বেছে নিতে পারে না। সব মানুষকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। পাক-কিতাব বলে...

> *কিন্তু প্রত্যেককেই তার নিজের গুনাহের জন্য মরতে হবে।*
> *(নবীদের কিতাব, ২ খান্দাননামা ২৫:৪ আয়াত)*

উপরে যেসব শব্দের নীচে দাগ আছে, সেসব শব্দ থেকে আমরা এখন বুঝতে পারছি গুনাহের ফলে মানুষ এখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কত দূরে চলে গিয়েছে। তাই আমরা সেই একই পুরানো প্রশ্নের সম্মুখীন হইঃ **কেমন করে আমরা আমাদের গুনাহ্‌ এবং এর পরিণতি সমূহ থেকে মুক্ত হতে পারি? আমরা যাতে আল্লাহ্‌র সামনে যেতে পারি সেজন্য কিভাবে আমরা *আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার সমান ধার্মিকতা* অর্জন করতে পারি?**

একটা আপ্রাণ চেষ্টা

মনে করে দেখুন কিভাবে হযরত আদম ও বিবি হাওয়া তাঁদের গুনাহ্‌ ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা কয়েকটি ডুমুর পাতা দিয়ে নিজেদের জন্য পোশাক তৈরী করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্‌ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের ছেড়ে যান নি। বরং তিনি...

> *এমন ব্যবস্থা করেন যাতে দূর করে দেওয়া লোক তাঁর কাছ থেকে দূরে না থাকে।* *(নবীদের কিতাব, ২ শামুয়েল ১৪:১৪ আয়াত)*

এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ হযরত আদম ও বিবি হাওয়া সহ আমাদের সকলকে এমন সব মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, যেগুলো সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

গ্রহণীয়তা

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার সেই ডুমুর পাতার পোষাক যেভাবে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি, ঠিক একই ভাবে আমরাও আমাদের বাইরের আচরণ দিয়ে আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হতে পারি না। অন্যেরা আমাদের বাইরের দিকটা দেখতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌ই কেবল আমাদের দিলের খবর জানেন।

গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে আল্লাহ্‌তা'লা ভিন্ন একটি পথ দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে পাক-কিতাব বলে...

> *আদম ও তাঁর স্ত্রীর জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌ পশুর চামড়ার পোশাক তৈরী করে তাঁদের পরিয়ে দিলেন।* *(তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৩:২১ আয়াত)*

এই আয়াতটি আমরা সহজেই অবহেলা করতে পারি, কিন্তু কিতাবের অন্যান্য আয়াত এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করে। এই আয়াতটির আসল অর্থ কি? এ সম্বন্ধে হযরত ঈসা তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? নিশ্চয় তিনি বলেছিলেন গ্রহণযোগ্য কাপড় দিয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে ঢাকার জন্য। যেভাবে সেই পশুটিকে মরতে হয়েছিল *সেভাবে আমরা যাতে আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হতে পারি সেজন্য তাঁকে (ঈসাকে) মরতে হয়েছিল*। আমরা যাতে তাঁর সামনে যেতে পারি, সেজন্য এটাই ছিল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা।

হযরত ঈসা ঠিক কি বলছিলেন, তাঁর সাহাবীরা তা বুঝতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের অবশ্যই অনেক প্রশ্ন ছিল। যেমন-

কেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পছন্দনীয় পাতা দিয়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে ঢেকে দেন নি? কেন হযরত ঈসাকে আমাদের জন্য মরতে হয়েছিল? তাঁর মারা যাওয়া ছাড়া কি অন্য কোন পথ ছিল না? সম্ভবতঃ হযরত ঈসা পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়েই তাঁর কথা বলে গেলেন।

কাবিল ও হাবিল

আল্লাহ্‌র কাছে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার ছেলেদের আনা কোরবানীর কথা কি আপনার মনে আছে? কেন তারা তা করেছিল? আমরা দেখতে পাই যে, গুনাহ্‌গারদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌-পরিকল্পিত পথের দু'টি দিক ছিল। একটি দিক ছিল ভিতরগত, অর্থাৎ দিলের ব্যাপার। কাবিল ও হাবিলকে তাদের দিলের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত পছন্দ বেছে নিতে হয়েছিল। তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল তারা আল্লাহ্‌র কথায় ঈমান আনবে কিনা।

আরেকটি দিক ছিল বাহ্যিক অর্থাৎ আচার-ব্যবহারের ব্যাপার। এটা ছিল একটা ছবি। এই ছবি তাদেরকে বুঝতে সাহায্য করেছিল গুনাহ্‌ দূর করার জন্য কি দরকার হবে।

আমরা দেখেছিলাম কাবিল ও হাবিল দু'টি ভিন্ন ধরনের কোরবানী নিয়ে এসেছিল। কাবিল তার ক্ষেত থেকে শাক-সব্‌জি নিয়ে এসেছিল। আর হাবিল তার ভেড়ার পাল থেকে একটি ভেড়ার বাচ্চা এনেছিল। আল্লাহ্‌ কাবিলের কোরবানী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কিন্তু তিনি হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ কি ছিল?

কাবিল

দিলের মধ্যেঃ যদিও আল্লাহ্‌ যে আছেন, কাবিলের সেই বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা বলেছেন, সেই কথা সে তার ভিতরে অর্থাৎ দিলের মধ্যে বিশ্বাস করে নি।

আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য কাবিল যেভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেভাবে বর্তমানেও অনেক লোক নিজস্ব ধারণা ব্যবহার করে। কাবিল যেভাবে নিজের ধারণা সৃষ্টি করেছিল, সেভাবে বর্তমানেও লোকেরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে চায়।

আচার-ব্যবহারের মধ্যেঃ ঈমান ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক আছে। কাবিল বিশ্বাস করত তার নিজের পরিকল্পনা আরও ভাল। তাই সে শাক-সব্‌জি এনেছিল। গুনাহ্‌ ঢাকা দেবার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র যে পদ্ধতি, তাঁর কোরবানীটি তা প্রকাশ করে নি, কেননা শাক-সব্‌জি থেকে রক্ত বের হয় না। কাবিল এই সত্যটি অবহেলা করেছিল-

> *...রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ৯:২২ আয়াত)*

কাবিলের কোরবানী গুনাহের *ঢাকনীর* ব্যবস্থা করে নি। পাক-কিতাব আমাদের এই বলে সতর্ক করে দেয়...

> *সেইজন্য আমি বলছি, আমরা যেন কাবিলের মত না হই। কাবিল শয়তানের লোক ছিল... সে খারাপ কাজ করত, আর তার ভাই ন্যায় কাজ করত।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ ইউহোন্না ৩:১২ আয়াত)*

হাবিল

অন্যদিকে আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন। কী আশ্চর্য!

দিলের মধ্যেঃ হাবিল তাঁর নাজাতদাতা হিসাবে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিল। আল্লাহ্‌ এখনও চান লোকেরা যাতে তাঁর উপর ঈমান রাখে। পাক-কিতাব আমাদের বারবার বলে নাজাতদাতা হিসাবে আমাদেরকে ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনতে হবে।

আচার-ব্যবহারের মধ্যেঃ আল্লাহ্‌ হাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেছিলেন, কারণ সেই কোরবানী হযরত ঈসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র যে পরিকল্পনা, তা প্রকাশ করেছিল।

❖ **হাবিলের কোরবানীটি ছিল বদলী-মৃত্যুর ছবিঃ** হাবিলের জায়গায় একটা নিখুঁত পশু মরেছিল। সেভাবে নিষ্পাপ হযরত ঈসা আমাদের জন্য মারা গিয়েছিলেন। শাস্তি হিসাবে যে মৃত্যু আমাদের পাওনা ছিল, তা তিনিই পরিশোধ করেছিলেন।

> *মসীহ্‌ও গুনাহের জন্য একবারই মরেছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য সেই নির্দোষ লোকটি গুনাহ্‌গারদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য মরেছিলেন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ পিতর ৩:১৮ আয়াত)*

❖ **সেই কোরবানীটি ছিল গুনাহ্ ঢাকা দেওয়ার ছবিঃ** সৃষ্টির শুরু থেকেই অনেক জাতির লোকেরা রক্ত কোরবানীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বুঝতে পেরেছে। এখন আমরা এর কারণ বুঝতে পারি। হাবিলের গুনাহ্ ঢাকার জন্য যেভাবে একটি পশুর রক্ত ঝরেছিল সেভাবে আমাদের গুনাহ্ মাফের জন্য হযরত ঈসা চূড়ান্ত রক্ত-কোরবানী হিসাবে তাঁর নিজেকে দান করেছিলেন। আমাদের গুনাহের কারণে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু ক্রুশের উপরে হযরত ঈসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই ভাঙ্গা সম্পর্ক ঠিক হয়ে গিয়েছিল।

> *এক সময় তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে ছিলে এবং তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের মনে শত্রুভাব ছিল ... কিন্তু মসীহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর শরীরের দ্বারা আল্লাহ্ নিজের সঙ্গে এখন তোমাদের মিলিত করেছেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ১:২১,২২ আয়াত)*

হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার বংশধর হওয়ায় আমরাও আল্লাহ্‌র ***শত্রু*** হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, কিন্তু ক্রুশের উপরে হযরত ঈসার দৈহিক মৃত্যুর দরুন এখন আমরা আবার আল্লাহ্‌র সাথে *মিলিত হয়েছি*। আমরা আবার আল্লাহ্‌র বন্ধু হতে পারি। সেই ভগ্ন সম্পর্ক আমরা আবার ফিরে পেতে পারি।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারে, "হযরত ঈসার মৃত্যু যে আমাদের গুনাহ্ সমস্যার সমাধান করেছে তা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিভাবে আমরা আল্লাহ্‌র *ধার্মিকতার সমান ধার্মিকতা* লাভ করতে পারব?"

এই বইয়ের কয়েকটি অধ্যায় আগে আমি উল্লেখ করেছিলাম একটি মুদ্রার দু'পিঠের মত এই প্রশ্নটিরও দু'টি অংশ আছে। যখন আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ সমস্যার সমাধান করেছিলেন তখন তিনি এও নির্দেশ করেছিলেন যে, আমাদের মধ্যে ধার্মিকতারও অভাব আছে। পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠা থেকে আমরা এই বিষয়টি আরও ভাল করে বুঝতে পারব।

হযরত নূহ

নূহ নবীর সময়কালে লোকেরা আল্লাহ্‌র কালাম উপেক্ষা করেছিল। হয়ত তারা চিন্তা করেছিল নূহ নবী ছিলেন পাগল। তারা সেই সময়কালের উপর মনোযোগ দিয়েছিল, কিন্তু ভবিষ্যতের শাস্তির বিষয়ে চিন্তা করতে চায় নি। তাদের ভুল চিন্তা-ভাবনার দরুন আল্লাহ্ তাদের বিচার করতে পিছ্‌পা হন নি। তারা তাদের বোকামীর দরুন মারা গিয়েছিল।

আমরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দেখতে পাইঃ যেভাবে গুনাহের দরুন নূহ নবীর সময়কার লোকদের বিচার হয়েছিল, একই ভাবে মানুষ যা-ই চিন্তা করুক না কেন, আল্লাহ্ সব লোকদের বিচার করবেন।

> *যাদের বিবেক অসাড় তারা ভাবে "আল্লাহ্ বলে কেউ নেই।"*
> *(জবুর শরীফ ১৪:১; ৫৩:১ আয়াত)*

যে নিজের জ্ঞানের উপর ভরসা করে সে বিবেচনাহীন।
(নবীদের কিতাব, মেসাল ২৮:২৬ আয়াত)

আমরা আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করতে পারি; এমনকি তাঁর পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করতে পারি। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাদেরকে এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবেঃ আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই নিজেদের অনন্ত মৃত্যু দিয়ে আমাদের গুনাহ্‌ ঋণ শোধ করতে হবে।

স্মরণ করুন কিভাবে নূহ নবী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা সেই জাহাজের মধ্যে নিরাপদে ছিলেন? শুধু একটি মাত্র জাহাজ ছিল। তাঁরা যাতে ঢুকতে এবং বন্যা থেকে আশ্রয় পেতে পারে সেজন্য শুধু একটি মাত্র দরজা ছিল। আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

একই ভাবে হযরত ঈসা মসীহ্‌ই অনন্ত জীবনের একমাত্র পথ।

হযরত ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।"
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৪:৬ আয়াত)

ঠিক যেভাবে কেবল সেই জাহাজের মধ্যেই নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব ছিল, একই ভাবে কেবল হযরত ঈসার মধ্যেই আমরা অনন্ত শাস্তি থেকে নিরাপত্তা খুঁজে পেতে পারি।

যারা মসীহ্‌ ঈসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না। *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৮:১ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার পথ মাত্র একটাই আছে। যারা *সেই পথকে* অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করে তাদের পরিণতিও আসন্ন বন্যা সম্বন্ধে নূহ নবীর সতর্কবাণীতে কান না দেওয়া লোকদের মতই হবে। আর সেই পরিণতি মানে হল রূহানী, শারীরিক ও অনন্ত মৃত্যু এবং সেই মৃত্যুর সাথে যুক্ত বিভিন্ন ভয়ানক বিষয়। পাক-কিতাব এ ব্যাপারে খুবই পরিষ্কার। হযরত ঈসাই হলেন আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ।

ব্যাবিল

ব্যাবিল ছিল সংগঠিত *ধর্মের* প্রথম দৃষ্টান্ত। আকাশে পৌঁছার জন্য লোকেরা একটি উঁচু ঘর নির্মাণ করার চেষ্টা করেছিল। ধর্মের সংজ্ঞায় আমরা পেয়েছি যে, *ধর্ম* হল *আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছার জন্য মানুষের বিভিন্ন প্রচেষ্টা*। ব্যাবিলে সেই উঁচু ঘর তৈরী করার জন্য মানুষ ইট ও আলকাতরা ব্যবহার করেছিল এবং খেটে চলেছিল। *ধর্ম* চায় মানুষ যাতে ধর্মের লক্ষ্য অর্জনে কঠোর পরিশ্রম করে। আল্লাহ্‌, দেব-দেবী, ফেরেশতা, সাধু-দরবেশ বা প্রতিমাদের সন্তুষ্ট করার জন্য যাতে মানুষ আরও বেশী কঠোর কাজ করে। এটা ধর্মের দাবী, যে দাবী সব সময়ই বেড়ে চলছে।

ধর্মের সাথে তুলনায় কিতাবুল মোকাদ্দস বলে মাবুদ নিজেই তাঁর কাছে যাওয়ার সেই একমাত্র পথটির ব্যবস্থা করেছিলেন যখন তিনি মানুষকে মেহেরবানি করে ঈসা মসীহ্ নাম ধারণ করে এই দুনিয়াতে নেমে এসেছিলেন। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যেকার ভাঙ্গা সম্পর্ক ঠিক করার জন্য যা যা করা দরকার ছিল, ক্রুশের উপরে হযরত ঈসা তার সবই করেছিলেন।

আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার বিষয়ে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস হযরত ঈসার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল। সাহাবীরা যখন সেই কথা ঈসার মুখ থেকে শুনেছিলেন, তখন অবশ্যই আনন্দে তাঁদের চোখ-মুখ ঝলমল করেছিল। শত শত বছর ধরে মানুষ গুনাহের বিচারের হাত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আসছিল। আর এখন সেই সময়টি এসেছে। কিন্তু হযরত ঈসা আরও বেশী ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে হযরত ইব্রাহিমের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

৩ শরীয়ত ও নবীগণ

-হযরত ইব্রাহিম থেকে শরীয়ত দেওয়া পর্যন্ত-

সেই সাহাবী ও উম্মতেরা অবশ্যই আগ্রহভরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। স্মরণ করুন, আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমকে বলেছিলেন মোরিয়া পাহাড়ের উপরে তাঁর ছেলেকে কোরবানী করার জন্য। ছেলেটি মরতে যাচ্ছিল। সে মরার যোগ্য ছিল, কারণ সে ছিল গুনাহ্‌গার। হযরত ইব্রাহিম তাঁর ছেলেকে বাঁধলেন এবং তাঁকে কোরবান-গাহ্‌র উপর রাখলেন। সে সময় সেই ছেলেটি ছিল একেবারে অসহায়।

একজন অসহায় গুনাহ্‌গার

এখানটায় আল্লাহ্ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি প্রকাশ করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিমের ছেলেটি যেমন অসহায় ছিল এবং নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে অক্ষম ছিল, তেমনি আমরা সকলেও আমাদের গুনাহ্ দ্বারা বাঁধা। আমরা আমাদের নিজেদেরকে গুনাহের শাস্তি থেকে নাজাত দান করতে পারি না।

হযরত ইব্রাহিম একটি ছুরি নিলেন এবং তাঁর ছেলেকে কোরবানী করার জন্য প্রস্তুত হলেন। আল্লাহ্ যে এই মৃত্যুর সমাধান দান করবেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তার উপরে তাঁর ঈমান ছিল। শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে ডাক দিয়ে তাঁকে থামালেন। যেহেতু হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছিলেন তাই মাবুদ নিজেই ইব্রাহিমের সন্তানের জায়গায় একটি *বদলী কোরবানী* যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

উপযুক্ত বদলী

পাক-কিতাব বলে হযরত ইব্রাহিম সেই পাহাড়ের নাম দিলেন *“মাবুদ যোগান।”* কেউ হয়ত চিন্তা করতে পারে যে, হযরত ইব্রাহিম সেই পাহাড়ের নাম রাখতে পারতেন *“মাবুদ যুগিয়ে দিয়েছেন।”* কিন্তু তিনি তা না রেখে নাম দিয়েছিলেন *“মাবুদ যোগান।”* মনে হয় যেন হযরত ইব্রাহিম ভবিষ্যতের এমন একটি সময়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যখন আরেকটি কোরবানী করা হবে, যে কোরবানীটি দুনিয়ার সব লোকদের জন্য নাজাতের *ব্যবস্থা করবে*। হযরত ঈসা মসীহ্ দুই হাজার বছর পরে সেই একই পাহাড়ে হযরত ইব্রাহিমের ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং নিখুঁত কোরবানী হিসাবে তাঁর জীবন দান করেছিলেন।

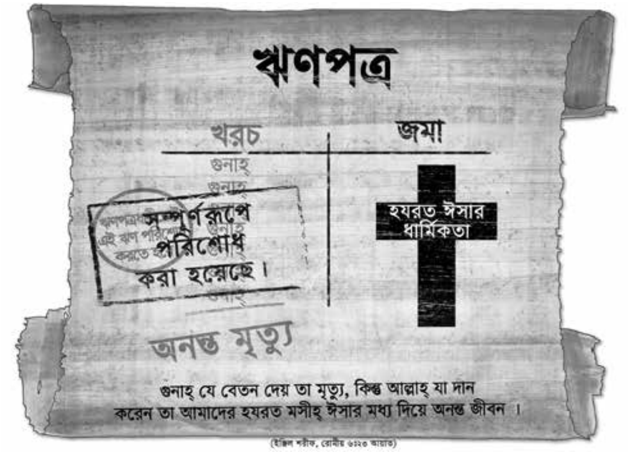

হযরত ইব্রাহিমের ছেলের জায়গায় যেভাবে সেই ভেড়াটা মারা গিয়েছিল, একই ভাবে *আমাদের জায়গায় হযরত ঈসা মরেছিলেন*। আমাদের গুনাহের দরুন আমাদেরই শাস্তি পাওয়া ও মরা উচিত ছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে হযরত ঈসা আমাদের শাস্তি নিয়েছিলেন এবং ক্রুশের উপরে মারা গিয়েছিলেন। তিনিই *আমাদের* বদলী।

যদি সেই ভেড়াটি মারা না যেত তাহলে হযরত ইব্রাহিমের ছেলেকে মরতে হত। একই ভাবে যদি হযরত ঈসা মারা না যেতেন তাহলে আমাদেরকেই *নিজেদের* গুনাহ্-ঋণ পরিশোধ করতে হত।

প্রত্যেক লোকেরই একটি *“ঋণপত্র”* আছে। এটা খুবই বড় একটি গুনাহ্ ঋণ, যা প্রত্যেককে পরিশোধ করতে হবে। আর সেই ঋণ প্রত্যেকের অনন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়েই কেবল পরিশোধ করা যায় বা যেতে পারে।

কিন্তু হযরত ঈসার আগমন হল। ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যু মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব গুনাহ্-ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছে। সেইজন্যই

তিনি মারা যাওয়ার ঠিক আগে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, "শেষ হয়েছে।" অর্থাৎ পুরো মানব জাতির সেই ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে!

কিন্তু হযরত ঈসা দ্বারা পরিশোধিত সেই মূল্য শুধু তখনই কার্যকর হয়, যদি একজন লোক হযরত ইব্রাহিমের মত ঈমান আনে।

একটি ব্যক্তিগত ঈমান

পাক-কিতাব বলে আল্লাহ্ হযরত ইব্রাহিমের ঈমানকে সম্মান দান করেছিলেন।

> *"ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র কথার উপর ঈমান আনলেন আর সেইজন্য আল্লাহ্ তাঁকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৪:৩ আয়াত)*

আল্লাহ্ জানতেন হযরত ঈসা আমাদের গুনাহের জন্য ক্রুশের উপরে মারা যাবেন। আর সেই ভবিষ্যতের কাজের দরুন তিনি হযরত ইব্রাহিমকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছিলেন। পাক-কিতাব বলে...

> *এইজন্যই ইব্রাহিমের ঈমানের দরুন তাঁকে ধার্মিক বলে ধরা হয়েছিল। "ধার্মিক বলে ধরা হয়েছিল," এই কথাটা* ***কেবল ইব্রাহিমকেই লক্ষ্য করে লেখা হয় নি, আমাদেরও লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে।*** *আমাদের ঈমানের জন্য আল্লাহ্ আমাদেরও ধার্মিক বলে ধরবেন, কারণ যিনি আমাদের হযরত ঈসাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছিলেন আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি।* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৪:২২,২৩,২৪ আয়াত)*

মনে করে দেখুন, পাক-কিতাবে ব্যবহৃত 'ঈমান আনা' শব্দটিকে মাঝে মাঝে আমরা যে অর্থ দান করি, তার চেয়েও এই শব্দটির আরও পূর্ণ অর্থ আছে। যেমন-

- *ঈমান, বিশ্বাস, নির্ভরতা, ভরসা বা আশ্বাস* শব্দগুলো একই অর্থবোধক।
- সত্যিকারের ঈমান *সত্যের* উপর প্রতিষ্ঠিত। (এরকম একটা সত্যের উদাহরণ হল "হযরত ঈসা আমাদের গুনাহের জন্য আমাদের জায়গায় মরেছিলেন")। আমরা আমাদের গুনাহের মাফ *পেয়েছি,* এ ধরনের কোন অনুভূতির উপরে ঈমান প্রতিষ্ঠিত নয়।
- সত্যের সাথে মনের দিক দিয়ে একমত হলেই সত্যিকারের ঈমান থেমে থাকে না। আমরা আমাদের দিলের মধ্যে নিজেদের গুনাহ্ থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য ঈমান সহকারে হযরত ঈসার উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিই। উদাহরণ স্বরূপঃ ("***আমি*** ঈমান আনছি যে, হযরত ঈসা ***আমার*** গুনাহ্-ঋণ শোধ করেছেন।")

সাহাবী ও উম্মতদের জন্য এটা কতই না সুসংবাদের বিষয় ছিল! এটা আমাদের জন্যও সুসংবাদ। আল্লাহ্‌র কালাম বলে...

পাক-কিতাবে যা কিছু আগে লেখা হয়েছিল তা আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল, যাতে আমরা ধৈর্য ও উৎসাহ লাভ করি এবং তার ফলে আশ্বাস পাই। *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ১৫:৪ আয়াত)*

সেই সাহাবী ও উম্মতেরা হযরত ইব্রাহিমের ঈমান ও কোরবানীর বিষয়ে জানতেন। যদিও তাঁরা ছোটবেলায় এসব গল্প শুনেছিলেন, কিন্তু এখন আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তাঁরা বিভিন্ন ঘটনা বুঝছেন। সকলেই হযরত ঈসা কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন তিনিই সেই ***"ওয়াদা-করা নাজাতদাতা।"***

উদ্ধার-ঈদ

যখন বনি-ইসরাইল জাতি মিসরের গোলাম ছিল তখন মিসরের উপর বিভিন্ন ভয়ানক গজব পাঠানোর দ্বারা আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করেছিলেন। শেষ গজবটি ছিল প্রথম সন্তানের মৃত্যু। আল্লাহ্ বলেছিলেন যদি ইসরাইলীয়রা তাঁর কথামত চলে, তাহলে তারা সেই গজবের হাত থেকে মুক্ত থাকবে।

আপনার কি মনে আছে কিভাবে বনি-ইসরাইলদেরকে ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী দিতে হয়েছিল? মনে করে দেখুন পাক-কিতাব বলে হযরত ঈসাই আমাদের জন্য ভেড়ার বাচ্চা।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, জন্মের সময় হযরত ঈসার চারপাশে ভেড়া ছিল, কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল গোয়াল-ঘরে সেখানে ভেড়ার বাচ্চাও ছিল। তাঁর জন্মের সময় যে লোকেরা প্রথমে তাঁকে দেখতে এসেছিল, তারা ছিল রাখাল। এই লোকেরা ভেড়াদের দেখাশোনা করত। ধর্মীয় ইতিহাস অধ্যয়নকারী কিছু কিছু লোক জানতে পেরেছে যে, বেথেলহামে যেখানে হযরত ঈসার জন্ম হয়েছিল সেখানকার রাখালদের দায়িত্ব ছিল ভিন্ন ধরনের। তাদের ভেড়ার বাচ্চাগুলো এবাদতখানার বিভিন্ন কোরবানীতে ব্যবহার করা হত। হযরত ঈসার বিষয়ে তরিকাবন্দীদাতা হযরত ইয়াহিয়া এই কথাগুলো বলেছিলেন-

"ঐ দেখ আল্লাহ্‌র ভেড়ার বাচ্চা, যিনি মানুষের সমস্ত গুনাহ্ দূর করেন।"
(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:২৯ আয়াত)

তাই যখন আমরা উদ্ধার-ঈদের ভেড়া আর হযরত ঈসার মধ্যে মিল দেখতে পাব, তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই তুলনাগুলোর কথা চিন্তা করুনঃ

*উদ্ধার-ঈদের সময়কার ভেড়াটির খুঁত ছিল না।

তেমনি হযরত ঈসা ছিলেন *নিষ্পাপ*।

*ভেড়াটিকে হতে হত একটি পুরুষ *ভেড়া*।

হযরত ঈসাও ছিলেন একজন *পুরুষ* মানুষ।

*উদ্ধার-ঈদের ভেড়াটি প্রথমজাত সন্তানের জায়গায় মরেছিল।

হযরত ঈসা *আমাদের জায়গায়* মরেছিলেন।

*সেই ভেড়ার রক্ত ঘরের দরজার চৌকাঠে লাগাতে হয়েছিল।

হযরত মূসার নির্দেশ অনুসারে ঘরের ভিতরে থাকার দরুন বনি-ইসরাইলরা যেমন রক্ষা পেয়েছিল, সেভাবে হযরত ঈসা ক্রুশের উপর যা করেছিলেন, তার উপর ঈমান আনার দ্বারা আমরাও অনন্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাই।

*মৃত্যুদূত এসে রক্ত লাগানো *ঘর বাদ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন*, কারণ সেই ভেড়ার বাচ্চাটি এরই মধ্যে প্রথমজাত সন্তানের শাস্তি গ্রহণ করেছিল।

একই ভাবে আল্লাহ্‌র শাস্তি যাতে আমাদের বাদ দিয়ে যায়, সেজন্য তিনি ঈসার রক্তের মধ্য দিয়ে একটি পথের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত ঈসা ক্রুশের উপরে মরে আমাদের পাওনা সব গজব বা শাস্তি গ্রহণ করেছেন।

সেই উদ্ধার-ঈদের রাতে আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদের বলেছিলেন সেই ভেড়াটির হাড় না ভাঙ্গার জন্য। এটা বলা হয়েছিল, কারণ সেই ভেড়াটি ছিল হযরত ঈসার ছবি। ক্রুশের উপরে হযরত ঈসার হাড়গুলোও ভাঙ্গা হয় নি। রোমীয় সৈন্যরা...

ঈসার কাছে এসে... তাঁকে মৃত দেখে তাঁর পা ভাঙল না।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৯:৩৩ আয়াত)

সাহাবী ও উম্মতেরা হযরত ঈসার শিক্ষা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এখন তাঁরা উদ্ধার-ঈদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা অবশ্যই বুঝেছিলেন যে, উদ্ধার-ঈদের ভেড়া যেদিনে কোরবানী করা হয়েছে, সেই একই উদ্ধার-ঈদের

সময়ই ক্রুশের উপর হযরত ঈসা মারা গিয়েছিলেন। উদ্ধার-ঈদ শেষ হওয়ার পরেই যে ইহুদী ইমামেরা হযরত ঈসাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেকথা সাহাবী ও উম্মতেরা জানতেন না; কিন্তু এখন তাঁরা জানতে পারলেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়েছে। হযরত ঈসা যে শুধুমাত্র সঠিক দিনেই মারা গিয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু সঠিক সময়েও [দুপুর তিনটায়] মারা গেলেন। এই সময়টাতেই এবাদতখানায় ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করা হত। এটাই ছিল বৈকালীন কোরবানীর সময়। **যেভাবে তিনি মারা যাবেন বলে নবীরা বলেছিলেন**[১] সেভাবেই সঠিক সময়ে হযরত ঈসার মৃত্যু হয়েছিল। পাক-কিতাব বলে...

> *"আমাদের উদ্ধার-ঈদের ভেড়ার বাচ্চা মসীহ্‌কে কোরবানী দেওয়া হয়েছে।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ করিন্থীয় ৫:৭ আয়াত)*

শরীয়ত

আপনার কি সেই বিশেষ দশটি হুকুমের কথা মনে আছে? বনি-ইসরাইলরা চিন্তা করেছিল তারা সহজেই সেগুলো পালন করতে পারবে। বর্তমানেও অনেক লোক বিশ্বাস করে সেই দশটি বিশেষ হুকুম পালন করলে আল্লাহ্ খুশী হবেন। কিন্তু আমরা জানি আল্লাহ্‌পাক শুধুমাত্র পূর্ণ ও নিখুঁত বাধ্যতা চান।

> *যে লোক সমস্ত শরীয়ত পালন করেও মাত্র একটা বিষয়ে গুনাহ্ করে সে সমস্ত শরীয়ত অমান্য করেছে বলতে হবে।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইয়াকুব ২:১০ আয়াত)*

> *আমি তোমাদের বলছি, আলেম ও ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে তোমাদের যদি বেশী কিছু না থাকে তবে তোমরা কোনমতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না* *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:২০ আয়াত)*

আদন বাগানে মানুষের অবাধ্যতার দরুন মানবজাতির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেউ দশটি বিশেষ হুকুম মেনে চলার চেষ্টা করলেও আল্লাহ্‌র সাথে ভগ্ন হওয়া সেই সম্পর্ক আর ফিরে আসবে না।

> *শরীয়ত পালন করলেই যে আল্লাহ্ মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন তা নয়, কিন্তু শরীয়তের মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের গুনাহের বিষয়ে চেতনা লাভ করে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২০ আয়াত)*

শরীয়ত আমাদেরকে আমাদের উভয় সংকটের কথা মনে করিয়ে দেয়। *আমাদের যা আছে (অর্থাৎ **গুনাহ্**), আমরা তা চাই না,* আবার *আমাদের যা দরকার (অর্থাৎ **ধার্মিকতা**), তা আমাদের নেই*। দশটি বিশেষ হুকুম আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমান ধার্মিকতা দান করতে পারে না। হযরত ঈসা নিজেও শরীয়তকে অগ্রাহ্য করেন নি। তিনি বলেছেন...

"এই কথা মনে কোরো না, আমি তৌরাত কিতাব আর নবীদের কিতাব বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি।" *(ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:১৭ আয়াত)*

হযরত ঈসা এমন কিছু করেছিলেন যা আমরা করতে পারি না। তিনি নিখুঁত ভাবে শরীয়ত মেনে চলেছিলেন। তারপরে তিনি মানুষের কাছে একটি ভিন্ন ধরনের ধার্মিকতা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই ধার্মিকতা শরীয়ত থেকে আসে না; বরং তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে।

আল্লাহ্‌ মানুষকে এখন শরীয়ত ছাড়াই কেমন করে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তৌরাত শরীফ ও নবীদের কিতাব সেই বিষয়ে সাক্ষি দিয়ে গেছেন। যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২১,২২ আয়াত)*

পাক-কিতাব বলে এই ধরনের ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে তা হল "ঈমান আনা।" এটা সেরকম সহজ একটি বিষয়। আমাদের জন্য সহজ, কিন্তু এর জন্য আল্লাহ্‌কে অনেক কাজ করতে হয়েছিল।

আল্লাহ্‌ পবিত্র ও ন্যায়বান। তিনি গুনাহ্‌ উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি এমন ভান করতে পারেন না যে, কোন গুনাহ্‌ কাজই সংঘটিত হয় নি বা সেই মানুষটি "শুধু একটি ভুল করেছে মাত্র।" গুনাহের শাস্তি হতেই হবে। গুনাহের শাস্তি মৃত্যু। ক্রুশের উপর হযরত ঈসার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত গুনাহের মূল্য হিসাবে মানুষ পশু কোরবানী দিয়ে আসছিল। কিন্তু সেই পশু কোরবানী ছিল শুধু অস্থায়ী একটা ঢাকনা মাত্র, কারণ...

ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত কখনই গুনাহ্‌ দূর করতে পারে না।
(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:৪ আয়াত)

এই সমস্যার কি সমাধান ছিল না? হ্যাঁ, ছিল। নিঃস্বার্থ মহব্বতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্‌ হযরত ঈসা রূপে এসেছিলেন।

"আল্লাহ্‌ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য হযরত ঈসা তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন-কোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্‌ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান।" *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২৫ আয়াত)*

গুনাহের জন্য মূল্য হিসাবে ক্রুশের উপরে হযরত ঈসার মৃত্যু আল্লাহ্‌র ন্যায় স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট করেছিল। আল্লাহ্‌ পূর্বের গুনাহ্‌ সমূহের শাস্তি দেন নি, কারণ তিনি জানতেন ভবিষ্যতে হযরত ঈসা সব গুনাহের জন্য মারা

যাবেন এবং সম্পূর্ণরূপে মৃত্যুর শাস্তি পরিশোধ করবেন। হযরত ঈসা মারা গিয়েছিলেন যাতে-

> *প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২৬ আয়াত)*

নির্দোষ বলে গ্রহণ

'নির্দোষ বলে গ্রহণ' কথাটি বিচার কাজে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যার অর্থ "নির্দোষ বলে ঘোষণা।" হযরত ঈসার সময়ে এই শব্দটি আদালতে ব্যবহার করা হত। যখন হযরত আদম সেই বাগানে গুনাহ্ করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ আর মানুষের বন্ধু রইলেন না, তিনি মানুষের বিচারক হয়ে গেলেন। একজন ন্যায়বান বিচারক হিসাবে তিনি দেখতে পেলেন মানুষ ***দোষী***, কারণ মানুষ তাঁর নিখুঁত শরীয়ত অমান্য করেছে। মানুষ পবিত্র আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে। সেই ন্যায়বান বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ চিরকালের জন্য শরীয়ত ভঙ্গকারী হিসাবে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, যা থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। আর এর শাস্তি ছিল মৃত্যু, অর্থাৎ অনন্ত মৃত্যু।

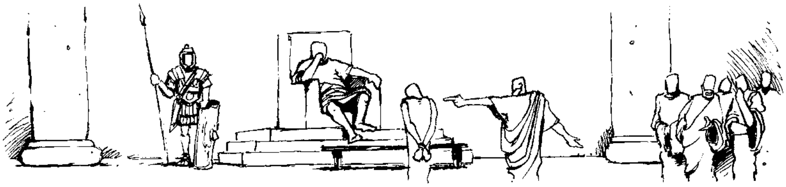

যদিও মানুষ ছিল অসহায় গুনাহ্গার, তবুও আল্লাহ্ মানুষের সাথে আবার বন্ধুত্ব ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। আর তাই তিনি এই দুনিয়াতে বিচারক হিসাবে নয়, বরং বন্ধু হিসাবে এসেছিলেন। ইব্‌নুল্লাহ্, অর্থাৎ সেই অনন্ত কালাম ঈসা ১০০% আল্লাহ্ ও ১০০% মানুষ হয়ে এই দুনিয়াতে আসলেন। কল্পনা করুন, হযরত ঈসা বিচারকের বেঞ্চের সামনে আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের গুনাহের শাস্তি নিজের উপর নিয়ে তা পরিশোধ করাই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি নিজের গুনাহের দরুন মরেন নি, কারণ তাঁর মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না। তাই বদলী হিসাবে দোষী লোকদের জন্য মরা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।[২] তিনি আমাদের জন্য মরেছিলেন। এভাবে তিনি সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য গুনাহের দণ্ড পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গুনাহ্ চলে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরও আমাদের ধার্মিকতা বা পবিত্রতার দরকার ছিল। আমরা আগে দেখেছি যে, হযরত ইব্রাহিমের মত আমরাও ঈমান দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করি। কিন্তু সেই নিখুঁততা দান করার জন্য আল্লাহ্‌র আদালত-কক্ষে কিছু একটা ঘটাতে হয়েছিল। হযরত ঈসা যে তাঁর উপরে আমাদের গুনাহের

নোংরা কাপড়গুলো জড়িয়েছিলেন, কেবল তা-ই নয়; তিনি এর চেয়ে আরও মহান আশ্চর্য কাজ করেছিলেন। তিনি আমাদের মত গুনাহ্‌গার মানুষকে *তাঁর* ধার্মিকতার খাঁটি ও পরিষ্কার কাপড়ে সম্পূর্ণভাবে জড়ালেন। তাই এখন *আমরা ধার্মিকতার এমন স্তরে আছি, যে ধার্মিকতা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র পবিত্রতার সমান*।

তাই এখন সেই ন্যায়বিচারক আল্লাহ্‌ যখন মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখতে পান একজন লোক মসীহের পবিত্রতা দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, তখন তিনি ন্যায্য ভাবে বলতে পারেন, *"আমার বিচারের সামনে দাঁড়ানো এই পুরুষ বা মহিলাটি নির্দোষ।"* সর্বশক্তিমান ন্যায়বিচারক বেহেশতী আল্লাহ্‌ তখন আমাদেরকে "ধার্মিক!" বলে ঘোষণা দেন।

ধার্মিক বলে ঘোষণা

'ধার্মিক বলে ঘোষণা' শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌ একজন লোককে নির্দোষ বলে দেখেন ও গ্রহণ করেন। কিন্তু মনে রাখুন, শুধুমাত্র হযরত ঈসার উপর ঈমান-আনা লোকদেরকেই ধার্মিক বলে ঘোষণা করা হয়। পাক-কিতাব বলে-

> *আল্লাহ্‌ মানুষকে তার ঈমানের জন্য ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন...*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২৮ আয়াত)*

> *ঈমানের মধ্য দিয়েই আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে আর তার ফলেই হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ ও আমাদের মধ্যে শান্তি হয়েছে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৫:১ আয়াত)*

না, দশটি বিশেষ হুকুম পালন একজন মানুষকে ধার্মিক করতে পারে না।

> *শরীয়ত পালন করবার জন্য আল্লাহ্‌ কাউকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন না।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৩:১১ আয়াত)*

> *কারণ সবাই গুনাহ্‌ করেছে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৩:২৩ আয়াত)*

কিন্তু শরীয়ত দানের পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে সেই দশটি বিশেষ হুকুম হল একজন ওস্তাদের মত। কল্পনা করুন, এই ওস্তাদই আমাদের হাত ধরেন, আমাদেরকে হযরত ঈসার ক্রুশের কাছে নিয়ে যান এবং আমাদের যে একজন নাজাতদাতা দরকার তা দেখিয়ে দেন।

> *মসীহের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই শরীয়তই আমাদের পরিচালনাকারী, যেন ঈমানের মধ্য দিয়ে আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়।* *(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৩:২৪ আয়াত)*

প্রত্যেকেরই একজন নাজাতদাতা প্রয়োজন। মসীহের ধার্মিকতাকে কাপড়ের মত পরিধান করেই কেবল আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আসতে পারি।

মহব্বত এবং ন্যায়বিচার

ইম্মায়ূ গ্রামের পথে হযরত ঈসা দু'জন উম্মতকে বলেছিলেন তাঁকে মরতে *হয়েছিল*। *হযরত ঈসাকে যে মরতে হয়েছিল,* সেকথা আমাদের স্বস্তি দেয় না। আমরা জানি আমরা এ ধরনের মহব্বত পাবার যোগ্য নই। কেন হযরত ঈসা একথা বলেছিলেন? হযরত ঈসার মৃত্যু দরকার ছিল এই জন্য-

১। যদি আল্লাহ্‌ শুধু তাঁর স্বভাবের *ন্যায়* দিককেই নিয়ন্ত্রণ দান করতে দিতেন তাহলে আমাদেরকে আমাদের নিজেদের গুনাহের জন্যই মরতে হত। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ হয়ত ন্যায্য কাজ হত, কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত তা হতে দিত না।

২। আবার যদি *মহব্বতই* শুধুমাত্র তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত, তাহলে তিনি চিরকালের জন্য গুনাহ্‌ উপেক্ষা করতেন। কিন্তু তাঁর ন্যায় স্বভাবের দরুন গুনাহ্‌ উপেক্ষা করার কোন উপায় তাঁর ছিল না। গুনাহের ব্যাপারে অবশ্যই কিছু একটা করতে হবে।

মসীহের মৃত্যুর মধ্যে আমরা আল্লাহ্‌র এই উভয় গুণের পরিপূর্ণ ও নিখুঁত ভারসাম্য দেখতে পাই। আল্লাহ্‌র অসীম মহব্বত প্রকাশিত এবং তাঁর পবিত্র ন্যায়বিচার পরিতৃপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ন্যায়বিচারের দরুন হযরত ঈসার ক্রুশীয় মৃত্যু প্রয়োজন ছিল।

> *কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত আর কারও নেই।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৫:১৩ আয়াত)*

> *কিন্তু আল্লাহ্‌ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৫:৮ আয়াত)*

আমরা মানুষেরা এধরনের মহব্বতের কথা বুঝতে পারি না। সৃষ্টিকর্তার পক্ষে একদিকে আল্লাহ্‌ থাকা, আবার তাঁর সৃষ্টির জন্য সহানুভূতি দেখিয়ে মানুষ হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা আমাদের বুঝবার জ্ঞানের বাইরে। এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার! আল্লাহ্‌র পথ এবং আমরা আমাদের বুঝবার জ্ঞানের পথের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য আছে। আমরা শুধু নম্রভাবে আল্লাহ্‌র কালামের উপর ঈমান আনতে এবং বিবি মরিয়মের মত বলতে পারি, *"এটা কিভাবে হতে পারে?"* এবং *"আল্লাহ্‌র কাছে অসম্ভব বলে কিছুই নেই।"* আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত হওয়া।

4 শরীয়ত ও নবীগণ

-আবাস-তাম্বু থেকে ব্রোঞ্জের সাপ পর্যন্ত-

আল্লাহ্ যে হযরত মূসাকে একটা আবাস-তাম্বু তৈরী করতে বলেছিলেন, সেকথা কি আপনার মনে আছে? সেই আবাস-তাম্বুর প্রত্যেকটি অংশ ছিল এমন বড় ছবি যা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করে। তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক পুনরায় ঠিক করার ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনা ছিল। দিনের বেলায় মেঘের থাম এবং রাতে আগুনের থাম ব্যবহার করে আল্লাহ্ দেখিয়েছিলেন তিনি তাদের সাথে সাথে আছেন। যখন তারা থেমেছিল তখন সেই মেঘ শাহাদাত-সিন্দুক ও মহা-পবিত্র স্থানের উপরে ভেসেছিল। আল্লাহ্‌র মহিমা পুরো জায়গাটা পূর্ণ করেছিল।

পাক-কিতাব শিক্ষা দেয় যে, আবাস-তাম্বু ও আল্লাহ্‌র মহিমার মেঘের মধ্যে যে প্রতীকী অর্থ লুকায়িত ছিল, হযরত ঈসা তা পরিপূর্ণ করেছিলেন। স্মরণ করে দেখুন, হযরত ঈসার অন্যতম একটি নাম হল-

> *"ইম্মানূয়েল। এই নামের মানে হল, আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্।"*
> *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৭:১৪; ইঞ্জিল শরীফ, মথি ১:২৩ আয়াত)*

ঠিক যেভাবে আল্লাহ্‌র মহিমা মহা-পবিত্র স্থানকে পূর্ণ করেছিল সেভাবে তাঁর মহিমা হযরত ঈসাকে পূর্ণ করেছিল। একবার যে হযরত ঈসা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে তিনজনকে নিয়ে একটি পাহাড়ের উপরে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁদেরকে তাঁর মহিমা দেখিয়েছিলেন, সেকথা কি আপনার মনে পড়ে? সাহাবীদের মধ্যে একজন লিখেছিলেন-

> *সেই কালামই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন।* পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি রহমত ও সত্যে পূর্ণ।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১:১৪ আয়াত)*

* আক্ষরিক অর্থঃ "তাঁর আবাস-তাম্বু স্থাপন করলেন"

একটি দরজা

মানুষেরা যখন আবাস-তাম্বুতে আল্লাহ্‌র সামনে আসত তখন তারা প্রথমে উঠানের চারপাশে একটি দেয়াল দেখতে পেত। এই দেয়ালটিতে মাত্র একটি দরজা ছিল। এই দরজাটি আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার একটি মাত্র পথের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হযরত ঈসা বলেছেন-

> *"আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্যে দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১৪:৬ আয়াত)*

ব্রোঞ্জের কোরবান-গাহ্

আবাস-তাম্বুতে ঢুকে মানুষ প্রথমে ব্রোঞ্জের কোরবান-গাহ্ দেখতে পেত। সেখানে পশু কোরবানী করা হত। এই কোরবান-গাহ্ লোকদের মনে করিয়ে দিত যে, আল্লাহ্‌র সাথে ভাল সম্পর্কের প্রথম পদক্ষেপ হল রক্ত কোরবানী। এটা আমাদের জন্যও একই ভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র হযরত ঈসার জীবন কোরবানীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের ভাল সম্পর্ক হতে পারে।

চলুন আমরা ব্রোঞ্জের কোরবান-গাহ্ ও ক্রুশের মধ্যে তুলনা করি। এই দুটি জায়গার মধ্যেকার তুলনা দেখায় কিভাবে হযরত ঈসা আবাস-তাম্বুতে করা কোরবানীগুলোর ছবি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছিলেন।

ব্রোঞ্জের কোরবান-গাহ্	ক্রুশ
কোরবানীটি ছিল...	হযরত ঈসা...
...*হয় গরু, না হয় ভেড়ার পাল থেকে*	...আল্লাহ্‌র মেষ-শিশু
...*পুরুষ গরু বা ভেড়া*	...পুরুষ
...*খুঁতহীন*	...নিষ্পাপ
...*কোরবানী দানকারীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য*	...আমাদের বদলে মরেছেন
...*কোরবানী দানকারীর জন্য কাফ্‌ফারা বা গুনাহের ঢাকনা*	...আমাদের জন্য গুনাহের মাফ পাওয়ার পথ
...*(একটি) রক্ত (কোরবানী)* *(তৌরাত শরীফ, লেবীয় ১:২-৫ আয়াত)*	...ছিলেন আমাদের রক্ত কোরবানী

বাতিদান

খাঁটি সোনার তৈরী একটা বাতিদান পবিত্র স্থানকে আলোকিত করত। আল্লাহ্‌র দেওয়া এই ছবি ব্যাখ্যা করে হযরত ঈসা বলেছিলেন-

> *"আমিই দুনিয়ার নূর। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং জীবনের নূর পাবে।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮:১২ আয়াত)*

হযরত ঈসা গুনাহের অন্ধকার থেকে মানুষকে নাজাত দান করতে এবং তাদেরকে অনন্ত জীবনের আলোর মধ্যে আনতে চান।

রুটির টেবিল

আল্লাহ্ হযরত মূসাকে একটা টেবিল তৈরী করে সেটার উপরে ১২টি রুটি রাখতে বলেছিলেন। এই ১২টি রুটি দ্বারা বনি-ইসরাইলের ১২টি গোষ্ঠীকে বোঝাত। হযরত ঈসা এই ছবিটিও পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন...

> *"আমিই সেই জীবন রুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও খিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৩৫ আয়াত)*

যেভাবে সেই ১২টি রুটি বনি-ইসরাইলদের প্রত্যেকের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ

রুটির ছবি দান করেছিল, সেভাবে হযরত ঈসা প্রত্যেকের গুনাহের জন্য তাঁর জীবন দিয়েছিলেন। জীবন-রুটি হিসাবে হযরত ঈসা আমাদের অনন্ত জীবন দান করেছেন।

আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে তখনই আখেরী জীবন পায়। "আমিই জীবন-রুটি।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৬:৪৭,৪৮ আয়াত)

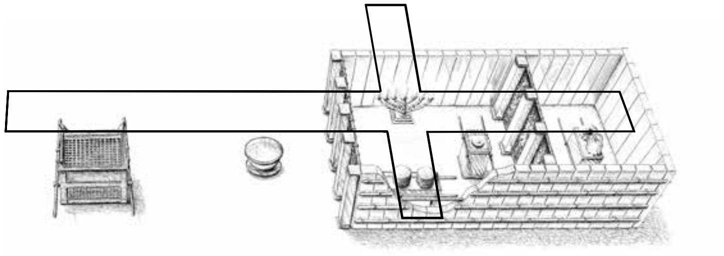

পর্দা

আল্লাহ্ হযরত মূসাকে পবিত্র ও মহাপবিত্র স্থানের মাঝখানে একটা মোটা পর্দা টাঙ্গানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। গুনাহ্পূর্ণ মানুষ আল্লাহ্র সামনে যেতে পারত না।

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে গুনাহের দরুনই আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর মহব্বত থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছি। আমাদের আর তাঁর উপস্থিতিতে আসা সম্ভব নয়।

কিন্তু তারপরে হযরত ঈসার আগমন হল। পাক-কিতাব বলে আবাস-তাম্বুর সেই পর্দা ছিল মসীহের শরীরের একটি প্রতীক। যখন হযরত ঈসা ক্রুশের উপরে মারা গেলেন তখন সেই পর্দাটি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঠিক মাঝখান বরাবর চিরে গিয়েছিল। কোন লোকের পক্ষে এই পর্দা চিরা সম্ভব ছিল না। আল্লাহ্ই এটা চিরে দিয়েছিলেন যাতে হযরত ঈসার শরীর যে আপনার ও আমার জন্য একটি কোরবানী ছিল তা তিনি প্রকাশ করতে পারেন। পাক-কিতাব বলে যখন আমরা মসীহের কোরবানীর উপরে ঈমান আনি তখন আমাদের গুনাহ্ মাফ করা হয় এবং আমরা তখন সাহসের সাথে আল্লাহ্র সামনে যেতে পারি। আমাদের সম্পর্ক আবার ঠিক হয়ে যায়।

ভাইয়েরা, ঈসা মসীহের রক্তের গুণে সেই মহাপবিত্র স্থানে ঢুকবার সাহস আমাদের আছে। মসীহ্ আমাদের জন্য একটা নতুন ও জীবন্ত পথ খুলে দিয়েছেন, যেন আমরা পর্দার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হতে পারি। ... সেইজন্য ঈমানের মধ্য দিয়ে যে নিশ্চয়তা আসে, এস, আমরা সেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তায় খাঁটি দিলে আল্লাহ্র সামনে যাই *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:১৯-২২ আয়াত)*

> *তোমরা এক কালে দূরে ছিলে, কিন্তু মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছ বলে তোমাদের এখন তাঁর রক্তের দ্বারা কাছে আনা হয়েছে।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ২:১৩ আয়াত)*

এভাবে আল্লাহ্ শুধুমাত্র আমাদের বন্ধু হিসাবেই গ্রহণ করলেন না, তিনি আমাদেরকে তাঁর পরিবারের পূর্ণ সদস্য হিসাবেও গ্রহণ করলেন। তিনি আমাদের দত্তক নিলেন!

হযরত ঈসার সময়কালে দত্তক নেওয়াটা ছিল একজন লোককে "পুত্র" হিসাবে আইনগত ভাবে ঘোষণা করা। আমাদের বর্তমান সমাজে যখন একটি পরিবারে একটি বাচ্চার জন্ম হয় তখন সে সেই পরিবারের সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু রোমীয় সাম্রাজ্যে পুরুষদের অনেক স্ত্রী, উপস্ত্রী, রক্ষিতা এবং দাসীদের কর্তৃক ছেলেমেয়ে ছিল। এসব ছেলেমেয়েদেরকে আইনগত ভাবে "*সন্তান*" ঘোষণা না করা হলে তারা আইনগত ভাবে উত্তরাধিকারী হত না। যখন একটি পুত্র সন্তানকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করা হত তখন সে সেই পরিবারের একজন পূর্ণ সদস্য হয়ে যেত।

একই ভাবে আমরাও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে ছিলাম, আমাদের কোন অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা ছিল না। কিন্তু এখন ঈমানদার হিসাবে আমরা আল্লাহ্‌র পরিবারের সন্তান হয়েছি।

> *"তোমরা সন্তান বলেই আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের রূহ্‌কে তোমাদের দিলে থাকবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই রূহ্ আল্লাহ্‌কে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকেন। ফলে তোমরা আর গোলাম (গুনাহ্ ও শয়তানের) নও। যদি তোমরা সন্তানই হয়ে থাক তবে আল্লাহ্ যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন তোমরা তার অধিকারী।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৪:৬,৭ আয়াত)*

গুনাহ্ ঢাকা দেবার ঢাকনা

গুনাহ্ ঢাকা দেবার ঢাকনাটি ছিল শাহাদাত-সিন্দুকের উপরকার বিশেষ ঢাকনা। শাহাদাত-সিন্দুক ছিল মহা-পবিত্র স্থানের ভিতরে। গুনাহ্ ঢাকা দেবার দিনে বছরে একবার মহা-ইমাম সেই ঢাকনার উপরে রক্ত ছিটিয়ে দিতেন। আল্লাহ্ বনি-ইসরাইলদেরকে এই ব্যবস্থাটি দান করেছিলেন যাতে একটি নিষ্পাপ ভেড়ার বাচ্চা কোরবানী করার মধ্য দিয়ে তারা গুনাহের বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। একই ভাবে হযরত ঈসা এখন আমাদের গুনাহ্ ঢাকা দেবার ঢাকনা। আর তাঁর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে আমরা অনন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। কোরবানীর জন্য মানুষকে আর ভেড়ার বাচ্চার কোরবানী করতে হবে না, কারণ হযরত ঈসাই ছিলেন সেই চূড়ান্ত কোরবানী। আল্লাহ্ বলেছেন...

"আমি তাদের গুনাহ্‌ ও অন্যায় আর কখনও মনে রাখব না।" তাই আল্লাহ্‌ যখন গুনাহ্‌ ও অন্যায় মাফ করেন তখন গুনাহের জন্য কোরবানী বলে আর কিছু নেই। *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:১৭,১৮ আয়াত)*

ক্রুশের উপর হযরত ঈসার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একেবারে শেষ মেষ-শাবকটির মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসের শুরু থেকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা ছিল হযরত ঈসার সেই কোরবানীর মধ্য দিয়ে মানবজাতির মুক্তির ব্যবস্থা করা। তৌরাত ও জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাবের সময়কার কোরবানী সমূহ শুধু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার ছবি ছিল। সেসব কোরবানী কোন লোকের গুনাহ্‌ দূর করতে পারত না। কিন্তু হযরত ঈসার রক্ত চিরকালের জন্য সকল গুনাহ্‌গারদের গুনাহ্‌-ঋণের মূল্য পরিশোধ করেছে। এরপর থেকে কোরবানী করার আর কোন প্রয়োজন বাকী রইল না।

...ঈসা মসীহের শরীর একবারই কোরবানী দেবার দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাদের পাক-পবিত্র করা হয়েছে।

প্রত্যেক ইমাম প্রত্যেক দিন দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত-কাজ করেন ও বারবার একইভাবে কোরবানী দেন, কিন্তু এই রকম কোরবানী কখনও গুনাহ্‌ দূর করতে পারে না। ঈসা কিন্তু গুনাহের জন্য চিরকালের মত একটি মাত্র কোরবানী দিয়ে আল্লাহ্‌র ডান দিকে বসলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ১০:১০-১২ আয়াত)

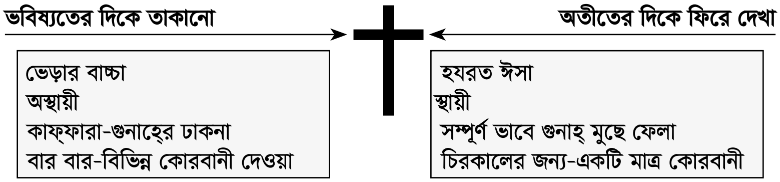

ভবিষ্যতের শেষ কোরবানী হিসাবে হযরত ঈসার সেই কোরবানীর দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্‌ পূর্বে পশু কোরবানী গ্রহণ করতেন। হযরত ঈসা তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুনাহ্‌ ঢাকা দেওয়ার চেয়েও আরও বেশী কিছু করলেন, অর্থাৎ তারপর থেকে আর বছরে বছরে কোরবানী দেওয়ার প্রয়োজন রইল না। তিনি চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থেকে মানুষের গুনাহ্‌ সম্পূর্ণ রূপে মুছে ফেললেন। ক্রুশের উপরে চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন, "শেষ হয়েছে!" *অর্থাৎ চূড়ান্ত মেষ-শিশু পাওয়া গিয়েছে!*

মৃত্যুর আগে ও পরে ঈসা মসীহ্‌ তাঁর সাহাবী ও উম্মতদের সাথে পথ চলার সময় ও কথা বলার সময় হয়ত তাঁর বিষয়ে বলা আবাস-তাম্বুর মধ্যেকার আরও অনেক ছবির কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর সাহাবী ও উম্মতেরা নিশ্চয়ই তাঁর বলা সুন্দর কথাগুলো ভুলে যায় নি।

হযরত মূসা ও ব্রোঞ্জের সাপ

বনি-ইসরাইলদের করা গুনাহের দরুন যে আল্লাহ্ সাপ পাঠিয়েছিলেন, সেকথা কি আপনার মনে আছে? লোকেরা বিষাক্ত সাপের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য চিৎকার করেছিল। তিনি হযরত মূসাকে একটি ব্রোঞ্জের (পিতলের) সাপ বানানোর জন্য এবং সেই সাপকে ছাউনির মাঝখানে উঁচু করে তুলে ধরতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুস্থ হওয়ার জন্য লোকদেরকে শুধুমাত্র সেই সাপটির দিকে তাকাতে হয়েছিল। এর বাইরে তারা আর কিছুই করতে পারত না। হযরত ঈসা ঘটনাটিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

> *"মূসা নবী যেমন মরুভূমিতে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন তেমনি ইব্‌নে-আদমকেও উঁচুতে তুলতে হবে, যেন যে কেউ তাঁর উপর ঈমান আনে সে আখেরী জীবন পায়।*
>
> *আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু আখেরী জীবন পায়। আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। যে সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে তার কোন বিচার হয় না, কিন্তু যে ঈমান আনে না তাকে দোষী বলে আগেই স্থির করা হয়ে গেছে, কারণ সে আল্লাহ্‌র একমাত্র পুত্রের উপর ঈমান আনে নি।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩:১৪-১৮ আয়াত)*

দোষী সাব্যস্ত হয়েই মানুষ এই দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করে। আমরা সাপের কামড় খাওয়া বনি-ইসরাইলদের মত। আমরা মৃত লোকদের মত। আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। কোন একদিন আমাদের এই দেহের মৃত্যু হবে, আর মৃত্যুর পরে আমরা আগুনের হ্রদের শাস্তির মুখোমুখি হব।

কিন্তু হযরত ঈসার আগমন হয়েছিল। তাঁর নিজের মৃত্যু দ্বারা তিনি আমাদের গুনাহ্-ঋণ পরিশোধ করেছিলেন। তিনি কিন্তু মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন নি; বরং জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। যেভাবে বনি-ইসরাইলরা সেই ব্রোঞ্জের সাপের দিকে তাকিয়েছিল, একই ভাবে যদি আমরা হযরত ঈসার উপর ঈমান এনে তাঁর দিকে তাকাই তাহলে তিনি আমাদেরকে রূহানী জীবন দান করবেন। আর ঠিক যেভাবে তিনি ***জীবিত*** হয়ে উঠেছেন সেভাবে আমরা রূহানী ভাবেও জীবিত হয়ে উঠব। এটা বর্তমান ও অনন্তকালের জন্য ঘটে। পাক-কিতাব বলে আমাদের "নূতন জন্ম" হবে।

> *তোমরা তো গুনাহের দরুন ... **মৃত** ছিলে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের মসীহের সংগে **জীবিত** করেছেন। তিনি আমাদের সব গুনাহ্ মাফ করেছেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, কলসীয় ২:১৩ আয়াত)*

"কিন্তু আল্লাহ্‌ মমতায় পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব মহব্বত করেন। এইজন্য অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা ***মৃত*** *অবস্থায় ছিলাম তখন মসীহের সংগে তিনি আমাদের* ***জীবিত*** *করলেন।"*

(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ২:৪,৫ আয়াত)

এক সময় আমরা রূহানী ভাবে মৃত ছিলাম। কিন্তু এখন আমরা *জীবিত* এবং চিরকাল আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে বেহেশতে বাস করব।

৫ শরীয়ত ও নবীগণ

-হযরত ইয়াহিয়া থেকে হযরত ঈসার পুনরুত্থান পর্যন্ত-

হযরত ঈসা ধাপে ধাপে সেই উম্মতদের কাছে পাক-কিতাবে লেখা ঘটনাগুলোর তাৎপর্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর শিক্ষায় আরও অনেক বিষয় যোগ করেছিলেন, যা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তবে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকার দরুন নিঃসন্দেহে তারা সেসব ঘটনার বিষয়ে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

ভাল রাখাল

পাক-কিতাব বলে-

আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫৩:৬ আয়াত)*

বোকা ভেড়ার মত আমরাও আমাদের নিজেদের পথে যাওয়া বেছে নিই। সেই পথ আমাদেরকে রূহানী শূন্যতার দিকে নিয়ে যায়। পাক-কিতাব বলে মানুষ হারিয়ে গেছে।

কিন্তু হযরত ঈসা আমাদের খুঁজতে এসেছিলেন। এই দুনিয়াতে থাকবার সময় তিনি আল্লাহ্‌র যত্নের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এই বিশেষ রূপক গল্পটি বলেছিলেন।

মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কোন একজনের একশোটা ভেড়া আছে। যদি সেই ভেড়াগুলোর মধ্যে একটা হারিয়ে যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটা মাঠে ছেড়ে দিয়ে সেই একটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার তালাশ করে না? সেটা খুঁজে পেলে পর সে খুশী হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। পরে বাড়ী গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে ডেকে বলে, "আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ আমার হারানো ভেড়াটা আমি খুঁজে পেয়েছি।"

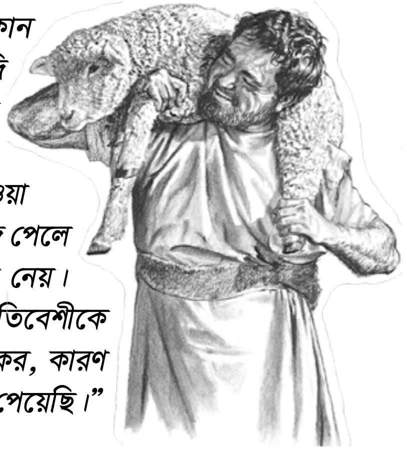

আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে যারা তওবা করবার দরকার মনে করে না তেমন নিরানব্বইজন ধার্মিক লোকের চেয়ে বরং একজন গুনাহ্‌গার তওবা করলে বেহেশতে আরও বেশী আনন্দ হয়।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৫:৪-৭ আয়াত)

আল্লাহ্‌ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। পাক-কিতাব স্পষ্ট ভাবে বলে হযরত ঈসা ভাল রাখালের মত আমাদের খুঁজেছেন, তিনি আমাদের খুঁজে পেয়ে আমাদের জন্য আরও অনেক কিছু করেছেন।

"আমিই ভাল রাখাল। ভাল রাখাল তার ভেড়ার জন্য নিজের জীবন দেয়।"

(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:১১ আয়াত)

হযরত ঈসা ঠিক তা-ই করেছিলেন। তাঁর জীবন দিয়ে তিনি আমাদের গুনাহ্‌-ঋণ শোধ করেছিলেন। *কী নিখুঁত মহব্বত! হ্যাঁ, আল্লাহ্‌ নিজেই মহব্বত*। কিন্তু এজন্য তাঁকে একটি বড় মূল্য দিতে হয়েছে। ক্রুশের উপরে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন--

"আল্লাহ্‌ আমার, আল্লাহ্‌ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ।"

(ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১৫:৩৪ আয়াত)

হযরত ঈসার যে কেবল শারীরিক মৃত্যু হয়েছিল, তা নয়; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর মধ্যে রূহানী দিকও ছিল। *গুনাহের দাবী হল বিচ্ছিন্ন করা*। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা হওয়া মানে রূহানী মৃত্যু। হযরত ঈসা যখন ক্রুশের উপরে সব মানুষের গুনাহ্‌ নিজের উপরে নিয়েছিলেন তখন পিতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তিনি আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

পাক-কিতাব বলে যেদিন হযরত ঈসা ক্রুশের উপরে ছিলেন, সেদিন দুপুর বেলায় আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল যেন পিতা আল্লাহ্‌ চান নি দুনিয়ার লোকেরা তাঁর পুত্রের যন্ত্রণা দেখুক। হযরত ঈসা নিজের ইচ্ছায় সেই বদলী "মেষ-শিশু" হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ তা হতে দিয়েছিলেন। আসলে তিনিই এটার পরিকল্পনা করেছিলেন। যেভাবে ইব্রাহিম নবী তাঁর প্রিয় পুত্রকে জবাই করার জন্য তাঁর উপরে ছুরি তুলেছিলেন সেভাবে আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহের জন্য তাঁর নিজের পুত্রের বিচার করেছিলেন। হযরত ইব্রাহিমের পুত্রের মৃত্যু হয় নি, কিন্তু আল্লাহ্‌র অনন্ত পুত্র মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান নি। তিনিই ছিলেন সেই নিখুঁত ও চূড়ান্ত কোরবানী।

সেই মহান বিনিময়

পাক-কিতাব বলে-

ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্‌ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহ্‌ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৫:২১ক আয়াত)

এই আয়াতটি বলে না হযরত ঈসা একজন গুনাহ্‌গার হয়েছিলেন। এখানে *গুনাহের জায়গায়** শব্দটির অর্থ হল গুনাহ্-কোরবানী। তাই এই আয়াতের অর্থ *আল্লাহ্ নিষ্পাপ হযরত ঈসাকে আমাদের জন্য গুনাহ্-কোরবানী স্বরূপ করলেন*। যখন হযরত ঈসা আমাদের জায়গা গ্রহণ করলেন তখন আল্লাহ্ গুনাহের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত ক্রোধ হযরত ঈসার উপর ঢাললেন। এতে হযরত ঈসার পক্ষে এমন কিছু করা সম্ভব হয়েছিল, যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি বলেছিলেন *"শেষ হয়েছে।"* এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছিলেন আমাদের গুনাহ্-ঋণ চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হয়েছে। যদি আমাদেরকেই আমাদের গুনাহ্-ঋণ শোধ করতে হত তাহলে আমরা কখনও বলতে পারতাম না "শেষ হয়েছে।" হযরত ঈসাই এই পুরো গুনাহ্-ঋণ পরিশোধ করেছিলেন...

> *"যেন ঈসা মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৫:২১খ আয়াত)*

একমাত্র তাঁর মধ্যেই আমরা সেই পবিত্রতা খুঁজে পাই। এটা আমরা আমাদের দ্বারা পাই না। ***আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর পবিত্রতা দান করেন***। এটাই সব বিনিময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিময়। ক্রুশের উপরে তিনি আমাদের গুনাহ্ তুলে নিলেন। আমরা যখন তাঁর উপর ঈমান আনি তখন তিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্রতা দান করেন। আমাদের গুনাহ্ ঢাকবার জন্য আমাদের আর কোন ভেড়ার রক্তের প্রয়োজন নেই, কেননা আরও ভাল কিছু দিয়ে আবৃত হয়ে আমরা মসীহের ধার্মিকতা পেয়েছি। মনে করে দেখুন অনেক আগে আইয়ুব নবী এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেছিলেন-

> *"...আল্লাহ্‌র চোখে কেমন করে মানুষ নির্দোষ হতে পারে?।"*
> *(নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৯:২ আয়াত)*

আল্লাহ্‌র কাছে যাওয়ার জন্য মানুষ কিভাবে নিজের গুনাহ্ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার সমান ধামির্কতা (পবিত্রতা বা নির্দোষিতা) লাভ করতে পারে? এর সম্পূর্ণ উত্তরটি এই একটি আয়াতের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরো আয়াতটি আবার পড়ুন।

> *ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ্ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ্ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৫:২১ আয়াত)*

পুনরুত্থান

হযরত ঈসার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু তিনি অন্য সব নবীদের মত ছিলেন না। তিনি কবরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকেন নি। বরং তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে

উঠেছিলেন যাতে তিনি প্রমাণ করতে পারেন তাঁর উপরে মৃত্যুর কোন শক্তি নেই। নিজের মৃত্যুর আগে তিনি বলেছিলেন-

> *"পিতা আমাকে এইজন্য মহব্বত করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:১৭,১৮ আয়াত)*

অনেক লোক হযরত ঈসাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য রোমীয় সরকার ও ইহুদীদেরকে (যারা সেই দণ্ড দেওয়ার জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছিল) দোষ দেয়। এই ধরনের চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অমূলক। পাক-কিতাব স্পষ্টভাবে বলে হযরত ঈসা নিজেই তাঁর জীবন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মরতে তাঁকে কেউই বাধ্য করে নি। বরং আমাদের প্রতি তাঁর মহব্বতের দরুনই তিনি মরেছিলেন। সত্য কথা এই যে, সব মানুষের সব গুনাহের জন্যই তাঁকে ক্রুশে পেরেক মারা হয়েছিল।

হযরত ঈসার পুনরুত্থান শক্তিশালী ভাবে দেখিয়েছে যে, আমাদের পক্ষে হযরত ঈসার মৃত্যু আল্লাহ্‌র ন্যায় স্বভাবকে সন্তুষ্ট করেছে। গুনাহের মূল্য পরিশোধিত হয়েছে এবং তা পর্যাপ্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কবর হযরত ঈসাকে ধরে রাখতে পারে নি। মৃত্যুর উপরে হযরত ঈসার জয় হয়েছে! গুনাহের যে থাবা আমাদের আঁকড়ে ধরে, হযরত ঈসা সেই থাবা ভেঙ্গে দিয়েছেন। তিনি শয়তানের শক্তিকে পরাজিত করেছেন এবং মৃত্যুর ভয়ানক পরিণতি দূর করেছেন।

> *সেই সন্তানেরা হল রক্তমাংসের মানুষ। সেইজন্য ঈসা নিজেও রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই ইবলিসকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন গোলামের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইবরানী ২:১৪,১৫ আয়াত)*

মুক্ত করা হয়েছে

শত শত বছর ধরেই মানুষ শয়তানের গোলাম ছিল। শয়তান নিজেকে "সত্য" বলে দেখিয়েছিল। এমনকি সে কাউকে কাউকে বলেছিল যে আসলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। মিথ্যা, প্রতারণা ও ভীতিকে ব্যবহার করে সে মানুষকে ধোঁকা দিয়েছিল যাতে মানুষ তার পরিকল্পনা পূর্ণ করে। কিন্তু শয়তানের প্রভাবের বাইরে মানুষের পক্ষে একটি নিখুঁত জীবন যাপন করা সম্ভবপর ছিল না, কারণ মানুষ গুনাহের গোলাম ছিল।

কিন্তু তারপরে হযরত ঈসা এসে আমাদের মুক্ত করেছেন। যদি আমরা রোমীয় সরকারের সময়ে যে গোলামী প্রথার প্রচলন ছিল, সেই প্রথার বিষয়ে না বুঝি, তাহলে এই 'মুক্ত করা' শব্দের সাথে সম্পর্কিত পুরো অর্থ ধরাটা আমাদের জন্য কঠিন হবে।

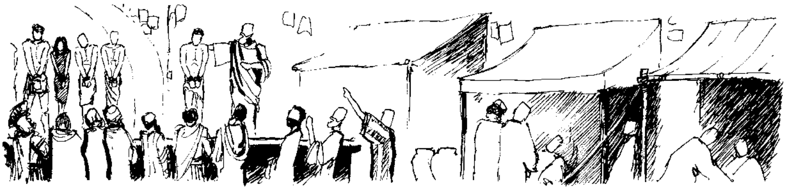

সেসময় একজন ধনী লোক একজন গোলাম কেনার জন্য গোলাম কেনা-বেচার বাজারে যেতেন। সেই গোলামদের হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। তারা ছিল নত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু থাকত না। বাজারের অন্য সব জিনিষপত্রের মত প্রত্যেক গোলামেরও একটি দাম থাকত। ধনী লোকটি দাম পরিশোধ করলে পর গোলামটি ধনী লোকটির সম্পত্তি হয়ে যেত। স্বাভাবিক ভাবে বাজারে এরকমটি সব সময়ই ঘটত। কিন্তু হঠাৎ কোন কোন সময় দেখা যেত একজন গোলাম কিনে বাজার থেকে নিয়ে যাওয়ার পরে নতুন মালিক শিকল ভেঙ্গে ফেলেছে এবং গোলামটিকে মুক্ত করে দিয়েছে। এরকম ঘটনা ঘটলে পর বলা হত, সেই গোলামটিকে মুক্ত করা হয়েছে।

হযরত ঈসাও আমাদের জন্য এই একই কাজ করেছেন। গুনাহ্ ও শয়তানের শিকল আমাদের বেঁধে রেখেছিল। আমরা গুনাহের গোলামীর বাজারে অসহায় অবস্থায় ছিলাম। আমরা আমাদের নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারি নি। কিন্তু হযরত ঈসা এসে আমাদের জন্য মরলেন এবং আমাদের কিনে নিলেন। তিনি আমাদেরকে গুনাহের গোলামীর বাজার থেকে তুলে নিলেন, শিকলগুলো ভেঙ্গে ফেললেন এবং আমাদের মুক্ত করলেন।

> *তোমরা জান, জীবন পথে চলবার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ থেকে সোনা বা রূপার মত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোন জিনিষ দিয়ে তোমাদের মুক্ত করা হয় নি; তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত ভেড়ার বাচ্চা ঈসা মসীহের অমূল্য রক্ত দিয়ে।* *(ইঞ্জিল শরীফ, ১ পিতর ১:১৮,১৯ আয়াত)*

> *আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত অনুসারে মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ গুনাহের মাফ পেয়েছি।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ১:৭ আয়াত)*

ভেড়ার খোঁয়াড়

পূর্বে হযরত ঈসা বলেছিলেন মানুষ ও ভেড়ার মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপারে মিল আছে। আসুন, আমরা সেসব নিয়ে চিন্তা করি। মনে করে দেখুন ভাল রাখাল ভেড়ার খোঁয়াড়ের ঢুকবার মুখে ঘুমাত। সে ভেড়ার পালকে রক্ষা করত। হযরত ঈসা বলেছেন...

> *"আমিই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢোকে তবে সে নাজাত পাবে।"* *(ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ১০:৯ আয়াত)*

ভেড়ার খোঁয়াড়ের দরজা মাত্র একটাই ছিল। একই ভাবে ঈসা মসীহ্ই অনন্ত জীবনের একমাত্র পথ। গুনাহের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার আর কোন পথ নেই।

> ...যেভাবে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার জন্য কাবিল ও হাবিলের একটাই মাত্র পথ ছিল;
>
> ...যেভাবে হযরত নূহের জাহাজে নিরাপত্তা পাবার দরজা মাত্র একটাই ছিল;
>
> ...যেভাবে আবাস-তাম্বুর দরজা মাত্র একটাই ছিল;
>
> ...যেভাবে সেই ভেড়ার খোঁয়াড়ে একটাই মাত্র দরজা ছিল, ঠিক একই ভাবে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ারও একমাত্র পথ হলেন হযরত ঈসা মসীহ্।
>
> *নাজাত আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ৪:১২ আয়াত)*

সাহাবীরা যখন হযরত ঈসার কাছ থেকে তৌরাত শরীফ ও নবীদের কিতাব থেকে শিক্ষা পেলেন তখন এই বাণীর পরিণতি কি হবে সে কথা হয়ত তাঁরা আগে থেকে ধারণা করেছিলেন। সাহাবীরা রোমীয় সাম্রাজ্যে বাস করতেন। রোমীয়রা সে সময়কার অন্য ধর্মের লোকদের ব্যাপারে কিছুটা সহনশীল ছিল। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিল সম্রাট সিজার একজন দেবতা। হযরত ঈসা যে আল্লাহ্র কাছে যাওয়ার অন্য একটি পথ, সে কথা বলতে বাধা ছিল না। কিন্তু যখন তবলীগ করা হয়েছিল হযরত ঈসাই একমাত্র পথ, তখন হযরত ঈসার সাহাবীদের জীবন বিপদের মুখে পড়েছিল। ইতিহাস বলে হযরত ঈসার এগারজন সাহাবীর মধ্যে ১০জনই এই বাণী শিক্ষা দেওয়ার দরুন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সাহাবীরা জানতেন তাঁদের প্রচারিত বাণীটি ছিল সত্য; তাই তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর বাকী একজন সাহাবীকে একটি দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

ফরীশীগণ

সব লোকদের মধ্যে ফরীশীরা ছিল ভীষণ ধার্মিক। কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয়, তার একটি লম্বা তালিকা তাদের ছিল।

বর্তমানেও অনেক লোক ভুল ভাবে বিশ্বাস করে যে, যদি তাদের খারাপ কাজের চেয়ে ভাল কাজের পাল্লা ভারী হয়, তাহলে তারা তাদের সেই ভাল কাজ দ্বারা বেহেশতে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

যদিও ফরীশীরা খুবই ধার্মিক ছিল, তারপরও হযরত ঈসা তাদের দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন, কারণ তাদের জীবন ও শিক্ষা লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা থেকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসা বলতেন যে, নাজাতদাতা হিসাবে তাঁর উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়েই কেবল মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারবে। তিনিই সেই একমাত্র সত্য পথ।

আমরা প্রতিদিনই আমাদের বিভিন্ন কাজে-কর্মে ঈমান/বিশ্বাসের অনুশীলন করি। যেমন- যখন আপনি একটি চেয়ারের উপরে বসে এই বইটি পড়ছেন তখন চেয়ারটির উপরে আপনার এই বিশ্বাস থাকে যে, এটি আপনাকে ধরে রাখবে, ভেঙ্গে যাবে না। চেয়ারে বসার সময় হয়ত আপনি চিন্তা করেন নি, *"আমি এখন এই শক্তিশালী চেয়ারের উপর বিশ্বাস রাখব।"* কিন্তু চেয়ারটির উপরেই আপনি আপনার বিশ্বাস রেখেছিলেন। ঈমান/বিশ্বাসের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা কি? গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলঃ *কিসের* বা কার উপর আমি আমার ঈমান/বিশ্বাস রাখছি? চেয়ারটি ভেঙ্গে পড়তে পারে, কারণ এটা কেবলই একটা সাধারণ বস্তু মাত্র। কিন্তু আপনি যদি আপনার গুনাহ্‌-ঋণ পরিশোধের জন্য কেবল হযরত ঈসার উপরেই ঈমান আনেন তাহলে আপনি পূর্ণ আস্থা লাভ করতে পারবেন। তাঁর ওয়াদা অনুসারেই তিনি আমাদের গুনাহ্‌-ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

> *আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহ্‌রই দান। এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ইফিষীয় ২:৮,৯ আয়াত)*

কিতাবুল মোকাদ্দস বলে ঈসা মসীহের উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে আমরা গুনাহের পরিণাম থেকে *নাজাত* পাই। এই *নাজাত* আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা একটা *দান*। এর জন্য আমাদের কোন ধর্ম-কর্ম বা সৎ কাজ করতে হয় না।

দান বিনামূল্যের হয়। আপনি যদি *দানের* জন্য কাজ করেন, তাহলে সেটা আর দান থাকে না। ***দান হল এমন জিনিষ, যা আমরা আমাদের কোন কাজ বা যোগ্যতার বিনিময়ে পেতে পারি না।***

যদি আমরা উপলব্ধি করি আমরা এটা পাওয়ার যোগ্য, তাহলে এটা আর দান থাকে না, তখন এটা হয় পুরস্কার। অনন্ত জীবন আসলেই একটি *দান*, কারণ আমরা এটা পাওয়ার যোগ্য নই।

ফরীশীরা ভেবেছিল তাদের ভাল কাজ আল্লাহ্‌কে খুশী করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌ আমাদের অন্তরে কি আছে সে খবর জানেন। যদি তিনি আমাদের কাজের

জন্যে আমাদের গ্রহণ করেন তাহলে আমরা আমাদের ভাল কাজগুলোর বিষয়ে অহংকারী হয়ে উঠব। আমরা কতটা ভাল তার দরুন নয়, কিন্তু আমাদের জন্য তাঁর দয়ার দানের উপর ভিত্তি করেই তিনি আমাদেরকে বিচারের হাত থেকে রক্ষা করেন।

> *গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে আখেরী জীবন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)*

শুধুমাত্র ঈমান

কিভাবে আমরা আল্লাহ্র এসব দান পাই? আল্লাহ্ কে এবং তিনি আমাদের জন্য যা যা করেছেন, তার উপরে আমাদের ঈমান আনার দ্বারাই আমরা তা পাই। আল্লাহ্ এবং তাঁর কাজের বিষয়ে আমরা কিতাবুল মোকাদ্দসে দেখতে পাই। যেমন- আমরা ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি-

- আমাদের গুনাহের জন্য হযরত ঈসা *আমাদের বদলে* মারা গিয়েছেন।
- হযরত ঈসার মৃত্যু দ্বারা আল্লাহ্র ন্যায়বিচারের দাবী পূর্ণ হয়েছে।
- যখন আল্লাহ্ আমাদের দিকে তাকান তখন তিনি আর আমাদের গুনাহ্ দেখেন না, কিন্তু দেখতে পান আমাদেরকে হযরত ঈসার ধার্মিকতা দ্বারা ঢাকা হয়েছে।
- আল্লাহ্ আমাদের অনন্ত জীবনের দান দিয়েছেন।

এসব সত্যের উপর ঈমান স্থাপন, অর্থাৎ এসবকে সত্য বলে বিশ্বাস করা অন্ধ বিশ্বাস নয়, কারণ এই ঈমানই আল্লাহ্র কালামের সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কিছু কিছু লোক বেশী বা কম ঈমান থাকা নিয়ে কথা বলে। কিন্তু এই ধরনের কথা ঈমানকে বিভ্রান্তিকর করে তোলে। স্মরণ করে দেখুন হযরত ঈসা ক্রুশে মরে আমাদের জন্য দরকারী সব কিছুই করেছিলেন। কল্পনা করুন একজন লোক ডুবে যাচ্ছে এবং কেউ একজন সেই লোকটিকে সাহায্য করতে এসেছে। সেই ডুবে যেতে থাকা লোকটির কাছে পৌঁছে সেই উদ্ধারকারী লোকটি জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি বিশ্বাস হয় আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব?" সেই ডুবে যেতে থাকা লোকটি বলিষ্ঠভাবে মাথা নাড়ুক বা না নাড়ুক সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু বড় কথা হল, তাকে রক্ষা করার জন্য সেই উদ্ধারকারীর উপর বিশ্বাস করা। একই ভাবে গুনাহ্ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমাদেরকেও হযরত ঈসার উপর ঈমান রাখতে হয়। আমাদের ঈমানের পরিমাণ কতটুকু, সেই পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আমাদের নাজাত দান করা হয় না। কিন্তু আমাদের গুনাহের জন্য ক্রুশের উপর হযরত ঈসার মৃত্যুই আমাদের নাজাত দান করে।

> *আল্লাহ্ কেমন করে **মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন** সেই কথা এই সুসংবাদের মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। **প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল ঈমান আনবার মধ্য দিয়েই মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়।***
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ১:১৭ আয়াত)*

ডুবে যেতে থাকা লোকের গল্প থেকে আপনারও জানা দরকার যে, আপনি ডুবে যাচ্ছেন। যদি আপনি চিন্তা করেন আপনি ভাসছেন তাহলে আপনার কোন ধরনের সাহায্যের দরকার হবে না। আপনি যদি জানেনই আপনি ডুবে যাচ্ছেন, কিন্তু খুব বেশী অহংকারের দরুন সাহায্য না চেয়ে থাকেন, তাহলেও আপনি একেবারেই ডুবে যাবেন। অন্যেরা হয়ত দেখবে আপনি বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছেন, কিন্তু যতক্ষণ না আপনি তাদের সুযোগ দেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না। একই ভাবে, যতক্ষণ না একজন লোক বুঝতে পারে সে একজন অসহায় গুনাহ্গার ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার গুনাহ্-ঋণ থেকে নাজাত পাবে না। আমাদেরকে অবশ্যই প্রথমে আমাদের অসহায় অবস্থা স্বীকার করতে হবে।

হযরত ঈসা কি কাজ করেছেন এবং তিনি কে এ বিষয়ে পাক-কিতাব আমাদের অনেক উদাহরণ দেয়। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি এসব উদাহরণের মধ্যে কোন্‌গুলো হযরত ঈসা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দেওয়ার সময় ব্যবহার করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি বেশীর ভাগই ব্যবহার করেছিলেন বা যেসব উদাহরণের কথা আমরা চিন্তা করেছি তার সবগুলো ব্যবহার করেছিলেন। হয়ত তিনি এর চেয়ে আরও বেশী উদাহরণ ব্যবহার করেছিলেন। যখন তিনি তাঁর শিক্ষা শেষ করেছিলেন, তখন অবশ্যই যে ঘরে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই ঘরটি নীরব হয়ে গিয়েছিল। হযরত ঈসার সাহাবীদের জন্য যে প্রশ্নটি থেকে গিয়েছিল, সেই একই প্রশ্ন আমাদের জন্যও থেকে যায়। কিসের উপরে আপনি আপনার ঈমান স্থাপন করছেন? আপনার ধর্মের কিংবা ধারণার উপর নাকি আপনার গুনাহ্-ঋণ শোধ করার জন্য যে আপনার বদলে হযরত ঈসা মরেছিলেন, সেই সত্যের উপর? কার মধ্যে আপনি আপনার ধার্মিকতা খুঁজে চলেছেন? আপনার নিজের ও আপনার সৎ কাজগুলোর মধ্যে নাকি হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে?

পঞ্চদশ অধ্যায়

১ নবীদের বলা কথাগুলো

২ হযরত ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া

৩ আপনি কি নবীদের কথায় বিশ্বাস করেন?

১ নবীদের বলা কথাগুলো

হযরত ঈসার জন্মের ৭০০ বছর আগে আল্লাহ্ ইশাইয়া নবীকে দিয়ে এসব কথা লিখিয়েছিলেন। এই কথাগুলো আস্তে আস্তে পড়ুন এবং নবীর বাণীর অর্থ বের করতে চেষ্টা করুন।

আমাদের দেওয়া খবরে কে বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা মাবুদের শক্তিশালী হাত প্রকাশিত হয়েছেন? তিনি তাঁর সামনে নরম চারার মত, শুকনা মাটিতে লাগানো গাছের মত বড় হলেন। তাঁর এমন সৌন্দর্য বা জাঁকজমক নেই যে, তাঁর দিকে আমরা ফিরে তাকাই; তাঁর চেহারাও এমন নয় যে, আমাদের আকর্ষণ করতে পারে। লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে ও অগ্রাহ্য করেছে; তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং রোগের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল। লোকে যাকে দেখলে মুখ ফিরায় তিনি তার মত হয়েছেন; লোকে তাঁকে ঘৃণা করেছে এবং আমরা তাঁকে সম্মান করি নি।

সত্যি, তিনিই আমাদের সব রোগ তুলে নিয়েছেন আর আমাদের যন্ত্রণা বহন করেছেন; কিন্তু আমরা ভেবেছি আল্লাহ্ তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁকে মেরেছেন ও কষ্ট দিয়েছেন। আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি। আমরা সবাই ভেড়ার মত করে বিপথে গিয়েছি; আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের পথের দিকে ফিরেছি। মাবুদ আমাদের সকলের অন্যায় তাঁর উপর চাপিয়েছেন।

তিনি অত্যাচারিত হলেন ও কষ্ট ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি মুখ খুললেন না; জবাই করতে নেওয়া ভেড়ার বাচ্চার মত, লোম ছাঁটাইকারীদের সামনে চুপ করে থাকা ভেড়ীর মত তিনি মুখ খুললেন না। জুলুম ও অন্যায় বিচার করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই সময়কার লোকদের মধ্যে কে খেয়াল করেছিল যে, আমার লোকদের গুনাহের জন্য তাঁকে জীবিতদের দেশ থেকে শেষ করে ফেলা হয়েছে? সেই শাস্তি তো তাদেরই পাওনা ছিল। যদিও তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি কিংবা তাঁর মুখে কোন ছলনার কথা ছিল না, তবুও দুষ্টদের সংগে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল আর মৃত্যুর দ্বারা তিনি ধনীর সংগী হয়েছিলেন।

আসলে মাবুদ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে চুরমার করেছিলেন আর তাঁকে কষ্ট ভোগ করিয়েছিলেন। মাবুদের গোলাম যখন তাঁর প্রাণকে

দোষের কোরবানী হিসাবে দেবেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদের দেখতে পাবেন আর তাঁর আয়ু বাড়ানো হবে; তাঁর দ্বারাই মাবুদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি তাঁর কষ্টভোগের ফল দেখে তৃপ্ত হবেন; মাবুদ বলছেন, আমার ন্যায়বান গোলামকে গভীরভাবে জানবার মধ্য দিয়ে অনেককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে, কারণ তিনি তাদের সব অন্যায় বহন করবেন। সেইজন্য মহৎ লোকদের মধ্যে আমি তাঁকে একটা অংশ দেব আর তিনি বলবানদের সংগে বিজয়ের ফল ভাগ করবেন, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছায় প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁকে গুনাহ্‌গারদের সংগে গোণা হয়েছিল; তিনি অনেকের গুনাহ্ বহন করেছিলেন আর গুনাহ্‌গারদের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। *(নবীদের কিতাব, ইশাইয়া ৫৩ রুকু)*

যাঁর আসবার কথা ছিল, সেই মসীহ্ সম্বন্ধে পাক-কিতাবের এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অংশটি আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দান করে। তাহলে এটা আশ্চর্যের কিছু না যে, যখন ঈসা দু'জন উম্মতের সাথে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি বলেছেন-

"আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না। *এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?।"*

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:২৫,২৬ আয়াত)

হযরত ঈসা কি সেই একই কথা আমাদেরকেও বলবেন?

২ হযরত ঈসার বেহেশতে ফিরে যাওয়া

পুনরুত্থানের পরে হযরত ঈসা তাঁর সাহাবীদের সাথে সময় কাটিয়েছিলেন এবং...

এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি সাহাবীদের দেখা দিয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১:৩ আয়াত)

চল্লিশ দিনের শেষে হযরত ঈসা তাঁর উম্মতদের জেরুজালেমের কাছে একটি পরিচিত জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

পরে ঈসা তাঁর উম্মতদের নিয়ে বেথানিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের দোয়া করলেন। দোয়া করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হল।

(ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৪:৫০,৫১ আয়াত)

ঈসা যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন তখন সাহাবীরা একদৃষ্টে আসমানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু'জন লোক সাহাবীদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "গালীলের লোকেরা, এখানে

দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে রয়েছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা বেহেশতে যেতে দেখলে সেইভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।"

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১:১০,১১ আয়াত)

ফেরেশতারা বলেছিলেন হযরত ঈসা আবার আসবেন। কিতাবুল মোকাদ্দস পড়তে পড়তে আমরা ভবিষ্যতে হযরত ঈসার আগমন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। যেভাবে আল্লাহ্ হযরত ঈসার প্রথম আগমনের বিষয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ওয়াদা সমূহ পূর্ণ করেছিলেন, আমরা জানি সেভাবে হযরত ঈসার দ্বিতীয় আগমনের বিষয়ে তাঁর ওয়াদা সমূহও পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ বিশ্বস্তভাবে তাঁর সব ওয়াদা পূর্ণ করেন।

কিতাবুল মোকাদ্দসের ইঞ্জিল শরীফের অবশিষ্ট অংশে সাহাবীদের শিক্ষার কথা এবং তাঁদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে লেখা আছে। তাঁরা অনেক লোকদের কাছে হযরত ঈসার বিষয়ে বলেছিলেন।

এইভাবে আল্লাহ্‌র কালাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল, আর জেরুজালেমে উম্মতদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যেতে লাগল এবং ইমামদের মধ্যে অনেকে ঈসায়ী ঈমানকে মেনে নিলেন।

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ৬:৭ আয়াত)

যেসব ইমামেরা হযরত ঈসার মৃত্যুর বিষয়ে পরিকল্পনা করেছিল, তাদের কয়েকজনও হযরত ঈসার উপরে ঈমান এনেছিল। আবার বাধাও এসেছিল। শৌল নামে একজন লোক হযরত ঈসাকে ঘৃণা করতেন। এই শৌলই পরবর্তীতে পৌল নামে সর্বাধিক পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি খুবই গভীর ভাবে ফরীশীদের নিয়ম-কানুন ও ইহুদী ধর্মীয় ঐতিহ্য পালন করতেন। তিনি *মনে করতেন* তিনি নবীদের এবং তাঁদের কথাগুলো বিশ্বাস করেন। কিন্তু আসলে তিনি *কখনও* নবীদের বাণী সমূহ *বুঝেন নি*। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি হযরত ঈসার সাহাবীদের মুখ বন্ধ করবেন।

এদিকে শৌল প্রভুর উম্মতদের হত্যা করবেন বলে ভয় দেখাচ্ছিলেন। দামেস্ক শহরের মজলিস-খানাগুলোতে দেবার জন্য তিনি মহা-ইমামের কাছে গিয়ে চিঠি চাইলেন। যত লোক ঈসার পথে চলে, তারা পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক, তাদের পেলে যেন তাদের বেঁধে জেরুজালেমে আনতে পারেন সেই ক্ষমতার জন্যই তিনি সেই চিঠি চেয়েছিলেন। পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন আসমান থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন, "শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর জুলুম করছ?"

শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কে?"

তিনি বললেন, "আমি ঈসা, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছ।"

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ৯:১-৫ আয়াত)

হযরত ঈসা আশ্চর্যভাবে শৌলের মনে কাজ করেছিলেন, আর শৌল সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলেন। ঈমানদারদের নির্যাতন ও হত্যা করার কাজ তিনি বন্ধ করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হল শেষে তিনি নিজেই একজন ঈমানদার হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে তাঁর উপরও নির্যাতন হয়েছে। একবার ক্রুদ্ধ জনতা তাঁর উপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল এবং তাঁকে আধমরা করে ফেলে গিয়েছিল। তিনবার তাঁকে বেত মারা হয়েছিল। পাঁচবার তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল। তিনবার তিনি জাহাজডুবিতে পড়েছিলেন। এই তিনবারের একবার তিনি ২৪ ঘন্টা ধরে সমুদ্রের উপর ভেসেছিলেন। অন্যদের কাছে যখন তিনি নিজের ঈমানের বিষয়ে বলতে চেষ্টা করেছিলেন তখন তাঁর উপর এসব ঘটনা ঘটেছিল। তিনি লোকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন যে, হযরত ঈসাই সেই ***ওয়াদা-করা নাজাতদাতা***, যাঁর বিষয়ে সব নবীরা লিখে গিয়েছেন।

৩ আপনি কি নবীদের কথায় বিশ্বাস করেন?

কিছু কিছু লোক কিতাবুল মোকাদ্দস পড়ে এবং এর কথা ও অর্থ বুঝার পরও একটি ঝুঁকি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা এই কিতাবের কথা বিশ্বাস না করে বরং...

আল্লাহ্‌র বাণী উপেক্ষা করার...

সেই বাণীকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করার...

জীবনের বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে সেই বাণী ভুলে যাওয়ার...

বাণী পরিবর্তন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আর তারা আশা করে যে, পাক-কিতাবের কথাগুলো বরং ভুলই হবে।

বাদশাহ্‌ প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পও এ ধরনের একটি ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহান হেরোদের নাতি এবং হেরোদ আন্তিপাসের বড় ভাইয়ের ছেলে। তাই তিনি পারিবারিকভাবে অবশ্যই হযরত ঈসা সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি হযরত ঈসার দেওয়া শিক্ষা সম্বন্ধে জানতেন, কারণ এহুদার অনেক এলাকায় তাঁর অনেক গুপ্তচর ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁর পদ-মর্যাদা ছিল। বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌র কাছে সমর্পিত না হয়ে তিনি অহংকারবশতঃ নিজের মত জীবনযাপন করে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় ইহুদী ধর্মীয় নেতাদের কয়েকজনের কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিয়েছিলেন হযরত ঈসার সাহাবীদের মধ্যে একজনের

মাথা কেটে ফেলতে। কিন্তু তারপরে...

হেরোদ একটা দিন ঠিক করলেন। তিনি সেই দিন রাজপোশাক পরে সিংহাসনে বসে সেই লোকদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "এ দেবতার কথা, মানুষের কথা নয়।" হেরোদ আল্লাহ্‌র গৌরব করেন নি বলে তখনই মাবুদের একজন ফেরেশতা তাঁকে আঘাত করলেন, আর ক্রিমির উৎপাতে তিনি মারা গেলেন। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১২:২১-২৩ আয়াত)*

আল্লাহ্‌ দয়াপূর্বক কিছু সময়ের জন্য গুনাহ্‌ সহ্য করেন, কিন্তু তারপরে তিনি অবশ্যই গুনাহের বিচার করবেন, কারণ তিনি ন্যায়বিচারক। একজন মানুষের উপর শাস্তি এই জীবনে আসতে পারে বা তার মৃত্যু পর্যন্ত তা বিলম্বিত হতে পারে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, শাস্তি হবেই হবে। হেরোদ মারা গিয়েছিলেন। আগুনের হ্রদে অনন্তকাল ধরে তিনি কষ্টভোগ করবেন। পরবর্তী আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লেখা আছে-

কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম ছড়িয়ে পড়তে থাকল এবং অনেক লোক তার (ঈসার) উপর ঈমান আনতে লাগল। *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ১২:২৪ আয়াত)*

প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্পের পরে ক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁরই ছেলে দ্বিতীয় হেরোদ আগ্রিপ্প। তিনিও হয়ত হযরত ঈসার বিষয়ে জানতেন। তবলীগ করার জন্য পৌলকে বন্দী করা হয়েছে শুনতে পেয়ে এই বাদশাহ্‌ পৌলের সাক্ষী শুনতে চেয়েছিলেন। তাই পৌল তাঁর সামনে গিয়ে হযরত ঈসার বিষয়ে সাক্ষী দিয়েছিলেন। পৌল বলেছিলেন...

...সেইজন্যই আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোট-বড় সবার কাছে সাক্ষি দিচ্ছি। নবীরা এবং মূসা যা ঘটবার কথা বলে গেছেন তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না। সেই কথা হল এই যে, "মশীহকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং তাঁকেই মৃত্যু থেকে প্রথমে জীবিত হয়ে উঠে তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অইহুদীদের কাছে নূরের রাজ্যের বিষয়ে ঘোষণা করতে হবে।" বাদশাহ্‌ তো এই সব বিষয় জানেন এবং আমি তাঁর সংগে খোলাখুলিই সব কথা বলতে পারি। আর এই কথা আমি নিশ্চয় জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায় নি, কারণ এই সব ঘটনা তো গোপনে ঘটে নি। বাদশাহ্‌ আগ্রিপ্প, ***আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?"*** *আমি জানি আপনি করেন।*

তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে ঈসায়ী করবার চেষ্টা করছ?।"

(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২৬:২২,২৩,২৬-২৮ আয়াত)

বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় হেরোদ আগ্রিপ্প পৌলের কথা পুরোপুরি বুঝেছিলেন বলে মনে

হয়। তিনি বলেছিলেন পৌল প্রায় অল্প সময়ে তাঁকে ঈসায়ী করে ফেলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনিও একটি ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি ঈমান আনেন নি। নবীদের বাণী উপেক্ষা করে তিনি একটি সিদ্ধান্ত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এই আগ্রিপ্পও যে হযরত ঈসার উপর ঈমান এনেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি *বুঝেছিলেন*, কিন্তু ঈমান না এনেই মারা গিয়েছিলেন। সেটা ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত।

এছাড়া পৌল ফীলিক্স নামে একজন রোমীয় শাসনকর্তার সামনে নিজের পক্ষে কথা বলেছিলেন। হযরত ঈসা কে এবং তিনি কি করেছেন সে বিষয়ে ব্যাপক ব্যাখ্যা দানের জন্য পৌল সব সময় সুযোগ খুঁজতেন।

> *কয়েক দিন পরে ফীলিক্স তাঁর ইহুদী স্ত্রী দ্রুষিল্লাকে সংগে করে আসলেন। তিনি পৌলকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর কাছে মসীহ্ ঈসার উপর ঈমানের কথা শুনলেন। পৌল যখন সৎভাবে চলা, নিজেকে দমনে রাখা এবং রোজ হাশরের বিষয়ে বললেন, তখন ফীলিক্স ভয় পেয়ে বললেন, "তুমি এখন যাও; সময়-সুযোগ মত আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।"*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২৪:২৪,২৫ আয়াত)*

ফীলিক্স তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করেছিলেন এবং আরও সুবিধাজনক একটি সময়ের অপেক্ষা করেছিলেন। সময় নেওয়াটা সহজ, কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের শিক্ষা দেয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখনই সময়।

> *দেখ, এখনই উপযুক্ত সময়, আজই নাজাত পাবার দিন।*
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৬:২ আয়াত)*

ফীলিক্সও যে ঈমান এনেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ তিনিও কখনও হযরত ঈসার উপর ঈমান আনার জন্য সুবিধাজনক সময় খুঁজে পান নি।

শৌল, প্রথম হেরোদ আগ্রিপ্প, দ্বিতীয় হেরোদ আগ্রিপ্প এবং ফীলিক্স- এই চারজন লোক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমাদেরকেও অবশ্যই সেই একই সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হতে হবে--

> ***আপনি কি নবীদের কথা বিশ্বাস করেন?।***
>
> *(ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিত ২৬:২৭ আয়াত)*

পরিশিষ্ট

টীকা

কিতাবুল মোকাদ্দস নির্বাচন

একটি সাধারণ প্রশ্ন

গ্রন্থ-তালিকা

অতিরিক্ত তথ্য

টীকা

অভিষেকঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আলাদা করার লক্ষ্যে কোন ব্যক্তির মাথায় বা একটি বস্তুর উপর তেল ঢালা। এই শব্দটি মাবুদের কাজের জন্য মনোনীত যেকোন কিছুকে নির্দেশ করত।

আব্বাঃ এই অরামীয় শব্দটি আর বাংলা ভাষার 'আব্বা/আব্বু', 'বাবা' ও 'পিতা' শব্দের একই অর্থ।

আমি আছিঃ আল্লাহ্‌র একটি নাম, যার অর্থ *"যিনি স্বঅস্তিত্ববান"* বা *"যিনি তাঁর নিজের শক্তি দ্বারা অস্তিত্ববান।"*

আমিনঃ মুনাজাতের শেষে বলা দৃঢ় উক্তি ও সম্মতি জ্ঞাপনমূলক একটি শব্দ। এর অর্থ "তা-ই হোক" বা "আমি এতে একমত!" বা "সত্যি।"

ইব্‌নুল্লাহ্‌ঃ হযরত ঈসার একটি নাম, যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। তবে তিনি আল্লাহ্‌র দৈহিক পুত্র নন, বরং আল্লাহ্‌ কেমন, তা তিনি মানুষ ও এই দুনিয়ার কাছে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌র যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাঁরও একই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই নামের দ্বারা আল্লাহ্‌র সংগে হযরত ঈসার চিরকালের এক অতি নিকট সম্পর্ক প্রকাশ করা হয়েছে।

ইব্‌নে-আদমঃ এটা হযরত ঈসার আরেকটি নাম। এর দ্বারা হযরত ঈসা যে ইব্‌নুল্লাহ্‌ হলেও মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছেন, তা প্রকাশ করা হয়েছে।

ইবলিসঃ মিথ্যা অভিযুক্তকারী, নিন্দাকারী, শয়তানের অন্য একটি নাম, খারাপ ফেরেশতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

ইমাম/মহা-ইমামঃ বনি-ইসরাইলের ১২টি গোষ্ঠীর মধ্যে মূসা নবীর ভাই হযরত হারুনের গোষ্ঠীর লোকদেরকেই ইমামের কাজ করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। ইমামদের দায়িত্ব ছিল বনি-ইসরাইলের প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহ্‌র সামনে যাওয়া এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করা। তাঁরা কোরবানী দেওয়া, পবিত্র স্থানের দেখাশোনা করা ও আল্লাহ্‌র কালাম রক্ষা করা এবং তাঁর বান্দাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজ করতেন। ইহুদী ইমামদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পদ ছিল মহা-ইমামের পদ। তিনি ইহুদী মহাসভার সভাপতি হতেন। মহা-ইমাম বছরে মাত্র একবারই নিজের ও বনি-ইসরাইলদের গুনাহ্‌ মাফের জন্য কোরবানী দেওয়া পশুর রক্ত নিয়ে আবাস-তাম্বুর মহা-পবিত্র স্থানে ঢুকতেন।

ইম্মানূয়েলঃ হযরত ঈসার একটি নাম, যার অর্থ "আমাদের সঙ্গে আল্লাহ্‌।"

ইসরাইলঃ হযরত ইসহাকের ছোট ছেলের নাম ছিল হযরত ইয়াকুব বা ইসরাইল। আল্লাহ্‌ই তাঁকে এই নামটি দিয়েছেন। তাঁর বংশধরদের ইসরাইল জাতি বলা হয়।

ঈসাঃ নামটির অর্থ নাজাতদাতা, মুক্তিদাতা। জন্মের সময় জিবরাইল ফেরেশতা এই নামটি রাখতে বলেছিলেন।

উম্মতঃ একজন অনুসারী। ইঞ্জিল শরীফে হযরত ঈসার উপর ঈমান আনা সব লোকদের তাঁর উম্মত বলা হয়েছে। তবে হযরত ঈসার ১২জন বিশেষ উম্মতকে সাহাবী বলা হয়েছে। আবার অনেক আয়াতে তাঁদেরকেও উম্মত উল্লেখ করা হয়েছে।

এবাদতঃ এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র যোগ্যতা/মূল্য ঘোষণা করা হয়।

কিতাবুলঃ কিতাবুল মোকাদ্দস বলতে তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ, নবীদের কিতাব এবং ইঞ্জিল শরীফকে বুঝায়। পুরো কিতাবুল মোকাদ্দসে মোট ৬৬টি কিতাব রয়েছে। হযরত ঈসার আগমনের পূর্বে তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ এবং নবীদের কিতাব সমূহ লেখা হয়েছিল এবং এগুলোতে মোট কিতাবের সংখ্যা ৩৯টি। ইঞ্জিল শরীফ হযরত ঈসার আগমনের পরে লেখা হয়েছিল এবং এতে মোট ২৭টি কিতাব রয়েছে।

কোরবান-গাহ্ ঃ মাটি বা পাথরের তৈরী এমন একটি সমান জায়গা, যার উপরে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পশু কোরবানী দেওয়া হত।

খারাপ রূহ্ ঃ এই সৃষ্ট রূহ্‌যুক্ত সত্তা শয়তানের সঙ্গী।

গুনাহ্ ঃ পবিত্রতার বিষয়ে আল্লাহ্‌র মানদণ্ড অর্জনে ব্যর্থ হওয়া; আল্লাহ্ এবং তাঁর কালামকে অমান্য করা; আল্লাহ্ যেভাবে চান সেভাবে জীবনযাপন করতে অস্বীকার করা।

গুনাহ্-স্বভাব ঃ হযরত আদমের কাছ থেকে পাওয়া মানুষের গুনাহ্‌পূর্ণ স্বভাবকে বোঝায়।

জবুর ঃ একটি কাওয়ালী।

তওবা ঃ মানে গুনাহ্ থেকে মন ফেরানো, গুনাহের প্রতি পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন, শয়তানের পথ থেকে আল্লাহ্‌র দিকে ফেরা। এটা শুধু মুখে বলার বিষয় নয়, বরং যা বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করা।

তরিকাবন্দী ঃ এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। নবী ইয়াহিয়া তওবা করবার চিহ্ন হিসাবে জর্ডান নদীতে বাপ্তিস্ম বা অবগাহন বা তরিকাবন্দী দিতেন। হযরত ঈসা মসীহের হুকুম অনুসারে ঈসায়ী ঈমানদারেরা ঈমান আনবার চিহ্ন হিসাবে তরিকাবন্দী গ্রহন করে।

দত্তক ঃ কাউকে পুত্র হিসাবে আইনগতভাবে গ্রহণ করার অনুষ্ঠান। এই পুত্রত্ব এর বিভিন্ন বাধ্য-বাধকতা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পূর্ণ হয়।

ধর্ম-শিক্ষক ঃ এই লোকেরা প্রাচীনকালে পাক-কিতাবের আয়াতগুলোর বিভিন্ন কপি হুবহু লেখার কাজ করতেন। এছাড়াও তাঁরা শরীয়ত বিষয়ে শিক্ষা, পরামর্শ ও উত্তর দানে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ধার্মিক ঃ আল্লাহ্‌র চোখে সঠিক হওয়া। কিতাবুল মোকাদ্দস বলে হযরত ঈসা ছাড়া আল্লাহ্‌র চোখে ধার্মিক কেউই নেই। কিন্তু হযরত ঈসার উপর ঈমান আনার মধ্য দিয়েই কেবল মানুষকে এই ধার্মিকতা দেওয়া হয়, অর্থাৎ মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়।

নবী ঃ একজন সংবাদদাতা, যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে কথা বলেন।

নাজাত ঃ গুনাহ্ থেকে মুক্তি বা উদ্ধার।

নাজাতদাতা ঃ যিনি অন্যদের গুনাহ্ থেকে উদ্ধার করেন।

নির্দোষ বলে গ্রহণ ঃ একটি আইনী শব্দ। গুনাহের জন্য ক্রুশের উপর হযরত ঈসার মৃত্যুতে যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ তাঁর বিচারে সেসব ঈমানদার লোকদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন।

পাক-রূহ্ ঃ ইনি কোন ফেরেশতা বা মানুষ নন, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিজের রূহ্। তিনি তাঁর স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যে আল্লাহ্‌র সমান। এছাড়াও তিনি আল্লাহ্‌ত্বের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি পাক-রূহ্ আল্লাহ্ হিসাবেও পরিচিত। হযরত ঈসার এই দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি পাক-রূহকে পাঠিয়েছিলেন যাতে সব সময় ঈসায়ী ঈমানদারদের সাথে থাকতে পারেন। তিনি বর্তমানেও সব ঈসায়ী বিশ্বাসীদের সাথে সাথে আছেন।

প্রেরিত ঃ এই শব্দটির অর্থ *যাঁকে পাঠানো হয়েছে*। বেশীর ভাগ সময় এই পদবীটি হযরত ঈসার বারজন সাহাবী ও পৌলের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

ফেরেশতা ঃ এই শব্দের অর্থ সংবাদদাতা। এরা সৃষ্ট বেহেশতী রূহ্‌যুক্ত সত্তা। কিন্তু তাদের মানুষের মত দেহ নেই। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁরা মানুষের দেহ ধারণ করতে পারেন।

ফরীশী ঃ এমন একজন ইহুদী, যিনি আল্লাহ্‌র শরীয়তের খুঁটিনাটি অনুসরণ করেন। ফরীশীরা আল্লাহ্‌র শরীয়ত যাতে ভঙ্গ না হয় সেজন্য নিজেরা আরও কিছু শরীয়ত তৈরী করেছেন।

বায়তুল মোকাদ্দস ঃ ইহুদীদের এবাদত গৃহ। এটিকে এবাদত-খানাও বলা হয়। এটি জেরুজালেম শহরে অবস্থিত। এখানেই লোকেরা পশু-কোরবানী ও বিভিন্ন ঈদ পালনের জন্য বছরে তিনবার একসংগে মিলিত হত।

বিশ্রামবার ঃ ইহুদী দিনপঞ্জিকা অনুযায়ী সপ্তাহের সপ্তম দিনটা হল শনিবার। এই দিনে তারা কিছু কিছু নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ-কর্ম করে না। এই দিনটা কেবল বিশ্রাম এবং আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্য আলাদা ছিল।

ব্যবস্থা ঃ ওয়াদা, চুক্তি ও বিধান বুঝায়। আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা বলতে এমন বিধানকে বোঝানো হয়, যেখানে মানুষের মতামত দানের কোন সুযোগ নেই। বরং আল্লাহ্‌ যা ব্যবস্থা হিসাবে দান করেন, তা মানুষকে অনুসরণ করতে হয়।

মজলিস-খানা ঃ ইহুদীরা এখানটায় স্থানীয় ভাবে এবাদত করার জন্য বিশ্রামবারে মিলিত হয়। এটাকে সমাজ-ঘরও বলা যায়। সামাজিক মিলনের জায়গা হিসাবে তারা এখানে নানা রকম আলাপ-আলোচনাও করত। সপ্তার অন্যান্য দিনে ইহুদী ছেলেমেয়েরা এখানে লেখাপড়াও শিখত। ইহুদীদের প্রত্যেকটি গ্রামে এই রকম এক একটি মজলিস-খানা ছিল। কিন্তু পশু-কোরবানী দেবার জন্য তাদের মাত্র একটিই এবাদতখানা ছিল, আর সেটি ছিল জেরুজালেমের বায়তুল-মোকাদ্দস।

মসীহ্‌ ঃ হযরত ঈসার একটি পদবী, যার অর্থ *"সেই অভিষিক্ত জন।"*

মুক্ত করা ঃ কাউকে একটা দাম দিয়ে মুক্ত করা।

রব্বি ঃ এই গ্রীক শব্দটির অর্থ ওস্তাদ।

শতপতি ঃ ১০০জন সৈন্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন রোমীয় সেনা কর্মকর্তা।

শয়তান ঃ এই শব্দটির অর্থ বিপক্ষ। সে আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় শত্রু।

শাহাদাত-সিন্দুক ঃ এটাকে ব্যবস্থা/নিয়ম-সিন্দুকও বলা হয়। স্বর্ণ দ্বারা আবৃত এই কাঠের বাক্সটি আবাস-তাম্বুর ও বায়তুল মোকাদ্দসের মহা-পবিত্র স্থানে রাখা হত। এটা আল্লাহ্‌র উপস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করত।

সেনহেড্রিন ঃ ৭০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইহুদী আদালত বা মহাসভা।

কিতাবুল মোকাদ্দস নির্বাচন

কিতাবুল মোকাদ্দস ইবরানী, অরামীয় ও গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছিল। অতীতে এই ভাষাগুলো ছিল বিভিন্ন প্রজন্মের সময়কার সাধারণ ভাষা। আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন বংশ বা সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, প্রত্যেকটি পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়ে যাতে এই কিতাব সহজে নিজেদের ভাষায় পড়তে পারে। গ্রীক সভ্যতার যুগ থেকে অন্যান্য ভাষায় কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদের কাজ শুরু হয়।

একটি ভাষা থেকে অন্য একটি ভাষায় কোন একটি বাণী অনুবাদের সময়, সেই বাণীর অনুবাদটি কি নির্ভুল কিনা কিম্বা তা পড়া যাচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই ফুটে উঠে। সুসংবাদের বিষয় হল কিতাবুল মোকাদ্দসের অনুবাদ সমূহ খুবই যত্ন ও যথার্থতা সহকারে করা হয়েছে যাতে আমাদের হাতে খুবই নির্ভুল একটি কিতাব থাকে।

আল্লাহ্‌র এই লিখিত কালাম কিতাবুল মোকাদ্দসকে আরও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যায় সাহায্য করার জন্য দেখা যায় একটি ভাষাতে বিভিন্ন অনুবাদ এসেছে। এমনকি একটি দেশের মধ্যেও বিভিন্ন অনুবাদ ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এসব অনুবাদে বুঝবার সুবিধার্থে টীকা-টিপ্পনী, মানচিত্র, বিভিন্ন কৃষ্টি-প্রথা সম্বন্ধে নোট সংযুক্ত করা হয়েছে। এসব সাহায্যকারী, কিন্তু খেয়াল রাখুন, এগুলো আল্লাহ্‌র বলা পাক-কালামের অংশবিশেষ নয়; বরং মানুষের মন্তব্য মাত্র।

একটি সাধারণ প্রশ্ন

অনেক লোক প্রশ্ন করেঃ *"যদি একজন লোক নাজাতদাতা হিসাবে ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে, তাহলে কি সে তার ইচ্ছামত জীবনযাপন বা খারাপ কাজ করতে পারবে এবং মৃত্যুর পরে বেহেশতে যেতে পারবে?"* ইঞ্জিল শরীফ এই প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছে এই ভাবে-

> *তাহলে কি আমরা এই বলব যে, আল্লাহ্‌র রহমত যেন বাড়ে সেইজন্য আমরা গুনাহ্ করতে থাকব? নিশ্চয়ই না। গুনাহের দাবি-দাওয়ার কাছে তো আমরা মরে গেছি; তবে কেমন করে আমরা আর গুনাহের পথে চলব?।* *(রোমীয় ৬:১,২ আয়াত)*

আল্লাহ্ ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরিকল্পনা করেছেন যাতে গুনাহ্‌গারদেরকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত করতে পারেন। যদি আপনি খাঁটি ঈমান সহকারে তাঁর উপর ঈমান আনেন, তাহলে আল্লাহ্‌র কালাম শিক্ষা দেয় যে, দু'টি সুন্দর বিষয় ঘটেঃ

১। গুনাহের ***শাস্তি*** থেকে মুক্তিঃ গুনাহের জন্য দেওয়া হযরত ঈসার পুরো মূল্য পরিশোধের উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ্ আপনার সকল গুনাহ্ মাফ করেন।

২। গুনাহের ***শক্তি*** থেকে মুক্তিঃ আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ আপনার মধ্যে আসেন এবং আপনার মধ্যে বাস করেন। পাক-রূহ্ আপনার দিলকে নতুন করেন এবং আপনি জীবনের বিষয়ে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পেতে শুরু করেন। এর দ্বারা আপনি খারাপীকে ঘৃণা করেন এবং ধার্মিকতাকে মহব্বত করেন।

> *যদি কেউ মসীহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে সব নতুন হয়ে উঠেছে।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, ২ করিন্থীয় ৫:১৭ আয়াত)*

> *কিন্তু পাক-রূহের ফল ঈসা মসীহের উম্মতদের জীবনে হল মহব্বত, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন।* *(ইঞ্জিল শরীফ, গালাতীয় ৫:২২,২৩ আয়াত)*

> *ঈসা মসীহ্ আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন, যেন সমস্ত গুনাহ্ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারেন এবং তাতে এমন একদল লোককে পাক-সাফ করতে পারেন যারা কেবল তাঁরই হবে এবং যারা অন্যদের উপকার করতে আগ্রহী হবে...।*
> *(ইঞ্জিল শরীফ, তীত ২:১৩,১৪ আয়াত)*

গ্রন্থ-তালিকা

- *An Ice Age Caused by the Genesis Flood*-by Michael J. Oard, ICR, El Cajon, CA, 243 pp.
- *Bones of Contention: A Creationist Assessment of Human Fossils*-by Marvin L. Lubenow, Baker Bk House, Grand Rapids, MI, 295 pp.
- *Creation and Change: Genesis 1.1-2.4 in the light of changing scientific paradigms*-by Douglas F. Kelly, Christian Focus Pub., Ross-shire, GB, 272 pp.
- *Creation: Facts of Life*-by Gary Parker, Master Books, Green Forest, AR, 215 pp.
- *Darwin's Black Box*-by Michael J. Behe, Touchstone, Simon and Schuster, NY, NY, 307 pp.
- *Darwin's Enigma: Ebbing the Tide of Naturalism*-by L. Sunderland, Master Books, Green Forest, AR, 192 pp.
- *Evolution: A Theory in Crisis, New Developments in Science are Challenging Orthodox Darwinism*-by Michael Denton, Adler & Adler, Pub., Inc., Bethesda, MD, 368 pp.
- *Evolution: The Fossils Still Say NO!*-by Duane T. Gish, ICR, El Cajon, CA, 391 pp.
- *The Genesis Record*-by Dr. Henry M. Morris, Baker Book House, Grand Rapids, MI, 716 pp.
- *Ice Cores and the Age of the Earth*-by Larry Vardiman, Ph.D., ICR, El Cajon, CA, 72 pp.
- *In the Minds of Men: Darwin & the New World Order*-by I. Taylor, TFE Pub., Minn., MN, 498 pp.
- *Noah's Ark: A Feasibility Study*-by John Woodmorappe, ICR, El Cajon, CA, 306 pp.
- *Refuting Evolution: A Response to the National Academy of Sciences' Teaching About Evolution & the Nature of Sciences*-by J. Sarfati, Ph.D., Master Books, Green Forest, AR, 143 pp.
- *The Age of the Earth's Atmosphere: A Study of the Helium Flux through the Atmosphere*-by Larry Vardiman, Ph.D., ICR, El Cajon, CA, 32 pp.
- *The Controversy: Roots of the Creation-Evolution Conflict*-by D. Chittick, Creation Cps, 280 pp.
- *The Long War Against God: The History and Impact of the Creation/Evolution Conflict*-by Henry M. Morris, Baker Book House, Grand Rapids, MI, 344 pp.
- *The Modern Creation Trilogy: Scripture & Creation (Three Volume Series)* -by Henry M. Morris and John D. Morris, Master Bks, Inc, Green Forest, AR, 228 pp.
- *The Mythology of Modern Dating Methods: Why million/billion-year results are not credible*-by John Woodmorappe, M.A. Geology, B.A. Biology, ICR, El Cajon, CA, 118 pp.
- *The Revised & Expanded Answers Book: The 20 Most-Asked Questions about Creation, Evolution, and the Book of Genesis, Answered!*- by Ken Ham, Jonathan Sarfati, Carl Wieland, edited by Don Batten, Ph.D, Master Bks, Green Forest, AR, 274 pp.

অতিরিক্ত তথ্য

প্রথম অধ্যায়

১। Josh McDowell, compiled by Bill Wilson, A READY DEFENSE, Thomas Nelson Publishers, © 1993 pp. 27,28. Used by permission of Thomas Nelson, Inc.

২। ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY, Pt 3, IVP ©The Universities and Colleges Christian Fellowship 1980, p. 1538

৩। Philip W. Comfort, THE ORIGIN OF THE BIBLE, Mark R. Norton, Texts & Manuscripts of the Old Testament, p. 151ff, ©1992 by Tyndale House Pub., Inc.

৪। Translated by William Whiston, THE WORKS OF JOSEPHUS, ©1987 by Hendrickson Publishers, Inc., p. 776

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। এখানে গ্যালাক্সীর যে ছবি দেওয়া হয়েছে সেটি মিল্কিওয়ে নয়, কারণ মিল্কিওয়ের ছবি তোলা অসম্ভব। এর বদলে একই রকম আরেকটি, অর্থাৎ আন্দ্রোমিডার ছবি দেওয়া হয়েছে।

২। পরিসংখ্যানগত তথ্যঃ THE WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA; NIGHTWATCH, A Practical Guide to Viewing the Universe by Terence Dickinson, pub. Firefly Books, April 1999. গ্যালাক্সীর সংখ্যা সব সময় বেড়েই চলেছে।

৩। ইঞ্জিল শরীফ, এহুদা ৬ আয়াত

৪। ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২০:৩৬ আয়াত। শারীরিক অর্থে মৃত্যু। ফেরেশতাদের মৃত্যু নেই।

৫। ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক ১২:২৫ আয়াত

৬। লুসিফার শব্দের ল্যাটিন ভাষায় অর্থ "আলো বহনকারী।" এর উৎস শুক্রগ্রহের জন্য ল্যাটিন নামের মধ্যে আছে, সেই গ্রহকে প্রায়ই "ভোরের তারা" নির্দেশ করা হয়। তবে কিতাবুল মোকাদ্দসে লুসিফার শব্দটি নেই।

তৃতীয় অধ্যায়

১। "নিখুঁত লোক" মানে নৈতিক ভাবে নিখুঁত।

২। উদাহরণ স্বরূপ, দেখুন Dr. Michael J. Behe-এর Darwin's Black Box, Touchstone, Simon and Schuster, NY, NY 307 pp.

চতুর্থ অধ্যায়

১। ইঞ্জিল শরীফ, প্রকাশিত কালাম ১২:৩-৯; ৩ ও ৪ আয়াত সাধারণতঃ শয়তানের পতনের কথা নির্দেশ করছে বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক পণ্ডিতেরা ৭-৯ আয়াতকে ভবিষ্যতের ঘটনা হিসাবে দেখেন।

২। আরও বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ইঞ্জিল শরীফের রোমীয় ৫:১২-১৪ আয়াত দেখুন। এছাড়াও দশম অধ্যায়ের ১নং ফুটনোট দেখুন। হযরত আদম ছিলেন পুরো মানব জাতির পিতা, অর্থাৎ মাথা; যখন তিনি গুনাহ্ করলেন তখন আমরা তাঁর মধ্যে ছিলাম।

৩। নিউজউইক, জানুয়ারী ১১, ১৯৮৮, ৪৬-৫২ পৃষ্ঠা।

৪। টাইম, ডিসেম্বর ৪, ১৯৯৫, আমেরিকা সংস্করণ, পৃঃ ২৯।

পঞ্চম অধ্যায়

১। অনেকে শিক্ষা দেয় যে, কাবিলের মনোভাবের কারণেই আল্লাহ্ কাবিলের কোরবানী গ্রহণ করেন নি। নিঃসন্দেহে কাবিল আল্লাহ্র কাছ থেকে স্বাধীন মনোভাব লাভ করেছিল, কিন্তু পাক-কিতাব স্পষ্ট করে বলে যে, "ঈমানের জন্য কাবিলের চেয়ে হাবিলের কোরবানী আল্লাহ্র চোখে আরও

ভাল ছিল।" পাক-কিতাব "আরও ভাল একটি মনোভাবের" কথা বলে না। আর কাবিল ভুল কোরবানী আনার দ্বারা আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিল। দেখুন, ইব্রীয় ১১:৪।

২। ইঞ্জিল শরীফ, লূক ১৭:২৭; মথি ২৪:৩৮ আয়াত

৩। ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ১:২১-৩২ আয়াত; যদিও এই অনুচ্ছেদটি নূহ নবীর সময়কার লোকদের কথা সরাসরি উল্লেখ করে না, কিন্তু এটা তাদের সিদ্ধান্তগুলোর কথা প্রকাশ করে।

৪। সম্ভবতঃ পাইন গাছের আঁঠালো (কাঠ কয়লার সাথে সিদ্ধ করা) রস থেকে তৈরী করা হয়েছে। বন্যার পরে হয়ত বিটুমিন আলকাতরা আবিষ্কৃত হয়েছে।

৫। তৌরাত শরীফ, পয়দায়েশ ৬:৩ আয়াত

৬। ইঞ্জিল শরীফ, ২ পিতর ২:৫ আয়াত

৭। নবীদের কিতাব, আইয়ুব ৪০:১৫-২৪; ৪১:১-৩৪ আয়াত

৮। "মাবুদ নীচে নেমে আসলেন..." যদি আল্লাহ্ একই সময়ে সব জায়গায় উপস্থিত থাকেন, তাহলে কেন তাঁকে "নীচে নেমে" আসতে হয়েছিল? "নীচে নেমে আসা" কথাটিকে আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যাবে না। কিতাবুল মোকাদ্দস প্রায়ই আল্লাহ্র বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে মানুষ বুঝতে পারবে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছে, যাতে কিতাবের শিক্ষার বিষয়ে আমরা ভাল করে বুঝতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্র "দেখার" বিষয়ে বলা হয়েছে, যদিও তাঁর আসল চোখ নেই, কারণ তিনি তো রূহ্।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। লক্ষ্য করুন কিভাবে বন্যার পরে জীবনের আয়ু নাটকীয় ভাবে কমে গিয়েছিল। ৭৫ বছর বয়সেও হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-কে বয়স্ক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল।

২। হযরত ইব্রাম একটি বড় জাতি হলেনঃ ইহুদী ও আরব জাতি উভয়েরই পিতা।

৩। হযরত ইব্রামের নাম মহান হয়েছিল; ইহুদী ও আরবীয়রা একই ভাবে তাঁকে সম্মান করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আল্লাহ্ই হযরত ইব্রামের নামকে মহান করেছিলেন। অন্যদিকে ব্যাবিলে আমরা দেখতে পাই মানুষ তাদের নিজেদের নাম মহান করতে চেয়েছিল।

৪। ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৮:৫৬ আয়াত

৫। *"গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু..."* (ইঞ্জিল শরীফ, রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)। দেখুন ৪র্থ অধ্যায়, মৃত্যু, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৫

সপ্তম অধ্যায়

১। বনি-ইসরাইলের ১২টি গোষ্ঠী হল হযরত ইয়াকুবের ১২জন ছেলে। ব্যতিক্রম হলঃ লেবির কোন বংশ ছিল না, কারণ তারা বনি-ইসরাইল জাতির ধর্মীয় নেতা হয়েছিলেন। আবার হযরত ইউসুফেরও গোষ্ঠী ছিল না, কিন্তু তাঁর দুই ছেলে আফরাহীম ও মানশা থেকে দু'টি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

১। তৌরাত শরীফ, হিজরত ১৪:১ থেকে ১৫:২১ আয়াত

নবম অধ্যায়

১। ❶ ব্রোঞ্জের গাহ্ ঃ হিজরত ২৭:১,২ আয়াত

❷ হাত ধোয়ার বড় পাত্র ঃ হিজরত ৩০:১৮ আয়াত

❸ বাতিদানী ঃ হিজরত ২৫:৩১ আয়াত

❹ রুটির টেবিল ঃ হিজরত ২৫:২৩,৩০ আয়াত

❺ ধূপ-গাহ্ ঃ হিজরত ৩০:১৩ আয়াত

❻ শাহাদাত-সিন্দুক ঃ হিজরত ২৫:১০,১১ আয়াত

❼ গুনাহ্ ঢাকা দেবার ঢাকনা ঃ হিজরত ২৫:১৭-২১ আয়াত

২। যখন মহা-পবিত্র স্থানের উপর দিয়ে মেঘস্তম্ভ ভেসেছিল তখন ইমামেরা প্রবেশ করতে পারেন নি। এটা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বুঝিয়েছিল। কিন্তু যাত্রাকালে যখন মেঘ সরে গিয়েছিল, তখন তারা পুরো আবাস-তাম্বু গুটিয়ে ফেলেছিল এবং সেই মেঘ অনুসরণ করেছিল।

৩। নবীদের কিতাব, ২ সামুয়েল ৭:১২-১৭ আয়াত

৪। সৃষ্টি, নূহের সময়কার বন্যা ও ব্যাবিলের উঁচু-ঘরের সাথে সম্পর্কিত তারিখগুলোর বিষয়ে পণ্ডিতেরা ভিন্নমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে শুধু কিতাবুল মোকাদ্দসের এ কথাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন এসব ঘটনার সময়কাল লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বছর নয়। হয়ত এই তিনটি ঘটনা ঘটার সময়কাল কয়েক হাজার বছরের বেশী হবে না।

দশম অধ্যায়

১। "প্রভু" শব্দটি মসীহের জন্য ব্যবহৃত একটি নাম (জবুর শরীফ ১১০:১) এবং এই নামটি তাঁর কর্তৃত্ব ও তাঁর শাসন করার অধিকারের উপর জোর দেয়। J. Dwight Pentecost, THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST, ©1981 by The Zondervan Corporation, p. 61

২। একটি সুগন্ধি দ্রব্য।

৩। এটা হতে পারে হযরত ঈসার বার-মিজবাহ্‌-এর (একটি ইহুদী বালকের ১২ বছর বয়স পার হওয়ার অনুষ্ঠান) সময়। ইহুদী তালমুদ গ্রন্থ এটাকে বলে, "সাবালকত্বের বয়স।" কেউ কেউ এটাকে এক বছর পরে, অর্থাৎ তের বছর বয়সে রাখে।

একাদশ অধ্যায়

১। মহান হেরোদের ছেলে হেরোদ আন্তিপাস ইয়াহিয়া নবীকে জেলখানায় বন্দী করেছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া হেরোদের গুনাহের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, কারণ হেরোদ তাঁর সৎ ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে বাস করছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। সেনহেড্রিন/মহাসভা হল ইহুদীদের বিচার সভা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। আমি হযরত ঈসার বিচার ও ক্রুশারোহণের বিষয়ে সব বিস্তারিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করি নি। এই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলঃ *"সৈন্যেরা যখন ঈসাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শিমোন নামে কুরীণী শহরের একজন লোক গ্রামের দিক থেকে আসছিল। সৈন্যেরা তাকে জোর করে ধরে ক্রুশটা তার কাঁধে তুলে দিল যেন সে ঈসার পিছনে তা বয়ে নিয়ে যেতে পারে"* (ইঞ্জিল শরীফ, লূক ২৩:২৬ আয়াত)।

২। Whiston, THE WORKS OF JOSEPHUS, p. 720

৩। J. W. Shepard, THE CHRIST OF THE GOSPELS, (Eerdmans, Grand Rapids © 1964) p. 604 as quoted by Pentecost, THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST, p. 487

৪। John F. Walvoord, Roy B. Zuck, THE BIBLE KNOWLEDGE COMMENTARY ©1983, SP Publications, Inc. p. 340

Pentecost, THE WORDS AND WORKS OF JESUS CHRIST, p. 487

Warren W. Wiersbe, THE BIBLE EXPOSITION COMMENTARY, Vol. 1, ©1989, SP Publications, Inc. p. 384

৫। ৩০০ থেকে ১০০০জন সৈন্য নিয়ে গঠিত হয় একটি সৈন্যবাহিনীর ইউনিট।

৬। পুনরুত্থানের দিনের সকালের ঘটনাগুলোর সঠিক ক্রমের কথা লেখা নেই। একটি সম্ভাব্য ক্রম উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। হযরত ঈসাকে সকাল ৯টায় ক্রুশে পেরেক মারা হয়েছিল, আর এটা সকালের পশু কোরবানী দান করার সময়। তিনি দুপুর ৩টায় মারা গিয়েছিলেন, আর এটা বৈকালীন পশু কোরবানীর সময়।

২। হযরত ঈসার নিখুঁত জীবন-যাপনই তাঁকে উপযুক্ত কোরবানী হওয়ার জন্য যোগ্য করেছে, কিন্তু তাঁর মৃত্যুই গুনাহের দাম পরিশোধ করেছিল। এটা বলা যেতে পারে যে, শুধুমাত্র মৃত্যু দ্বারা হযরত ঈসা শরীয়তের দাবী সমূহ পূরণ করেছিলেন (ইঞ্জিল শরীফ, মথি ৫:১৭,১৮ আয়াত)।

GoodSeed® International

P. O. Box 3704
Olds, AB T4H 1P5
CANADA

Business: 403 556-9955
Facsimile: 403 556-9950
Email: info@goodseed.com

GoodSeed Australia
1800 897-333
info.au@goodseed.com

GoodSeed Canada
800 442-7333
info.ca@goodseed.com

BonneSemence Canada
Service en français
888 314-3623
info.qc@goodseed.com

GoodSeed Europe
0049 (0)5231 - 94 35 144
info.eu@goodseed.com

GoodSeed UK
0800 073-6340
info.uk@goodseed.com

GoodSeed USA
888 654-7333
info.us@goodseed.com

www.goodseed.com

GoodSeed® International is a not-for-profit organization that exists for the purpose of clearly communicating the contents of this book in this language and others. We invite you to contact us if you are interested in ongoing projects or translations.

'GoodSeed,' and the Book/Leaf design mark are trademarks of GoodSeed International.

এটা একটা আকর্ষনীয় গল্প
এই গল্পটি সত্যিই আপনার জানা দরকার

নবীরা
বিভিন্ন কথা
বলে গিয়েছেন

তাঁদের বলা
কথাগুলো জানা
বুদ্ধিমানের কাজ

ইতিহাসের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত লোকেরা ধর্ম নিয়ে অনেক যুদ্ধ করেছে। অতীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে এরকম যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এখন লোকেরা পৃথিবীর চারদিকে সহজেই ভ্রমণ এবং কাছের ও দূরের জাতিদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাজ-কর্ম করতে পারে। এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের কাছাকাছি বাস করে। যেহেতু আমরা একে অন্যের আরো কাছাকাছি বসবাস করছি, তাই বড় বড় সংঘর্ষ ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

আমাদের প্রতিবেশী লোক বা জাতিরা কি বিশ্বাস করে, কেন বিশ্বাস করে তা অবশ্যই আমাদের জানা দরকার। যদিও আমরা হয়ত কখনও তাদের সাথে একমত হতে পারব না, কিন্তু আমরা জ্ঞানপূর্বক ও দয়া সহকারে কথাবার্তা বলতে পারি। যেহেতু আমরা তাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে বুঝি, তাই আমরা তাদের সাথে খোলামেলা ভাবে কথাবার্তা বলতে পারি এবং তারা একমত না হলেও তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করতে পারি।

নবীদের বলা কথাগুলো নামক এই বইটি অন্য একটি কিতাব সম্বন্ধে বলে। ইতিহাসের প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সেই কিতাবটি সবচেয়ে বেশী বিতরণ হয়েছে এবং এটি নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আর সেই কিতাবটির নাম কিতাবুল মোকাদ্দাস। যদি আপনি কিতাবুল মোকাদ্দসের তৌরাত শরীফ, জবুর শরীফ ও নবীদের কিতাব সমূহ এবং ইঞ্জিল শরীফে লেখা কথাগুলো বুঝতে চান, তাহলে নবীদের বলা কথাগুলো নামক এই বইটি আপনারই জন্য।

দীর্ঘ দিনের কিতাবুল মোকাদ্দাস অধ্যয়ন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান থেকে লেখক ইয়াহিয়া সা' আ এই বইটি লিখেছেন। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ ও বসবাসের উপর রয়েছে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা।

ISBN 978-1-927429-86-0
9 781927 429860
All the Prophets - Bangla

goodseed
see·hear·understand